রঙ্গমহাল

[সচিত্র]

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

প্রকাশক—শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

সন ১৩২৩ সাল

[মূল্য ১।০ দেড় টাকা

বিজ্ঞাপন

আমার "রঙ্গমহাল"—মোগল-বাদসাহদিগের অনন্ত-ঐশ্বর্য্যময়, রত্ন-মণ্ডিত, স্বর্ণখচিত, উজ্জ্বলিত "রঙ্গমহাল" নহে। তবে সেই লোকবিশ্রুত, কালগর্ভে নিক্ষিপ্ত, বাদসাহী রঙ্গমহালের, সুখস্মৃতিজড়িত, কয়েকটী আখ্যান, ইহাতে চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইল। ইতিহাসপাঠে, এ দেশের লোকে বীতরাগ, কিন্তু ঐতিহাসিক গল্পপাঠে, অনেকেরই অনুরাগ দেখা যায়। তাই আমার ন্যায় ক্ষুদ্রশক্তি গ্রন্থকারের এই সামান্য প্রয়াস।

এই গ্রন্থসংন্যস্ত গল্পগুলির মধ্যে, আমি ইচ্ছা করিয়া চরিত্রাঙ্কনের চেষ্টা করি নাই। তবে যদি ইহার মধ্যে কোন চরিত্র বিশেষরূপে ফুটিয়া উঠিয়া থাকে, তাহা পাঠকেরই লভ্যাংশ। চিত্তরঞ্জন করাই আমার উদ্দেশ্য। গল্পগুলির নায়কদিগের নাম ঐতিহাসিক, এবং ইতিহাসের অনুযায়ী তাঁহাদের চিত্রাঙ্কনে প্রয়াস পাইয়াছি। ইহাদের মধ্যে কয়েকটী গল্পের ঐতিহাসিক ভিত্তিও আছে। নায়িকা ও অন্যান্য পাত্রীগণ কল্পনার পরিসর-ক্ষেত্রোদ্ভূত। এইজন্য পুনরায় স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, চিত্তরঞ্জনই আমার উদ্দেশ্য—চরিত্র-চিত্রণ নহে।

আমার—"পঞ্চপুষ্প"কে, একদিন বাঙ্গালী পাঠক, অনুকম্পা-দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহাদের আমি ধন্যবাদ প্রদান করি। সেই উৎসাহেই, দুঃসাহসে বুক বাঁধিয়া, আমি পুনরায় তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি।

আমার ক্ষুদ্র বিশ্বাসে, এই গ্রন্থই বঙ্গভাষায় প্রথম সচিত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস। এদেশে চিত্রশিল্প অতি অপরিণত অবস্থায় আছে। জানি না, এই গ্রন্থ-সন্নিবেশিত চিত্রগুলি পাঠকের মনোরঞ্জক হইবে কি না?

এই দুর্ব্বলহস্তে, ক্ষীণ-তুলিকার মৃদু-আঘাতোদ্ভূত, কয়েকটী গল্পের একটীও যদি পাঠকের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়, তাহা হইলে, এই বিনীত গ্রন্থকার, আশাতীত পরিশ্রম-সাফল্য অনুভব করিবে।

কলিকাতা
২০শে জ্যৈষ্ঠ—১৩০৮ সাল

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়

সূচিপত্র

রঙ্গমহাল

সেলিমা বেগম

প্রথম পরিচ্ছেদ

সাজাহান বাদসাহ গ্রীষ্ম-যাপনের জন্য, কাশ্মীরের উপত্যকায় কয়েকটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন—তাহাদের সকলগুলির সাধারণ নাম ছিল "আরামবাগ।" "মোতি-মহল" এই আরামবাগের প্রাসাদগুলির অন্যতম। "মোতি-মহল" শোভায়, সম্পদে, সকল মহলকে পরাজিত করিয়াছিল—আর মোতি-মহলের অধিবাসিনী, সাজাহানের নবপ্রণয়িনী সেলিমা বেগম, রূপগুণসৌভাগ্যের প্রখর জ্বালায় অপরাপর বেগমদিগের কোমল প্রাণগুলি পলে পলে দগ্ধ করিতেছিলেন। তখনও মমতাজ বেগম, সাজাহানের উপর ততটা আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন নাই। সেলিমার জীবন-নিশা শেষ হইবার পর, মমতাজের সুখসূর্য্য উদিত হয়।

অদ্য রজনী জ্যোৎস্নাময়ী। মাঝে মাঝে শুভ্র তুলারাশিবৎ একখানা করিয়া সাদা মেঘ আসিয়া, জ্যোৎস্নাকে ম্লান করিয়া দিতেছিল। উত্তরে—অনেকদূরে—তুষারমণ্ডিত বৃদ্ধ হিমালয়ের শুভ্রগাত্রে, চন্দ্রকিরণ পড়িয়া অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। আরামবাগের প্রাসাদগুলির পাদমূল প্রক্ষালিত করিয়া, একটী ক্ষীণকায়া গিরিনদী বহিয়াছে। চন্দ্রকিরণে সেই নদীর জল, তরল রজতধারার মত ঢলঢল করিতেছে।

মোতি-মহলের দীপোজ্জ্বলিত কক্ষে একটী উন্মুক্ত বাতায়ন-সন্নিধানে দাঁড়াইয়া, সেলিমা এই গাম্ভীর্য্যময় নৈশ-প্রকৃতির জ্যোৎস্নাপ্লাবিত সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতেছিলেন। তাঁহার কেশকলাপ আলুলায়িত। সেই ভ্রমরকৃষ্ণ কেশের রাশি, কতক বা পৃষ্ঠবিন্যস্ত ফিরোজি ওড়নার উপর, কতক বা গোলাপ-রাগরঞ্জিত মুখের উপর, অসংযতভাবে পড়িয়াছে। সেই চিরসুন্দর উপত্যকা শব্দমাত্র-বিহীন। মৃদঙ্গরাজ, বুল্‌বুল্‌, সোণাগাল প্রভৃতি পাহাড়িয়া ছোট ছোট পাখীগুলি কেহই জাগিয়া ছিল না।

বাহ্যপ্রকৃতির নগ্ন সৌন্দর্য্যের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া, একটা ছোটরকম নিশ্বাস ফেলিয়া, সেলিমা মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"এই সুন্দর রাত্রি, এই উজ্জ্বল চাঁদের আলো, এই অনন্ত-সৌন্দর্য্যময়ী প্রকৃতি। আমার হৃদয়ে আজ কত আশা জাগিয়া উঠিতেছে, কিন্তু তাহার নিবৃত্তি কই? এই নির্জ্জন পাহাড়ে বন্দিনীর ন্যায় রহিয়াছি; কিন্তু যাঁর আশায় আছি—তিনি কই? আসিব বলিয়া আসেন না, দেখা দি[illegible]দেন না—মুখে বলেন ভালবাসি, কাজে পরিচয় পাই না। এই ভরা যৌবন, বাসনার খরস্রোত, এত সাধ—এত আকাঙ্ক্ষা—কিছুই ত মেটে না। কতকগুলা দাসী বাঁদি, মণিমুক্তা, রত্নপ্রবাল লইয়া, পিঞ্জরের পক্ষিণীর মত থাকিয়া কি সুখ? পাষাণে ফুল ফুটে না। বাদসাহের হৃদয়, পাষাণের মত কঠিন, প্রেমের কোমল-কুসুম তাহাতে কি করিয়া ফুটিবে? আমি বাদসাহের বেগম, কিন্তু আমার অপেক্ষা ঐ দরিদ্রা বাঁদি অধিক সুখী।"—সেলিমা গবাক্ষ বন্ধ করিয়া, একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ধীরে ধীরে কোমল শয্যার উপর আসিয়া বসিলেন।

সাজাহান আজ সপ্তাহকাল মৃগয়ায় বাহির হইয়াছেন, কোনও খোঁজ-খবরই নাই। "সূর্য্যাস্তের মধ্যে ফিরিব" বলিয়া বেগমকে আশ্বাস

দিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার সে সত্য পালিত হয় নাই। সওয়ার আসিয়া সংবাদ দিয়াছে, বাদসাহের ফিরিতে আরও দুই একদিন বিলম্ব হইবে।

সেলিমার শয়নকক্ষ বিবিধ বর্ণের সুগন্ধি দীপে উজ্জ্বলিত। কার্ণিসে কার্ণিসে, রঞ্জিত প্রস্তরগাত্রে, চিত্রীর কলা-কৌশলময় কৃত্রিম লতাপুষ্পের চিত্রগুলি সজীব বলিয়া মনে হয়। চারিপাশে চারিখানি সুদীর্ঘ কলঙ্কশূন্য মুকুর। মর্ম্মরগঠিত আধারের উপর স্বর্ণময় মণিখচিত ফুলদানে নানাবর্ণের কুসুমস্তবক। মুকুরগাত্রে নাগ-কেশর ও চম্প-কের কৌশল-গ্রথিত মালা দুলিতেছে ;—তাহাদের মিশ্রিত তীব্রগন্ধে কক্ষটী আমোদিত! বসোরার চিত্রময় কার্পেট, নিজবক্ষে সেলিমার কোমল পদচিহ্ন বহিবার জন্য হর্ম্মাতলে বিস্তৃত। ভিত্তিগাত্রে কয়েক-খানি বহুমূল্য তৈলাঙ্কিত চিত্রপট,—স্ফটিকাধারের চঞ্চল আলোক, সেগুলির উজ্জ্বলবর্ণময় শোভাকে আরও মনোহর, আরও সজীব করিয়া তুলিয়াছিল।

সেলিমা একখানি কৌচের উপর উপবেশন করিলেন। সেই দেহ-যষ্টি যেন ওড়নার ভার আর বহিতে পারি[illegible]না। সেলিমা, ওড়না-খানা খুলিয়া গালিচার উপর নিক্ষেপ করিলেন। চিকণের কাজকরা, মোতি-বসান ফিরোজি ওড়না, সেই নিক্ষেপ-গতি-মুখে, উজ্জ্বল আলোকে একবার ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। বিরক্তির সহিত সেলিমা বলিলেন,—

"কিছুই ভাল লাগিতেছে না—কি করি ?"

নিকটে এক বাঁদি, বেগমসাহেবার আজ্ঞার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল। বেগম তাহাকে বলিলেন—"ঐ ঘরে সুরবাঁধা একটা বীণ্ আছে, লইয়া আয়।"

বীণ্ আসিল—কিন্তু সেলিমা তাহার সুর মিলাইতে পারিলেন না। সেই রক্তোৎফুল্ল ওষ্ঠাধরে ক্ষীণ হাসিরেখা ফুটিয়া উঠিল—মনে মনে বলিলেন—

"এ বীণ্‌টাও পুরুষদের মত অবাধ্য হইল যে!"

কয়েকদিন হইল, সাকি বলিয়া এক নূতন দাসী, বেগমসাহেবার সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিল। সেলিমা বলিলেন,—"নূতন বাঁদিকে ডাকিয়া আন্, সে বেশ গাহিতে পারে।"

সাকি নিজকক্ষে ছিল। বেগম স্মরণ করিয়াছেন শুনিয়া, ছুটিয়া আসিল। সাকির মুখখানি—অতি সুন্দর। কিন্তু তাহার মুখচ্ছবির রেখায় রেখায় এক বিষাদভাব অঙ্কিত। সে নির্জ্জনে থাকিতেই ভাল-বাসে, অন্যান্য দাসীদের সঙ্গে বড় একটা কথাবার্ত্তা কহে না। বেগমের প্রয়োজন হইলে, কেবল তাঁহার আদেশপালন করিয়া চলিয়া যায়। একদিন সাকি নির্জ্জনে বসিয়া গান গাহিতেছিল, বেগম তাঁহার কক্ষের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। গান শুনিয়া, তিনি সাকির গুণের পক্ষপাতিনী হইলেন। বেগম, সাকিকে ভালবাসেন। সর্ব্বদা কাছে রাখিতে চান, কিন্তু সাকি বেগমের কাছে বড় একটা থাকিতে চাহে না।

সাকি যে শুধু গান গাহিতে পারিত, তাহা নয়, বীণ্ বাজাইতে পারিত, বাঁশীতেও তাহার নিপুণতা বড় অল্প ছিল না। রঙ্গমহালে বাঁদিগিরি করিতে হইলে, অনেক বিদ্যার প্রয়োজন। একদিন যে চাঁদিনীর রাতে নিস্তব্ধ কুঞ্জমধ্যে বেগম তাহার বাঁশী শুনিয়া আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন; সেই দিন হইতেই তিনি তাহার সহিত সখীভাবে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

সাকি আসিয়া বেগমের কাছে বসিল। বেগম বলিলেন, "সাকি! তুই বীণ্ বাজাইবি, না বাঁশী বাজাইবি?"

সাকি একটু মলিন হাসি হাসিয়া বলিল,—"বেগমসাহেবার যাহা ইচ্ছা।"

সেলিমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"সাকি! তুই এতদিন এখানে আসিয়াছিস্, একদিনও ত কই তোর মুখে হাসি দেখিলাম না!"

"বাঁদির আবার হাসি কি ?"

সেলিমা এ কথায় যেন একটু দুঃখিত হইয়া বলিলেন,—"কেন, তোকে কি আমি বাঁদির মত দেখি ?"

"আজ্ঞা, তা বলিতেছি না—আপনি যথেষ্ট অনুগ্রহ করেন।"

"তবে সর্ব্বদা বিষণ্ণ থাকিস্ কেন ?"

"আপনি সর্ব্বদা বিষণ্ণ থাকেন কেন ?"

"আমি কি দিনরাত তোর মত মুখ ভার করিয়া থাকি ? জাঁহাপনাকে অনেক দিন দেখি নাই—তাই। চিরকালই কি এমন থাকি ?"

সাকি মনে মনে যেন কি একটা তোলাপাড়া করিল। একটু পরে বলিল,—"আপনি জানেন, বেগমসাহেবা ! অভাবই দুঃখ। আপনি বাদসাহকে চান, পান না—তাই বিষণ্ণ হন। আমার এমন একটা কিছু অভাব আছে, যাহার জন্য আমি চিরদুঃখিনী।

সেলিমা স্নেহের হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"তুই কি কাহাকেও ভালবাসিয়াছিস্ না কি ? আমাকে বল্ না,—আমি তাহার সহিত তোর বিবাহ দেওয়াইব।"

সাকির কপাল ঘামিয়া উঠিল। মুখ লাল হইল। সে মৃদুস্বরে বলিল,—

"আমি আপনাকে ভালবাসি।"

বাদসাহের মৃগয়া যাত্রার পর, সেলিমা মুখ ভার করিয়াই থাকিতেন। আজ মেঘে, বিজলী দেখা দিল। তিনি বাঁদির কথা শুনিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন,— "দূর্ পোড়ারমুখি ! আমি যে বাদসাহের বেগম ! আমায় ভালবাসিতে আছে ?"

পোড়ারমুখী উঠিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। সেলিমা

তাহাকে বসাইলেন। বলিলেন,—"থাক্ বাজে কথা, তোর সেই বাঁশীটা একবার আন্। এই ঘরটা বড় গরম বোধ হইতেছে, একবার দুয়ার জানালাগুলা সব খুলিয়া দে। দীপগুলার আলো নিবাইয়া, চাঁদের আলো ঘরে ছাড়িয়া দে। ফুলের মালাগুলা আমার শয্যার উপর বিছাইয়া দে। আজ আমার ফুলশয্যা। বাদসাহ আসিলেন না, বিরহের জ্বালাটা এইরূপেই মিটাই। আমার কাছে বসিয়া করুণার সুর ছড়াইয়া, তুই বাঁশী বাজা। আর আমি আপনা ভুলিয়া, তাই শুনি।"

সাকি উঠিয়া দাঁড়াইল। বেগম বলিলেন,—"সাকি! বড় পিপাসা। এক পাত্র সিরাজি"—

বাঁদি সোণার পেয়ালা ভরিয়া সুগন্ধি সিরাজি ঢালিয়া আনিয়া বেগমের সম্মুখে ধরিল।

বেগম বলিলেন,—"অত ফেনা উঠিতেছে, সুরা বড় উষ্ণ—গোলাপ দিয়াছিস্?"

বাঁদি বলিল,—"দিয়াছি।"

"দে—একটু ইস্তাম্বুল মিশাইয়া দে।"

সাকি সুরাপাত্র হস্তে লইয়া, কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। ইস্তাম্বুল মিশাইল—আরও কি একটা মিশাইল। ফিরিয়া আসিয়া, সেই উচ্ছ্বসিত মদিরাপাত্র বেগমের সম্মুখে ধরিল।

স্বর্ণপাত্রস্থ টলটলায়মান উৎকৃষ্ট সিরাজি, দীপালোকে উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। সুরা শেষ করিয়া, সুন্দরীশ্রেষ্ঠা সেলিমা, পাত্রটাকে মেঝের উপর ছুড়িয়া দিলেন। পাত্রটা গড়াইতে গড়াইতে একটা ফুলদানের গায়ে ঠেকিল। ফুলদানিটা ঝনাৎ করিয়া উল্‌টিয়া পড়িল। তাহার উপর একটা ফুলের তোড়া ছিল, মৃদু আঘাতে তাহার পাপড়ি-গুলা ঝরিয়া গেল।

নিকটস্থ এক সুকোমল মখমল-শয্যায় শুইয়া অতুলনীয়া রূপসী, তন্বী সেলিমা, মদিরালসে ঢলিয়া পড়িলেন। সাকি বাঁশী বাজাইয়া গান ধরিল,—

দুখুয়া মে কৈসে কহুঁ মেরে সজনী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অনেকক্ষণ ধরিয়া, ফিরিয়া ফিরিয়া সাকির সেই স্বরভরা মোহন-বাঁশী করুণস্বরে কাঁদিল—

দুখুয়া মে কৈসে কহুঁ মেরে সজনী।

শুধু বাঁশী কাঁদিল না—সাকিও কাঁদিল। বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে সাকি, সুপ্তসুন্দরী সেলিমার মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া কাঁদিল। গান শেষ হইলে, আসন ছাড়িয়া ধীরে ধীরে সেলিমার সৌন্দর্য্যোচ্ছ্বসিত শয্যাপার্শ্বে বসিল। মাদকের উত্তেজনায়, সেলিমার গণ্ডস্থলে প্রচুর শোণিতপ্রবাহ উপস্থিত হইয়া, তাহা অধিকতর রক্তিমাভ করিয়াছে। সেই তাম্বুলরাগরঞ্জিত সুরাচুম্বিত সরস ওষ্ঠপুট ধীরে ধীরে নড়িতেছে। মৃদু বাতাসে যেমন কোমল বল্লরী কাঁপিয়া উঠে, সেইরূপ সেলিমার উরঃপ্রদেশ ধীরে ধীরে কাঁপিতেছে। নিশ্বাসের সহিত সুরার মিষ্টগন্ধ নিঃসৃত হইতেছে। অলকাগুচ্ছের প্রান্তসীমায়, ললাটদেশে—মুক্তা-মালার মত শ্রেণীবিন্যস্ত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিয়াছে।

সাকি—সর্ব্বাগ্রে নিজের অঞ্চল দিয়া বেগমের ঘাম মুছাইয়া দিল। মুছাইতে মুছাইতে তাহার হাত কাঁপিয়া উঠিল। সে শয্যাত্যাগ করিয়া দূরে দাঁড়াইল। তাহার চক্ষু যেন জ্বলিতেছে, হৃদয় কাঁপিতেছে, কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া পড়িতেছে।

সেই নির্জ্জন কক্ষমধ্যে দাঁড়াইয়া, বাঁদি অনেকক্ষণ স্থিরভাবে কি চিন্তা করিল। সে সুখের চিন্তা যেন আর শেষ হয় না। আবার ধীরে ধীরে সেলিমার শয্যাপ্রান্তে আসিয়া বসিল। ধীরে ধীরে বেগমের মুখচুম্বন করিল। তাহার হৃদয় আবার কাঁপিয়া উঠিল। শিরায় শিরায় যেন বৈদ্যুতিক তেজ ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সাকি যে দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছিল, তাহার সম্মুখেই এক প্রকাণ্ড মুকুর। সেই কক্ষ তখনও পূর্ণোজ্জ্বলিত। সাকি চক্ষু তুলিয়াই সহসা দেখিল, সেই নিষ্কলঙ্ক, সুগন্ধি মাল্যচুম্বিত দর্পণ-বক্ষে এক দীর্ঘকায়, উন্নতললাট, শ্মশ্রুমুখ পুরুষের ছায়া প্রতিবিম্বিত। সহসা সর্পদষ্ট হইলে মানুষের মানসিক অবস্থা যেরূপ হওয়া সম্ভব, সাকির অবস্থাও সেইরূপ হইল।

আর ফিরিয়া চাহিতে সাহস হইল না। সাকি ভাবিল—"কক্ষমধ্যে যে দণ্ডায়মান—সে নিশ্চয়ই সমস্ত ঘটনা দেখিয়াছে। অন্য কাহারও আসিবার সম্ভাবনা নাই—তবে কি স্বয়ং বাদসাহ?" সাকি তখন মুখ ফিরাইয়া সেই দর্পণ-প্রতিবিম্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। বুঝিল—এ মূর্ত্তি বাদসাহের না হইয়া যায় না। অদূরেই ভিত্তিগাত্রে বাদসাহের তসবীর ঝুলিতেছিল। সাকি একবার তাহার দিকে চাহিল। মুহূর্ত্তের মধ্যেই, তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, জীবনাশা নির্ব্বাপিত হইল।

বেগম নিদ্রিতা—বাঁদি তাহাকে চুম্বন করিতেছে, এ রহস্য দেখিয়া সাজাহান হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না। ভাবিলেন—সেলিমা সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়া—অনুপমেয়, রাজরাজেশ্বরী। স্ত্রীলোকেও তাহার রূপ দেখিয়া মোহবিহ্বল। কিন্তু এই নূতন বাঁদিকে বাদসাহ পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই, তাই প্রশ্ন করিলেন—"কে তুই! এত রাত্রে বেগমের কাছে বসিয়া কি বকিতেছিলি?"

সাকি মনে মনে ভাবিল—কথা না কহাই উচিত।

বাদসাহ প্রশ্ন করিলেন,—"কে তুই ? এত রাত্রে বেগমের কাছে বসিয়া কি বকিতেছিলি ?"

তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া বাদসাহ বিস্মিত হইলেন। মনে ভাবিলেন, হয় ত এ উন্মাদ। একটু উত্তেজিত-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাঁদি! চুপ করিয়া রহিলি যে? কে তুই? এখানে কি করিতেছিলি?"

সাকি বলিল,—"আমি যদি পরিচয় না দিই জাঁহাপনা?"

বাঁদির স্পর্দ্ধা দেখিয়া ভারত-সম্রাট্ স্তম্ভিত হইলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে কটি-বিলম্বিত তরবারি নিষ্কোষিত করিলেন। উজ্জ্বল দীপালোকে তাহা ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। কিন্তু তখনই আবার অসি কোষমধ্যে পুনঃপ্রেরণ করিয়া পরুষভাবে বলিলেন,—

"স্ত্রী-শোণিতে আমার তরবারি কলঙ্কিত করিব না। তোর গোস্তাখির জন্য এখনি প্রহরিণী ডাকিয়া উলঙ্গ করিয়া—তোকে বেত্রাঘাত করাইব।"

তখনও সাকির হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশে, জীবনাশার ক্ষীণালোক বর্ত্তমান ছিল। বাদসাহের রোষ-বিপ্লাবিত মুখ দেখিয়া, তাহা নির্ব্বাপিত হইল। সে কম্পিতস্বরে বলিল,—"সাহান-সা! আমার শোণিতে আপনার তরবারি কলঙ্কিত হইবে না, আঘাত করুন, আমি স্ত্রীলোক নহি,—পুরুষ।"

সম্রাটের চক্ষুর্দ্বয় অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিল। তরবারি পুনর্ব্বার ঝন্‌ঝনার সহিত নিষ্কোষিত হইল; কিন্তু এবারেও বাদসাহ আত্মসংবরণ করিয়া, অসি আবার কোষবদ্ধ করিলেন। ক্রোধকম্পিত-স্বরে বলিলেন, "পুরুষ! আমার রংমহালে!! তরবারির মৃত্যু, অতিসুখের মৃত্যু—তোর প্রতি এত দয়া করিব না। ক্ষুধিত কুক্কুর-দংশনে তোর প্রাণনাশের দণ্ডবিধান করিব।"

সাকি দাঁড়াইয়াছিল, কাঁপিতে কাঁপিতে বাদসাহের পাদমূলে বসিয়া পড়িল।

সেলিমা তখন সুখসুপ্তিমগ্ন। তাহার প্রতি বাদসাহ কঠোর দৃষ্টিপাত

করিতেছেন দেখিয়া, সাকির হৃদয়ের মধ্যে অভূতপূর্ব্ব বলসঞ্চার হইল। সে তখনি দৃঢ়পদে উঠিয়া দাঁড়াইল, স্থিরচক্ষে বাদসাহের প্রতি চাহিয়া বলিল,—"সাহান-সা! যদি হুকুম হয়, তবে আমার সমস্ত কথা আপনাকে বলি।"

বাদসাহ পূর্ব্ববৎ তীব্রকণ্ঠে বলিলেন,—"বল্, কিন্তু তোর প্রাণ-দণ্ডের আজ্ঞার ব্যতিক্রম করিব না।"

সাকি তখন ধীরে ধীরে স্পষ্ট করিয়া বলিতে লাগিল,—"ভারত-সম্রাট্! যে সেলিমাকে আপনি হৃদয়েশ্বরী করিয়াছেন, তাহাকে আমি আশৈশব প্রাণতুল্য ভালবাসিয়াছি। সেলিমার পিতার আশ্রয়ে আমি প্রতিপালিত। তাহার মাতা জীবিতা থাকিলে, আজ আমিই তাহাকে লাভ করিতাম। সাহান-সা! আজ পাঁচ বৎসর সেলিমা আপনার অন্তঃ-পুরবাসিনী হইয়াছে। এতদিন তাহাকে একবার দেখিবার জন্য কতই আকুল হইয়া ঘুরিয়াছি, কোথাও দেখা পাই নাই। তার পর এই ছদ্ম-বেশে স্ত্রীলোকের রূপ ধরিয়া আপনার হারেমের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি।"

"আমি কে, নির্দ্দোষী সেলিমা তাহা জানে না। সেলিমা আমায় স্ত্রীলোক বলিয়াই জানে। দিবসে আমি তাহার সম্মুখে সাধ্যমত বাহির হইতাম না—মুখ প্রায়ই অবগুণ্ঠনে আবৃত করিয়া থাকিতাম—পাছে সে আমায় চিনিতে পারে। বাল্যে, সেলিমা আমায় বড় ভালবাসিত। তাহাকে লইয়া আমি সুখী হইব, ভূতলে নন্দনকানন সৃজন করিব, এই আশায়, এই কল্পনামোহে—অনেক দিন কাটাইয়াছিলাম। আপনি আমার সে আশা ভঙ্গ করিয়া, দরিদ্রের মুখের অন্ন কাড়িয়া লইয়াছেন। হৃদয়ের উদ্বেগ এতদিন আমি চাপিয়া ছিলাম। আজ এই রজতশুভ্র দিগন্ত উচ্ছ্বসিত চন্দ্রালোক, গন্ধভরা ফুলরাশি, মদিরার উত্তেজনা, সর্ব্বোপরি এই সুবিজন অবসর—আমার কুপ্রবৃত্তির বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। সিরাজির সহিত মাদক মিশাইয়া, আমিই

সেলিমাকে অচেতন করিয়াছি। আমার মৃত্যু যখন অনিবার্য্য,—তখন এ সমস্ত কথা আপনাকে শুনাইবার কোনও আবশ্যকতা ছিল না। কিন্তু পাছে আপনি স্বর্গের সুন্দরী নিষ্কলঙ্কা সেলিমার প্রতি অন্যায় সন্দেহ করেন, তাই এত কথা বলিলাম। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার আত্মা ঈশ্বরের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইবে, সেই ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে, এ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমি সেলিমার সতীধর্ম্মের তিলমাত্র হানি করি নাই। সেলিমার প্রতি যদি আপনার সকল সন্দেহ আমি দূর করিতে পারিয়া থাকি, তবে আমার মৃত্যু-যন্ত্রণা যতই ভীষণ হউক, পরলোকে আমার আত্মা শান্তিলাভ করিবে।"

বাদসাহ স্থির হইয়া সকল কথা শুনিলেন। সাকি—তাঁহার মুখ-পানে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল; বাদসাহ, সেলিমার দেহমনের নিষ্কলঙ্কতায় বিশ্বাস করিলেন কি না? কিন্তু সে ভাল বুঝিতে পারিল না। সাকি নিস্তব্ধ হইলে, বাদসাহ কঠোরকণ্ঠে ডাকিলেন,—

"মাহুম—"

কেহ উত্তর দিল না। এক ভীষণদর্শন-তাতারিণী দ্রুতপদে—নিঃশব্দে বাদসাহের সমীপে মস্তক অবনত করিয়া দাঁড়াইল। বাদসাহ বলিলেন,—"মাহুম! এই হতভাগ্যকে ভূগর্ভস্থ কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখ। ইহাকে কেহ যেন বিন্দুমাত্র রুটি জল না দেয়—অনাহারে মৃত্যু, ইহার দণ্ডবিধান করিলাম।"

মোগল-রাজান্তঃপুরে এরূপ ঘটনা নিতান্ত বিরল ছিল না। মাহুম তাতারিণী বিনা বিস্ময়ে বাদসাহের আজ্ঞাপালন করিল। সবল কঠিন হস্তে মাহুম, অপরাধীকে টানিয়া লইয়া চলিল। পথে জিজ্ঞাসা করিল, "হতভাগ্য যুবক! কেন বাঘের মুখে মরিতে আসিয়াছিলে? তোমার নাম কি?"

বন্দী বলিল,—"আমার নাম মাহরুণ।"

তাতারিণী একহাতে মাহরুণকে ধরিয়া, অন্য হাতে একটি ক্ষুদ্র কক্ষের দ্বারোদ্ঘাটন করিল। কক্ষ অত্যন্ত অন্ধকার। মাহম বলিল,—"প্রবেশ কর।"

মৃত্যুর দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াও, মাহরুণের পা কাঁপিতে লাগিল। প্রাণের মায়া জাগিয়া উঠিল। বিলম্ব দেখিয়া, তাতারিণী মুহূর্ত্তমধ্যে তাহাকে তৃণখণ্ডবৎ উত্তোলন করিয়া, সেই অন্ধকার কক্ষমধ্যে নিক্ষেপ করিল। তাহার পর সশব্দে দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

৪র্থ পরিচ্ছেদ

প্রভাতে পাহাড়ের কোলে, কতশত পাখী ডাকিয়া উঠিল। পাখীর মধুর কূজন শ্রবণে এবং শীতল সমীরণ স্পর্শে সেলিমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সেলিমা চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলেন, তিনি নিজকক্ষে পালঙ্কোপরি সুখশয্যায় শায়িত। গতরাত্রে শয়নের পূর্ব্বে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সকলি মনে পড়িল। মাথাটা যেন ধরিয়াছে, মনটা যেন কেমন হইয়া গিয়াছে। সেলিমা মৃদুস্বরে আপন মনে বলিলেন,—"সাকির সিরাজিটা বড় তীব্র ছিল।"

উন্মুক্ত বাতায়নপথে সেলিমা একবার আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, নীলাকাশের নিম্নে কয়েকখণ্ড লঘু মেঘ সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, সেই মেঘশিশুগুলি বায়ুবশে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। নভোবক্ষে কৃষ্ণবিন্দুবৎ দুই চারিটা ক্ষুদ্রকায় পার্ব্বত্য-পক্ষী উড়িতেছে। মধুর সূর্য্যকিরণ—মেঘের গায়ে অল্পে অল্পে স্বর্ণবৃষ্টি করিতেছে। প্রকৃতি নিশাপ্রভাতে হাস্যময়ী—উৎসবময়ী, কিন্তু সেলিমার হৃদয়ে যেন কি এক বিষণ্ণতার ছায়া। সেলিমা শয্যা হইতে গাত্রো-

খান না করিয়াই ডাকিলেন,—"সাকি—বাঁদি! এক ভৃঙ্গার জল লইয়া আয় তো!"

সাকি আসিল না, আর কেহও উত্তর দিল না। সেই নিদ্রাবসানে ক্লান্তিহীন মুখে বিরক্তি দেখা দিল। সেলিমা অস্ফুটস্বরে বলিলেন,— "আ! মলো, বাঁদিগুলা গেল কোথায়!" সেলিমা বিরক্তির সহিত শয্যাত্যাগ করিলেন। স্নানকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সেখানে প্রাতঃকৃত্যের উপকরণাদি সমস্তই সজ্জিত রহিয়াছে! সেলিমা দেহ-মার্জ্জনাদি সম্পন্ন করিয়া, বেশপরিবর্ত্তন করিলেন। সেই কক্ষস্থিত পরিষ্কার সুদীর্ঘ মুকুরে নিজের পরিষ্কার মুখখানি দেখিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। দেখিলেন, তাঁহার সেই সুন্দর মুখখানি যেন মলিন হইয়াছে, চক্ষুর পল্লবে যেন কালি পড়িয়াছে। মৃদুস্বরে মনে মনে আবার বলিলেন, "কল্যকার সিরাজিটা বড় তীব্র ছিল। একবার বাগানে পদচারণা করি, শরীরটা সারিতে পারে।"

সেলিমা পর্দ্দা উঠাইয়া দ্বারের বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন, উন্মুক্ত কৃপাণ-হস্তে এক তাতার-রমণী পাহারা দিতেছে।

বেগমকে দেখিয়া সে সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিল। সেলিমা একটু রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তুমি এখানে কেন?"

"বাদসাহের আদেশ।"

সেলিমা আগ্রহের সহিত বলিলেন,—

"প্রহরিণি! বাদসাহ কি আসিয়াছেন?"

"অনেকক্ষণ—কাল গভীর রাত্রে।"

"কাল রাত্রে? আমাকে ডাকেন নাই কেন?"

"বলিতে পারি না, তিনিই জানেন।"

সেলিমার মনে একটু অভিমান হইল। যাহার আশাপথ চাহিয়া তিনি দিনরাত কাটাইয়াছিলেন, সেই বাদসাহ আসিয়া তাঁহাকে

একবার স্মরণ করিলেন না! সেলিমা মনের কষ্ট মনেই সংবরণ করিলেন। ভাবিলেন, সৌন্দর্য্যের হাটে বসিয়া যাহার কারবার, সে ভালবাসার কি বুঝিবে? মনের নিম্নস্তরে অভিমানটা ধূমের মত উঠিয়া আপনা আপনি বিলীন হইল।

তখন সেলিমা জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"বাদসাহ কোথায়?"

"এ পুরীতে নাই। জিন্নৎমহলে—জিন্নৎ-বেগমের কাছে গিয়াছেন।"

"বেশ—জিন্নৎ-বেগমের অদৃষ্ট ভাল!"

অপসারিত অভিমানের ধোঁয়াটা আবার দেখা দিল। এবার একটু ঘনীভূতভাবে।

"আমার বাঁদী কোথায় গেল?"

"কোন্ বাঁদী—আদেশ করুন, ডাকিয়া দিতেছি।"

"নূতন বাঁদী—সেই সাকি।"

প্রহরিণী, সেলিমার অলক্ষিতে একটু মৃদু হাসিল। বোধ হয় ভাবিল, "সাকির উপর যে ভারি টান দেখিতেছি।" প্রকাশ্যে বলিল,—

"সে কারাগারে।"

সেলিমা অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"কারাগারে! কারাগারে তাহাকে কে পাঠাইল?"

"স্বয়ং দুনিয়ার মালিক।"

"বাদসাহ?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

"অপরাধ কি?"

প্রহরিণী মুখ লুকাইয়া আবার হাসিল! বোধ হয় ভাবিল,—"কিছুই যেন জানেন না,—ন্যাকা সাজিয়াছেন।"

প্রকাশ্যে বলিল,—"অপরাধ কি, তাহা বলিতে পারি না।"

সেলিমা বলিলেন,—"কারাগারের চাবি আনিয়া দাও, আমি তাহাকে মুক্ত করিয়া দিব। আমি মুক্ত করিয়াছি শুনিলে, বাদসাহ কিছুই বলিবেন না।"

তাতারিণী ভাবিল,—"বহুত দেখিয়াছি, কিন্তু এমন বুকের পাটা ত দেখি নাই।" প্রকাশ্যে বলিল,—

"দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন বেগমসাহেবা! বেশী কথা কহিবার আমার সময় নাই। আপনার সে দিন গিয়াছে।"

"সে দিন—কোন্ দিন?"

"সুখের দিন। দিল্লীশ্বরের আদেশে আপনি নিজগৃহে এখন বন্দিনী।"

সেলিমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অস্ফুটস্বরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"হায়! খোদা! শেষে এই করিলে!" প্রহরিণীর পানে ছল ছল নেত্রে চাহিয়া বলিলেন,—"কি অপরাধে আমার এ দুর্দ্দশা ঘটিল, জান কিছু?"

তাতারিণী বলিল,—"আমি বলিতে পারিব না বেগমসাহেবা—আমায় মার্জ্জনা করুন।"

বেগমের চিরপ্রফুল্ল-মুখে কাতরভাব দেখিয়া, প্রহরিণীর অন্তঃকরণ একটু কোমল হইল। পূর্ব্বরাত্রের ঘটনা সে মানুষের নিকট যাহা শুনিয়াছিল, তাহাই জানিত। তদতিরিক্ত আর কিছুই জানিত না। যেটুকু জানিত না, সেটুকু কল্পনার সাহায্যে পূরণ করিয়া লইয়াছিল। সেলিমার অবস্থা দেখিয়া তাহার মনে হইল,—"তবে কি বেগমসাহেবা নির্দ্দোষ?"

সেলিমা ব্যাকুলভাবে তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন,—"এই মোতির মালাছড়াটা তোমাকে পুরস্কার দিলাম। প্রকৃত ঘটনা আমাকে সমস্ত খুলিয়া বল।"

প্রহরিণী বলিল,—"সাকি বলিয়া যে বাঁদী আপনার কাছে ছিল, সে স্ত্রীলোক নহে,—ছদ্মবেশী পুরুষ!"

এই কথা বলিয়া প্রহরিণী, বেগমের প্রতি একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিল। তাহার সংশয় তখনও দূরীভূত হয় নাই।

কথাটা শুনিয়া সেলিমার আয়ত লোচনদ্বয় বিস্ময়বিস্ফারিত হইল। বলিলেন,—"পুরুষ! অসম্ভব! তাহার অমন সুন্দর কোমলতাময় মুখ—অত মিষ্ট কণ্ঠস্বর, অমন সলজ্জ হাবভাব! সে লজ্জায় আমার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহিত না।"

"সে আপনাকে প্রতারণা করিয়াছে।"

"আচ্ছা—তার পর, বলিয়া যাও।"

"কাল রাত্রে বাদসাহ ফিরিয়া আসিয়া, একবারে আপনার শয়ন-কক্ষে উপস্থিত হন। বোধ হয়, আধ ঘণ্টা পরে মাহুমের তলব হইল। সে গিয়া দেখিল, আপনি পালঙ্কোপরি নিদ্রিত, বাদসাহ দাঁড়াইয়া আগুনের মত জ্বলিতেছেন। ছদ্মবেশী সাকি, তাঁহার সম্মুখে অবনত-মুখে দাঁড়াইয়া আছে। বাদসাহের আদেশে তাহাকে ভূগর্ভস্থ কারা-গারে বন্ধ করা হইয়াছে।"

সেলিমা থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন, বলিলেন,—"কে সে হতভাগ্য, আমার এমন সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছিল?"

"শুনিয়াছি—নাম মাহরুণ।"

সেলিমা আর সেখানে দাঁড়াইলেন না। সহস্র দাবানলের জ্বালা লইয়া দ্রুতপদে আপনার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতেছিলেন, পা বাধিয়া পড়িয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গেই মূর্চ্ছা আসিয়া তাঁহার যন্ত্রণা লাঘব করিয়া দিল।

মূর্চ্ছাভঙ্গের পর সেলিমা দেখিলেন, একজন বাঁদী তাঁহার গায়ে হাত বুলাইতেছে, তিনি তাঁহার নিজের শয্যায় শুইয়া আছেন। চেতনা-

প্রাপ্তির পর, পূর্ব্বস্মৃতি সেলিমার হৃদয়ে বৃশ্চিকদংশনের মত তীব্র জ্বালা উপস্থিত করিল।

সেলিমা মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"মাহরুণ! মাহরুণ! তুমিই শেষে আমার এই সর্ব্বনাশ করিলে! জগতের চক্ষে আমাকে চিরকলঙ্কিনী করিলে! কলঙ্ক লইয়া কি সুখে বাঁচিয়া থাকিব? যেখানে সম্রাজ্ঞী ছিলাম, সেখানে বাঁদী হইয়া কি সুখে কাল কাটাইব? ছি! মাহরুণ! তোমার সে সব গুণ কোথায় গেল? তুমি কি আজকাল এতই কলুষিত হইয়াছ? হে জগদীশ্বর! হে বেহেস্তের মালিক! তুমি সাক্ষী, আমি নিষ্পাপ। আমি কখনও জ্ঞানতঃ সতীধর্ম্মের বিরুদ্ধে অপরাধ করি নাই। কিন্তু বেগমের অন্তঃপুরে—তাহার শয়নকক্ষের মধ্যে একজন ছদ্মবেশী পুরুষ ধরা পড়িয়াছে—আমি যে নির্দ্দোষী, দিল্লীর অত বড় বাদসা কেন তাহা বিশ্বাস করিবেন!"

"বাদসাহের মনে যদি প্রকৃত ভালবাসা থাকিত, তবে তিনি ত একবার আমায় জিজ্ঞাসাও করিতে পারিতেন! তাহাও করিলেন না, চলিয়া গেলেন! এ কলঙ্ক সহজে ঘুচিবে কি? যিনি পায়ে ঠেলিয়াছেন, তিনি আর পায়ে রাখিবেন কি? যদি কলঙ্ক না যায়, তবে জীবনে, আর প্রয়োজন কি? মৃত্যুই এখন আমার পরম সুহৃদ্। কিন্তু এ ভরাযৌবনে, সকল সাধ অপূর্ণ রাখিয়া কেন মরিব? বাদসাহ ভ্রান্ত, তাঁহাকে বুঝাইব, তাঁহার চরণে ধরিয়া কাঁদিব, তাহাতেও কি তাঁহার মন গলিবে না? না হয়, তখন জহর খাইয়া মরিব।"

সেলিমা শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। দাসী বলিল,—"উঠিবেন না, মাথায় বড় আঘাত লাগিয়াছে।"

সেলিমা একটু হাসিলেন। সেই দুঃখের সময়েও তাঁহার মুখে হাসি আসিল। মনে মনে বলিলেন, "বাঁদি! যে আঘাত হৃদয়ে পাইয়াছি, তাহার মর্ম্ম তুই কি বুঝিবি?"

বাত্যাসংক্ষুব্ধ সমুদ্রের প্রবলোচ্ছ্বাস প্রশমিত হইবার পর, একটা স্থিরভাব আসে; এখন সেলিমার হৃদয়ের অবস্থা সেইরূপ। তিনি ভাবিলেন,—"যে ভালবাসে, তাহাকে অত্যন্ত হীন হইতে হয়। আমি তাঁহাকে ভালবাসি। তিনি অনেক উপরে—তিনি দুনিয়ার বাদসাহ। আমি তাঁহার দাসী, সামান্য প্রজা, কোন্ ছার আমি? কেন না আমি তাঁহাকে পায়ে ধরিয়া সাধিব? এমন দিনও ত গিয়াছে, যে দিন তিনি আমার পায়ে ধরিয়া সাধিয়াছেন। কিন্তু এখন তাঁহাকে পাই কোথায়?"

সেলিমা মনে ভাবিলেন,—"একখানা পত্র লিখিয়া দিই। একবার ডাকিয়া পাঠাই। না আসেন, তখন যাহা মনে আছে, তাহাই করিব।"

পত্রখানা লিখিয়া সেলিমা নিজে শীল দিয়া মোড়ক করিলেন। একজন বাঁদীকে ডাকিয়া, বলিলেন,—"এই পত্রখানা জিন্নৎমহলে বাদসাহের হাতে দিয়া আয়। জবাব না লইয়া আসিস্ না।"

দাসী চলিয়া গেল। সেলিমা তখন কক্ষের দ্বার অর্গলিত করিয়া, অশ্রুপ্লাবিতনেত্রে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—, "জগদীশ্বর! এই করিও, যেন অপমানিত না হইতে হয়। তিনি যেন বাঁদীকে ফিরাইয়া না দেন। যেন তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসেন।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হর্ম্ম্যতলে বিস্তৃত, সুন্দর শিল্পময় বসোরার কার্পেটের উপর বহুমূল্য জড়োয়া কাজকরা আস্তরণ-শয্যা। তাহার উপর অতুল রূপশালিনী জিন্নৎ-বেগম—আর পাশে বসিয়া দীন্‌দুনিয়ার মালিক বাদসাহ সাজাহান।

বাদসাহ বলিলেন,—"জিন্নৎ! আর এক পেয়ালা ঠাণ্ডা সিরাজি দাও, বড় তৃষ্ণা। সরবৎ বড় গরম, সিরাজিতে শীঘ্র নিদ্রা আসিবে

কক্ষের প্রতি গবাক্ষে বিলম্বিত, উজ্জ্বল নীলবর্ণ রেসমী পরদার

ভিতর দিয়া তীব্র দিবালোক গৃহসজ্জার উপর মৃদুভাবে বিচ্ছুরিত হইতেছে। কক্ষের চারিদিকে গোলাপের সুগন্ধ আকুল হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মর্ম্মরের আধারস্থিত কৃত্রিম ক্ষুদ্র প্রস্রবণ হইতে মুক্তাধারার ন্যায় গোলাপজলরাশি উত্থিত হইয়া, নিম্নস্থ স্বর্ণখচিত পাত্রে ছড়াইয়া পড়িতেছে! স্বর্ণময় দাঁড়ের উপর কোথাও নিদ্রালস ভীমরাজ চোখ বুজিয়া ঝিমাইতেছে, কোথাও রঞ্জিতগাত্র বুল্‌বুল্ নীরবে শস্যাংশ উদরসাৎ করিতেছে—কোথাও বা শ্যামা মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া উঠিতেছে।

বাদসাহ চোখ বুজিয়া বলিলেন,—"জিন্নৎ! প্রাণেশ্বরি! একবার বীণ্ বা এস্‌রাজটায় ঝঙ্কার দাও। কিছুই ভাল লাগে না যে।"

সুগঠিত, নাতিখর্ব্ব, নাতিদীর্ঘ দেহ লইয়া, সুনীল রঙের ওড়নার মধ্য দিয়া বিকীর্ণ, রূপজ্যোতির তীব্র তরঙ্গ খেলাইয়া, একটী তীব্র কটাক্ষ হানিয়া, পিঠের উপর বিলম্বিত বিনায়িত ঘনকৃষ্ণ বেণী দুলাইয়া, বিম্বাধরে একটু মধুর হাসি হাসিয়া, জিন্নৎ-বেগম নিজেই বীণাটী পাড়িয়া লইলেন। সুর বাঁধিবার জন্য বীণার কাণ মোচড়াইবার সময়, সেই সুন্দর গ্রীবাদেশ নানা ভঙ্গিতে হেলিতে দুলিতে লাগিল। আওয়াজ যখন বেসুরা বোধ হইতেছে, তখন একটা বিরক্তির ভাব—আবার যখন সুর মিলিতেছে, মিঠা লাগিতেছে, বশে আসিতেছে, তখন একটা হাসির রেখা, সন্তোষের চিহ্ন—সেই ইন্দীবরতুল্য নয়ন ও বিম্বোষ্ঠের প্রান্তদেশে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

সুর ঠিক হইলে, বীণ্‌টার পরদায় পরদায় যেন রাগরাগিণীর জীবনীশক্তি জাগিয়া উঠিল। কঙ্কণশোভিত, মৃণালগঞ্জিত বামহস্তে যন্ত্রটী ধারণ করিয়া, জিন্নৎ দক্ষিণহস্তে বাদন আরম্ভ করিলেন। ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে সুরের তরঙ্গ খেলিতে লাগিল। বাদসাহ শয়িতাবস্থাতেই "কেয়াবাৎ," "খপ্‌সুরৎ," "বহুত আচ্ছা বিবি" প্রভৃতি প্রচলিত বাক্যে

সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আজ জিন্নৎ-বেগমের প্রাণে অপার আনন্দ। অনেক দিন পরে আজ সেলিমা-বেগমের কবল হইতে তিনি বাদসাহকে উদ্ধার করিয়াছেন। তাহার পর দিল্লীশ্বর কথায় বার্ত্তায় এমন ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, যাহাতে জিন্নৎ-বেগম আশা করিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহার এ সৌভাগ্য কিছুকাল স্থায়ী হইবে। তাই তিনি নিজের বীণাবাদন শুনিয়া, নিজেই বিভোর। মনের আনন্দ আর চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া জিন্নৎ গান ধরিলেন,—

তেঁহু ফুলি মতিয়া বন বাগানে।
বোলে ডোলে কোয়েলিয়া
কুঞ্জে গুঞ্জে গুঞ্জরে ভৃঙ্গণমে—
পাপিয়া ফুকারে পিয়া পিয়া পিয়া।

গানটার আস্থায়ীর উপর বাধা পড়িল। এক বাঁদী আসিয়া এক খানি পত্র বেগমের সম্মুখে ধরিল।

জিন্নৎ-বেগম বলিলেন,—"কেয়া খবর বাঁদী ?"

বাঁদী বলিল,—"নয়া-বেগম জাঁহাপনাকে চিঠি দিয়াছেন, জবাবের জন্য খাড়া থাকিবার হুকুম।"

বাদসাহ তখন কতক বা সিরাজির মাদকতায়, কতক বা বেগমের কোমল-কণ্ঠনিঃসৃত মধুর সঙ্গীতের মোহিনীশক্তিতে, অর্দ্ধসুপ্ত অবস্থায় শয্যার উপর গড়াইতেছেন। জিন্নৎ, বাদসাহের দিকে একবার সতর্ক দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, পরে মনে মনে পত্র পড়িতে লাগিলেন :—

"জীবিতেশ্বর !"

"দাসী অপরাধিনী নহে। যে কলঙ্ক তাহার শিরে স্পর্শিয়াছে, সে সম্বন্ধে সে একান্তই নির্দ্দোষী। বাদসাহ, যাহা ভাবিয়াছেন, তাহা ভ্রম।"

"যদি সন্দেহই হইয়াছিল, তবে অধিনীকে একবার ডাকিয়া

জিজ্ঞাসা করিলেই বা কি ক্ষতি ছিল? তাহার বড়ই দুর্ভাগ্য যে, সে এত শীঘ্র আপনার বিশ্বাস হারাইল।"

"সাহান্‌সা চির-অধিনীর উপর এ নিগ্রহ কেন? যদি যথার্থই অপরাধিনী বিবেচনা করিয়া থাকেন, তবে তাহাকে জল্লাদের হাতে সমর্পণ করিয়া একটা কীর্ত্তি রাখুন;—কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে সে একবার আপনার শ্রীচরণ দর্শনের অভিলাষিণী। এ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইলে, সে সুখে মরিতে পারিবে।"

হতভাগিনী—সেলিমা।

পত্র পড়িয়া জিন্নৎ-বেগম ঈর্ষ্যায়, ক্রোধে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। মনে ভাবিল, এই সুযোগে কণ্টকটাকে দূরীভূত করিতে না পারিলে, আমার আর শুভগ্রহ নাই। বাদসাহের নামে পত্র—তাঁহাকে শুনাইতেই হইবে।

জিন্নৎ দেখিলেন—সাজাহান শয্যার একাংশে পড়িয়া সুখস্বপ্ন দেখিতেছেন। হিন্দুস্থানের সম্রাট্, অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে দিল্লীর প্রাসাদ ছাড়িয়া, হুরীদের স্বপ্নময় রাজ্যে ভ্রমণ করিতেছেন। জিন্নৎ-বেগম অতি ধীরে বাদসাহের নিকটবর্ত্তী হইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন,—"সাহান্‌-সা, এক পত্র আসিয়াছে।"

বাদসাহ একবার চাহিলেন। বিজড়িতস্বরে বলিলেন,—"কাহার পত্র? বেহেস্ত হইতে কোনও হুরীর পত্র আসিয়াছে না কি?"

জিন্নৎ একটু হাস্য করিয়া বলিলেন,—"বেহেস্তের হুরী নয়, তবে এই মর্ত্ত্যের বটে। সেলিমা-বেগম পত্র লিখিয়াছে।"

বাদসাহ তখন আবার চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছেন। জিন্নৎ বলিলেন,—"জাঁহাপনা! পত্র বড় জরুরি, হুকুম হইলে ভাল হয়।"

বাদসাহ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কার পত্র?"

জিন্নৎ উত্তর করিলেন,—"সেলিমা-বেগমের।"

সেলিমার নাম শুনিয়া বাদসাহের মুখে ঘৃণা ও বিরক্তির ভাব প্রকটিত হইল। মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—"আমি সে শয়তানীর পত্র স্পর্শ করিব না।"

জিন্নৎ তাহাই চান। বলিলেন,—"আমি পড়িয়া শুনাইব কি?"

বাদসাহ বলিলেন, "পড়িতে হইবে না, কি লিখিয়াছে,সংক্ষেপে বল।"

জিন্নৎ বলিলেন,—"লিখিয়াছে, তাহার যখন কপাল ভাঙ্গিয়াছে, তখন তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হউক।"

পত্রে এ কথা ছিল না। জিন্নৎ—পিশাচী—শয়তানী।

বাদসাহ অনেক কষ্টে চক্ষু খুলিয়া, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,—"পাপীয়সীর এখনও চৈতন্ত হয় নাই? তাহাকে ছাড়িয়া দিব, কি কুকুর দিয়া খাওয়াইব, তাহাই ভাবিতেছি।"

জিন্নৎ-বেগম যুক্তকরে বলিলেন,—"সাহান্-সা, আপনি দুনিয়ার মালিক—সে সামান্ত স্ত্রীলোক—অতি ক্ষুদ্র, আপনার ক্রোধের যোগ্য নহে। তাহাকে ছাড়িয়া দিন। সে হতভাগিনীর অপরাধ গুরুতর বটে, কিন্তু তাহাকে বধ করিলে, আপনার মহৎ নামে কলঙ্ক হইবে।"

জিন্নৎ মনে মনে বুঝিয়াছিলেন, এখন এইরূপ দুই চারিটা মুখ-রোচক কথায় বাদসাহকে উত্তেজিত করিতে পারিলেই কার্য্যসিদ্ধি। পাপিষ্ঠার উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হইল।

বাদসাহ বলিলেন,—"জিন্নৎ-বিবি! কোন কথা শুনিতে চাহি না। যাহা বলি, জবাব লিখিয়া দাও।"

বাদসাহের আদেশে জিন্নৎ লিখিতে লাগিল;—

"তোমার লজ্জা হইল না, তাই আবার পত্র লিখিয়াছ? তুমি পিশাচী—ক্ষমার পাত্র নও। আজ হইতে তোমার নির্জ্জন-কারাবাস আদেশ হইল। অপরাধ অমার্জ্জনীয়। অন্য দণ্ডের কথা পরে বিবেচনা করিব।"

বাদসাহ নিজের অঙ্গুরীয় ফেলিয়া দিলেন। তাহার ছাপ পত্রের পাদদেশে পড়িল।

বাদসাহ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার উপর জিন্নৎ-বেগম এই কয় ছত্র যোগ করিয়া দিল;—

"পার যদি, বিষ খাইয়া মরিও। এ লজ্জার ভার বুকে লইয়া আর বাঁচিবার প্রয়াস করিও না।"

এই কয় ছত্র বাদসাহকে শুনান হইল না।

পত্র লইয়া বাঁদী চলিয়া গেল। সেই সঙ্গে সঙ্গে জিন্নৎ-বেগমের কার্য্যতৎপরতায় আর একখানি পরোয়ানা সহিসংযুক্ত হইয়া, মোতি-মহলে মাহুম-তাতারিণীর হস্তে পৌছিল। সেখানি সেলিমার নির্জ্জন কারাবাসের আজ্ঞা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সব যায়—কেবল আশা শেষ পর্য্যন্ত চলিয়া যায় না। সেলিমার সব গিয়াছে, কিন্তু আশা আর কিছুতেই বিদায় চাহে না। প্রত্যেক পদ-শব্দে সেলিমা চমকিয়া উঠিয়া বসে—ভাবে, "বুঝি অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন—সন্দেহ দূর হইয়াছে—তাই আসিতেছেন।" কেহই আসে না। তবু আশাও যায় না।

দিবসের তৃতীয় প্রহর পূর্ণপ্রায়। বাঁদী তখনও ফিরিল না। সেলিমা তখন আশাকে ধীরে ধীরে বিদায় দিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় ক্রমশঃ শূন্য হইয়া পড়িতে লাগিল। এত বেলা সেলিমার অনা-হারে কাটিয়াছে। দাসীরা নিয়মিত খাদ্যদ্রব্য দিয়া গিয়াছে, তিনি তাহার বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করেন নাই। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—তিনি না আসিলে,—এখানে আহারের পথ জন্মের মত উঠাইব!

অনেকক্ষণ পরে বাঁদী ফিরিয়া আসিল। তাহার মুখ শুষ্ক দেখিয়া সেলিমা সবই বুঝিলেন। তবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তিনি কই ?"

বাঁদী রুদ্ধকণ্ঠে বলিল,—"তিনি আসিলেন না।"

"আসিলেন না ? কখন আসিবেন বলিলেন ?"

বাঁদী উত্তর না করিয়া, পত্রখানি তাহার হাতে দিল। সেলিমা পত্র খুলিয়া দেখিলেন,—জিন্নৎ-বেগমের হস্তাক্ষর। ঘটনা বুঝিতে কিছুই বাকি রহিল না।

সেলিমা দুঃখে, মনস্তাপে, অভিমানে ফুলিতে লাগিলেন। বাঁদীকে বলিলেন,—"তুই বাহিরে যা, আমি একটু ঘুমাই।"

বাঁদী বাহিরে গেল। সেলিমা দ্বার বন্ধ করিয়া মেঝের উপর শুইলেন। ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া অনেকক্ষণ কাঁদিলেন।

সূর্য্যদেব তখন হিমাচলের পশ্চিমচূড়ার অন্তরালে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে। সুন্দরী সেলিমা উঠিয়া বসিয়া, অনেকক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে কত কি ভাবিলেন। মুখে নিরাশার—দৃঢ়প্রতিজ্ঞার করাল ছায়া।

মস্যাধার লেখনী লইয়া সেলিমা, বাদসাহকে জীবনের শেষ কথা-গুলি শুনাইবার জন্য এক পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন,—

"জীবিতেশ্বর ! বাদসাহ ! দুনিয়ার বিচারপতি, তোমার হুকুম—আমি বিষ খাইয়া মরিব ! তোমার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিব। কিন্তু জিন্নৎ-বেগমের ছলনায় পড়িয়া যে আমার এই শোচনীয় পরিণাম ঘটিল, ইহা ভাবিয়া প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে। স্বামিন্ ! তুমি স্বহস্তে নিকটে দাঁড়াইয়া যদি বিষের পাত্র তুলিয়া দিতে, দেখিতে—দাসী কিরূপ সাহসে বুক বাঁধিয়া, তোমার মুখের দিকে চাহিয়া স্বচ্ছন্দে বিষপান করিত।"

"আমি নির্দোষী। হিন্দুস্থানের বাদসাহ তুমি, ঠিক বিচার করিতে

পারিলে না। কিন্তু এই দীন্ দুনিয়া যাঁহার বিচারে চলিতেছে, তাঁহার কাছে আমি সুবিচার পাইব।"

"জাঁহাপনা! প্রাণ ত অতি তুচ্ছ। এ প্রাণ তোমারই সেবায় সমর্পিত হইয়াছিল। তোমার কাজে যখন লাগিল না, তখন আর অসার প্রাণ রাখিয়া ফল কি?"

"আমার বড় সাধ হইয়াছে, মরিবার পূর্ব্বে তোমায় একবার দেখিব! সে আশা পূর্ণ হইল না! কোনও সাধই পূরিল না। চাঁদের আলোয় মরিতে বড় সাধ যায়, কিন্তু চাঁদ অনেক রাত্রে উঠিবে—ততক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিব না। নির্ঝরিণীর গান শুনিতে শুনিতে মরিতে বড় সাধ যায়, কিন্তু কে আমায় নির্ঝরিণীর তটে পৌঁছিয়া দিবে? জ্যোৎস্না গায়ে মাখিয়া, ফুলের শয্যায় শুইয়া, তোমার কোলে মাথা রাখিয়া, মরিতে সাধ যায়, কিন্তু কে সে সাধ পূর্ণ করিবে? একটা শেষ অনুরোধ করিতেছি, যদি ইচ্ছা হয় ত রক্ষা করিও। আমার উত্তরের জানালা খুলিলে, উপত্যকায় যে গিরিনদী দেখা যায়, উহার তীরে, চন্দ্রোদয়ের সময়, আমাকে সমাহিত করিবার হুকুম দিও। আর সেখানে কখনও কোনও প্রহরী সিপাহী রাখিয়া, আমার নির্জ্জন-বিশ্রাম ভঙ্গ করিও না।"

সেলিমা পত্র সমাপ্ত করিয়া, তাহাতে শীল করিলেন। বাদসাহের নামে শিরোনামা লিখিয়া, এক স্বর্ণময় পাত্রে গুটিকয়েক সুগন্ধি ফুলের সঙ্গে পত্রখানি রাখিলেন। বাদসাহ কিম্বা অন্য কাহারও সহসা চোখে পড়ে, এমন একস্থানে তাহা রাখিয়া দিলেন।

সেলিমার হস্তে এক বহুমূল্য অঙ্গুরীয় ছিল। বাদসাহ প্রেমোপহারস্বরূপ একদিন সেলিমাকে তাহা দিয়াছিলেন। সেই অঙ্গুরীয়, মহাবিষের আধার জহরখণ্ড বুকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। সেলিমা তাহার প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া একটু হাসিলেন। সেই চিন্তাক্লিষ্ট,

মলিন, পাণ্ডুবর্ণ মুখ,—যে মুখে এখনও রূপের জ্যোতিঃ ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে, যেন একটু প্রফুল্লতাময় হইল।

সেলিমা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রেম গিয়াছে, আশা গিয়াছে, জীবনের অবলম্বন গিয়াছে। সেলিমা হৃদয়ে যথেষ্ট বলসঞ্চয় করিয়া, একবার অঙ্গুরীয় লেহন করিলেন। দ্বিতীয়বার লেহনকালে আকাশের দিকে চাহিলেন; কাতরকণ্ঠে অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে, অনুতপ্ত-হৃদয়ে ঊর্দ্ধমুখে বলিলেন,—"দয়াময়! তুমি সাক্ষী, চলিলাম। তোমার পায়েই লুটাইতে চলিলাম। তোমার এত বড় জগতে আমার ন্যায় ক্ষুদ্রের যখন স্থান হইল না, তখন আর অন্য উপায় কি? কিন্তু যদি তোমার পদে মতি থাকে, তবে মৃত্যুর পূর্ব্বে যেন একবার তাঁহাকে দেখিতে পাই।"

সেলিমা উত্তেজিতভাবে পুনঃপুনঃ সেই গরলাধার অঙ্গুরীয় লেহন করিতে বসিলেন। লালাস্পৃষ্ট মহাবিষ তাঁহার পুষ্পসুকোমল শরীরে শীঘ্রই স্বীয় কার্য্য প্রকাশ করিল। শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল, চক্ষু কপালে উঠিল। মাথা ঘুরিতে লাগিল। সেলিমা নিজ দুগ্ধফেননিভ শয্যার উপর ঢলিয়া পড়িলেন। কাতরস্বরে বলিলেন,—"মাহরুণ! তুমি আমায় অত ভালবাস, আমি তোমায় চিরদিনই অনুৎসাহিত ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছি। বাদসাহ! প্রাণেশ্বর! ক্ষমা কর, যেন এই আত্মহত্যার পাপে, সয়তানে আমার দেহ স্পর্শ করিতে না পারে। স্বামী, স্ত্রীলোকের মহাগুরুস্বরূপ, আমি তাঁহার আজ্ঞায় যাহা করিতেছি, তজ্জন্য যেন আমাকে পাপস্পর্শ না করে।"

সেলিমা অতিকষ্টে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

মুহূর্ত্ত পরে বাদসাহ সাজাহান সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। আলো জ্বলিতেছে, সেলিমা শয্যায় বিলুণ্ঠিতা।

সেলিমার মুখের কাছে গিয়া বাদসাহ দেখিলেন, সেই কাঁচা সোণার মত রঙ নীলাভ হইয়া গিয়াছে। মুখ শুষ্ক—সরস ওষ্ঠপুট রসহীন।

বাদসাহের বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। রুদ্ধনিশ্বাসে তিনি ডাকিলেন,—

"বিবিজান—বিবিজান—পিয়ারি"—

সেলিমার বিম্বাধর একটু নড়িয়া উঠিল। নিশ্বাস মৃদুতর বেগে বহিল। চক্ষুর পল্লবযুগল কাঁপিল, অল্পে অল্পে সেলিমা চক্ষু মেলিলেন।

বাদসাহ কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"সেলিমা! পিয়ারি! কি হইয়াছে?"

সেলিমার চক্ষুর্দ্বয় আর একটু বিস্ফারিত হইল। সে ক্ষীণ করুণ দৃষ্টি বাদসাহের মুখের উপর সন্নিবদ্ধ হইল—সেলিমা, লোক ভাল চিনিতে পারিতেছে না।

বাদসাহ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কি সর্ব্বনাশ করিয়াছ সেলিমা?"

সেলিমা জড়িতকণ্ঠে বলিল,—"প্রিয়তম, আসিয়াছ! তোমার হুকুম প্রতিপালন করিয়াছি—বিষ খাইয়াছি।"

বাদসাহ তাহা পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বুঝিয়া দিক্‌বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। কোন উপায় তাঁহার মাথায় আসিতেছিল না।

সেলিমার মুখ হইতে এই কথা শুনিবামাত্র সাজাহান উন্মাদের মত হইলেন। সেলিমা যে তাঁহার বড় আদরের মহিষী। দ্বারদেশে প্রহরিণী ছিল, চীৎকার করিয়া বলিলেন—"হকিম—শীঘ্র হকিম ডাক।"

সেলিমার কাণে এ কথা পৌছিল, বলিল—"প্রভু! হকিম আর কি করিবে? আমি যে তীব্র হলাহল লেহন করিয়াছি, তাহা হইতে বাঁচান ঈশ্বর ভিন্ন কাহারও সাধ্য নাই।"

বাদসাহ, সেলিমার শয্যাপার্শ্বে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া, তাহার সেই

ক্ষীণস্পন্দিত নিরাশমথিত বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"সেলিমা! এ কাজ কেন করিলে?"

সেলিমা জড়িতকণ্ঠে বলিল,—"প্রাণাধিক! যদি আর একটু আগে আসিতে তাহা হইলে হয় ত মরিতাম না। তোমায় দেখিলে আবার বাঁচিবার সাধ হইত!"

বাদসাহ প্রেমভরে সেলিমার কণ্ঠদেশ আলিঙ্গন করিলেন। রুদ্ধস্বরে বলিলেন,—"সেলিমা! আমি নারীঘাতক, তোমার প্রেমের উপযুক্ত নহি। তুমি স্বর্গের দেবী, আমি চিনিতে পারি নাই। কিন্তু তুমি আমায় ছাড়িয়া চলিলে কেন? সেলিমা! সেলিমা! কথা কও, মার্জ্জনা কর।"

কে কথা কহিবে? সেলিমার ক্ষীণগণ্ডে তখন আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায়—জীবনীশক্তি ক্রমশঃ পর্য্যবসিত। দুঃখ, কষ্ট, নিরাশা, ভগ্ন-হৃদয়, উপেক্ষা, অনাদর, অপমান, সবই এই পৃথিবীর জিনিস। এগুলি পৃথিবীকে ফিরাইয়া দিয়া—সেলিমা মৃত্যুর পূর্ব্বে হৃদয়ে পরম শান্তিলাভ করিয়াছে। বাদসাহের কাতর কণ্ঠ—কাজেই তাহাকে বিচলিত করিতে পারিল না।

বাদসাহ ক্ষিপ্তের ন্যায় পুনরায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "হকিম —হকিম।"

কিন্তু হকিম আসিবার বিলম্ব সহিল না। দীপ নিবিল, সব ফুরাইল।

সেই দৃঢ়চিত্ত, অসীমশক্তিসম্পন্ন ভারতেশ্বর সাজাহান, তখন বালকের ন্যায় সেলিমার মৃত্যু-শয্যার উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার উষ্ণ অশ্রুপ্রবাহ সেলিমার নিশ্চল, নিস্পন্দ, তুষারশীতল দেহের উপর গড়াইয়া পড়িল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মাহরুণ সেই অন্ধকারময় কক্ষে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্রই তাহার তলদেশ কাঁপিয়া উঠিল। ক্রমশঃ তাহা মাহরুণকে লইয়া নিঃশব্দে দুলিতে দুলিতে নিম্নে নামিতে আরম্ভ করিল। মাহরুণ ভাবিল, বুঝি সর্ব্বংসহা ক্ষমাময়ী পৃথিবীও তাহার ভার সহিতে সম্মত নহেন। সুগঠিত হর্ম্ম্যতল যে এরূপভাবে নীচে নামিয়া যায়, তাহা এই বিপদের সময় তাহার মনে মহাবিস্ময়ের সঞ্চার করিল। সহসা সশব্দে সেই নিম্নগামী হর্ম্ম্যতল দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল। উভয় অংশই নিম্নাভিমুখী। মাহরুণ গড়াইয়া ভূগর্ভস্থ কারাকক্ষে পড়িয়া গেল। মস্তকে বিষম আঘাত পাইয়া, তৎক্ষণাৎ তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইল।

সংজ্ঞাপ্রাপ্তির পর দেখিল, তাহার চারিদিকে গভীর অন্ধকার বিরাজ করিতেছে। উর্দ্ধে, অধোদেশে, আশেপাশে সূচীভেদ্য অন্ধকার। দিন কি রাত্রি, কিছুই নির্ণয় করিবার উপায় নাই। মাহরুণ তাহার চারিপার্শ্বে হস্ত সঞ্চালন করিল। কক্ষের তলদেশ প্রস্তরময়। সে সরিয়া সরিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত হস্তসঞ্চালন করিল। একস্থানে, ভিত্তির পাদমূল অনুভূত হইল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া হস্তস্পর্শ দ্বারা জানিল, ভিত্তি মনুষ্যহস্ত গ্রথিত নহে—পর্ব্বতগাত্র ক্ষোদিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। সে ভিত্তি ধরিয়া ধরিয়া চারিদিকে ফিরিতে লাগিল। সর্ব্বত্রই ঐরূপ—কেবল একস্থানে প্রস্তর নাই,—লৌহ। স্পর্শ দ্বারা অনুমান করিল, তাহা ঐ মৃত্যু-কক্ষের কবাট হইবে; বাহির হইতে বন্ধ আছে।

হতভাগ্য আবার হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল। কিন্তু অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিল না। আবার উঠিয়া, ভিত্তি ধরিয়া চারিদিকে বেড়াইতে লাগিল। শ্রান্ত হইয়া আবার বসিল। এ অবস্থা ক্রমে তাহার নিতান্ত অসহ্য হইল। সে প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"এমন করিয়া আমায় রাখিও না—দয়া কর—তরবারির দ্বারা আমায় হত্যা কর"।

হতভাগ্য বন্দীর বিকট-চীৎকার, সেই অন্ধতমসাবৃত কারাকক্ষকে প্রেতপুরীর ন্যায় আকুলিত করিয়া তুলিল। বন্দী সেই শব্দে নিজেই ভয় পাইল। বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল। উন্মত্তের মত ভিত্তিগাত্রে বজ্রমুষ্টি প্রহার করিল। জমাট পাথর টলিল না, নড়িল না—মাহরুণ, শুধু হাতে বিষম ব্যথা পাইল।

মাহরুণ তখন ভাবিল, একটু নিদ্রা যাই। অনেকক্ষণ শয়ন করিয়া রহিল, কিন্তু নিদ্রা কোথায়? পাপিষ্ঠ ভাবিল, নিদ্রা স্বর্গের পরী, কোন্ দুঃখে এই কারাগুহায় অবতরণ করিবে? বহুক্ষণ পরে চক্ষু খুলিয়া দেখিল, কক্ষের জমাট অন্ধকার একটু বিরল হইয়াছে। মনে করিল, ইহা চক্ষের ভ্রম হইবে;—আবার চক্ষু বুজিল। অনেকক্ষণ পরে চক্ষু খুলিয়া, দেখিল, ভ্রম নহে—উপরে একটী ছিদ্র পরিদৃশ্যমান; সেই পথে সামান্য আলোক প্রবেশ করিয়াছে। তবু অন্ধকার সম্পূর্ণ-ভাবে দূরীভূত হয় নাই,—গাঢ়তা কিঞ্চিৎ কমিয়াছে মাত্র। মাহরুণ ভাবিল, রাত্রি প্রভাত হইয়া থাকিবে।

বেলা যত বাড়িতে লাগিল, সেই ছিদ্রপথ অল্পে অল্পে উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল। ক্রমে সেই বর্দ্ধিতালোকে মাহরুণ আপনার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইল। তখন তাহার মন যেন কতকটা শান্ত হইল।

কিন্তু এই শান্তি অধিকক্ষণ রহিল না। যতক্ষণ অন্ধকার ছিল, ততক্ষণ যেন মাহরুণ কি এক ভাববশে অভিভূত ছিল। এখন যেন নিজেকে সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল। তখন আরম্ভ হইল—চিন্তা—আপনার অদৃষ্টচিন্তা। সে চিন্তার কি আর শেষ আছে? বাদসাহ নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছে, "অনাহারে মৃত্যুই ইহার দণ্ডবিধান করিলাম"—সুতরাং দুইদিনে হউক, চারিদিনে হউক, জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সে চিন্তার শেষ হইবে।

চিন্তায় মাহরুণের সমস্ত দিন কাটিল। সেলিমার চিন্তা আর মৃত্যুর চিন্তা—মৃত্যুর চিন্তা আর সেলিমার চিন্তা। যখন দিবা অবসান হইয়াছে, তখন মাহরুণের মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। তাহার মনের চিন্তা, কতটুকু মৃত্যুর, কতটুকু সেলিমার, সে আর ভাল বুঝিতে পারিল না। দুটী চিন্তা যেন একাকার হইয়া গেল।

আবার অন্ধকার বাড়িতে লাগিল। ছিদ্রপথের আলোকটুকু যায়, আর থাকে না। মাহরুণ ব্যাকুল হইয়া সেই দিক পানে চাহিয়া রহিল। যেন সমস্ত দিনের পর প্রিয়তম সুহৃৎ বিদায় গ্রহণ করিতেছে।

ক্রমে আলো নিবিয়া গেল। আবার যে অন্ধকার—সেই অন্ধকার! বিরামহীন অন্ধকার—সে বড় ভয়ানক! সেই দুর্ভাগ্যের কষ্ট দেখিয়া নিদ্রাদেবী আর যেন থাকিতে পারিলেন না;—তাহার চক্ষু দুটীতে কোমল করপদ্ম বুলাইয়া দিলেন। নিদ্রার কৃপায় মাহরুণ আলোক অন্ধকার ভুলিল, প্রাণের কাতরতা ভুলিল, নিজের শোচনীয় অস্তিত্ব ভুলিয়া, এক অজানিত স্বপ্নময় রাজ্যে বিচরণ করিতে লাগিল।

মাহরুণ সে দিন একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিল। যেন খুব আলো হইয়াছে—বীণা বাঁশী বাজিতেছে—অদূরেই যেন ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য। সেখান হইতে এক মনপ্রাণহারী সুগন্ধ আসিতেছে। সেখানকার বাতাস অতি শীতল—চারিদিকে সুবাসিত, প্রস্ফুটিত, শুভ্র ফুলের বাগান। বাগানের স্বর্ণময় বিটপীর উপর বসিয়া কত শত হিরণ্যবক্ষ পাখী ঝঙ্কার করিতেছে। ফুলের সুগন্ধ মথিত করিয়া, তাহার স্বর্গের সুবাসিত বায়ুস্তরের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে উড়িতেছে। পথের মাঝে মাঝে পরিষ্কার চাঁদনী—রজতময় চাঁদনীর উপর—হুরীর দল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এইরূপ স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে মাহরুণের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে বিস্ময়ে দেখিল, তাহার গায়ে কাহার হাত রহিয়াছে।

ঘুমের ঘোরে কাতরস্বরে মাহরুণ জিজ্ঞাসা করিল,—"কে তুমি? স্বর্গের দেবতা আসিয়াছ?—"

উত্তর পাইল—"দেবতা নহি, মানুষ!"

"মানুষ! এখানে কি করিয়া আসিলে?"

"আমি ঈশ্বরের প্রেরিত—আমার গতি সর্ব্বত্র অব্যাহত।"

"কি করিতে আসিয়াছ? আমার কিছু উপকার করিতে পারিবে?"

"তোমার উপকার করিতেই আসিয়াছি, সাবধান করিতে আসিয়াছি। তুমি ইহলোকে আর কতদিন থাকিবে, তাহা অবগত আছ কি?"

মাহরুণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"বড় জোর দুই দিন, কি তিন দিন। অনাহারে মৃত্যু আমার দণ্ডবিধান হইয়াছে।"

"পরলোক বিশ্বাস কর?"

"করি।"

"কোরাণ পড়িয়াছ—কোরাণ মান?"

"কোরাণ ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করি।"

"তুমি শান্তিলাভ কর। কিন্তু এটা বোধ হয় শুনিয়াছ, রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির পরলোকে সদগতি হয় না। যাহাতে তোমার সদগতি হয়, আমি সেই চেষ্টা করিতে আসিয়াছি।"

"আপনি মহাপুরুষ—এখন কি করিতে হইবে বলুন।"

এই কথা বলিয়া, মাহরুণ সেই অদৃষ্ট-পুরুষের পদযুগল অন্বেষণ করিল।

ফকীর সরিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন,—"মাহরুণ! কাতর হইও না। আমি ফকীর—মহম্মদের দাস। এ জীবনে যে যে পাপ করিয়াছ, সমস্ত যদি নিজমুখে আমার সমক্ষে স্বীকার কর, তবে সে সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে,—এবং রাজদ্বারে দণ্ডিত হইলেও তোমার সদগতি

বিধান করিব। চাই কি বাদসাহ সাজাহানকে বলিয়া, তোমার মুক্ত দিতেও পারিব।"

মাহরুণ ভাবিয়া ভাবিয়া ছোট বড় অনেক পাপের নাম করিল। ফকীর নিস্তব্ধভাবে শুনিতে লাগিলেন। তিনি যাহা শুনিতে চান, মাহরুণ তাহা বলিতেছে না। গম্ভীরকণ্ঠে ফকীর বলিলেন;—

"পরস্ত্রী হরণ করিয়াছ?"

মাহরুণ সগর্ব্বে বলিল,—"জীবনে নহে।"

ছদ্মবেশী মহাপুরুষ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কখনও কোন পরনারীর প্রতি প্রেমাসক্ত হও নাই?"

"আপনি ফকীর—অন্তর্য্যামী,—বলিতে বাধা নাই—হইয়াছি। কিন্তু যখন তাহাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করি, তখন সে পরস্ত্রী ছিল না। এখন সে পরস্ত্রী বটে।"

"তোমার প্রতি সে স্ত্রীলোকের মনোভাব কিরূপ ছিল?"

"বাল্যে সে আমাকে ভালবাসিত। আমরা ছিলাম ঠিক যেন এক-বৃন্তে দুটী ফুল। আমার সঙ্গে তাহার বিবাহ হইল না। তাহার বিবা-হের পরও আমি তাহাকে ভুলিতে পারিলাম না। তাহার সৌন্দর্য্য ভুলিতে পারিলাম না—তাহার আশা ছাড়িতে পারিলাম না। সে যেখানে থাকিত, আমার সেখানে যাওয়া অসম্ভব। কিন্তু কৌশলে ছদ্মবেশে তাহার কাছে কাছে থাকিয়াছি, সে তাহা জানে নাই। আমি তাহার মন জানি। তাহার মনে আমার প্রতি বিশুদ্ধ স্নেহ ব্যতীত তিলমাত্র অন্যভাব নাই।"

"কখনও কুভাবে তাহার অঙ্গস্পর্শ করিয়াছ?"

"ফকীর সাহেব—আপনি সর্ব্বজ্ঞ। করিয়াছি,—কিন্তু সুভাবে কি কুভাবে, তাহা আমি নিজেই জানি না। আপনি অনুমান করুন

আমি তাঁহাকে একবার মন্ত্র মোহাবেশে চুম্বন করিয়াছি। সেই চাঁদিনীর শুভ্র রাত্রে, সে সুন্দরমূর্ত্তি দেখিয়া বাসনার বাঁধ বাঁধিয়া রাখিতে পারি নাই। যেখানে অতি সুন্দর দেখিয়া মন ভুলে, সেখানে অপবিত্রতা থাকে না। তন্ময়তা, অপবিত্রভাবকে উড়াইয়া দেয়। উপরে সেই অনন্ত শক্তিমান্, তিনিই সব দেখিয়াছেন।"

সেই অপরিচিত পুরুষ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হাত ধরিয়া মাহরুণকে বলিলেন,—"বৎস! কোনও চিন্তা নাই—রাজদণ্ডে মৃত্যু হইলে, আমি তোমার সদগতিবিধান করিব, আশ্বস্ত হও। কিন্তু তোমার মুক্তির চেষ্টা একবার করিতে হইবে।"

সেই ছদ্মবেশী ফকীর কারাকক্ষের লৌহকবাট সবলে উন্মুক্ত করিলেন। তাহা পূর্ব্বেই বাহির হইতে খোলা ছিল।

বাহির হইয়া আবার দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। সেইখানে দাঁড়াইয়া কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিলেন। মনে মনে বলিলেন,—"তবে আর ইহাকে প্রাণে মারিব না।" এ চিরাপরাধী, সেলিমাও নিষ্কলঙ্কা—তিনি ধীরে ধীরে মহলের দিকে অগ্রসর হইলেন।

বলা বাহুল্য, সে পুরুষ আর কেহই নহেন, স্বয়ং বাদসাহ সাজাহান।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, সাজাহান নিজে সেলিমার পত্র পাঠ করেন নাই, জিন্নৎ-বেগমের মুখে একটা বিকৃত সংবাদ অবগত হইয়াছিলেন মাত্র। সন্ধ্যার পূর্ব্বে যখন মদিরামোহ অপগত হইল, তখন তিনি স্বয়ং সেলিমার পত্রখানি পাঠ করিলেন।

মাহরুণ যখন বলিয়াছিল, সেলিমা নির্দ্দোষ,—তখন সাজাহান তাহা বিশ্বাস করেন নাই। সেলিমাও যখন পত্রে লিখিল সে নির্দ্দোষ, তখন বাদসাহের একটা সংশয় উপস্থিত হইল। তাই তিনি ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া, মাহরুণের কারাকক্ষে উপনীত হইয়াছিলেন।

মাহরুণকে কৌশলে প্রশ্ন করিয়া তাঁহার সকল সন্দেহ দূর হইল।

দিল্লীশ্বর, নির্দ্দোষ মাহরুণের প্রাণদণ্ড-বিধান রহিত করিলেন। তখনই কারারক্ষককে ডাকিয়া হুকুম দিলেন—"বন্দীকে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য দিয়া আইস, যেন কোনও রূপে তাহার কষ্ট না হয়।' সাজাহানের শোণিত-পিপাসা ইতিহাসে মসীবর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে। যাহারা তাঁহার উচ্চাভিলাষের অন্তরায় হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিল, কেবল তাহাদিগেরই রক্তপানে তিনি কিছুমাত্র দ্বিধা করেন নাই। কিন্তু উদ্দেশ্যহীন শোণিত-লালসা তাঁহার কখনও ছিল না।

ছদ্মবেশ ত্যাগ না করিয়াই, সাজাহান সেলিমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। সেলিমাকে সাজাহান বড় ভাল বাসিতেন। তার ন্যায় প্রিয় তাঁহার আর কেহই ছিল না। অনর্থক তাহাকে কষ্ট দিয়াছেন ভাবিয়া, দিল্লীশ্বর মনে বড় ব্যথা পাইলেন। মনে ভাবিলেন, সেলিমাকে সান্ত্বনা করিয়া, আদর করিয়া, সোহাগ করিয়া, আঘাত-বেদনা বিস্মৃত করাইবেন। সপ্তাহকাল সেলিমার মহলে উপস্থিত থাকিয়া আনন্দ-উৎসবে মাতিবেন। সেলিমার মনস্তুষ্টির জন্য—তাহার প্রতি আর যে কোনও সন্দেহ নাই, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য, কৃতাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত জন্য, মাহরুণকে কারামুক্ত করিবেন। যদি সেলিমা হাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার আজ এ সন্ন্যাসী-বেশ কেন?" তিনি বলিবেন, "দুনিয়ার বাদসাহ হইয়াও তোমার প্রেমের জন্য ফকীর হইয়াছি।" এই সকল সুখময় কথা মনে মনে আন্দোলন করিতে করিতে, হিন্দুস্থানের সম্রাট্, অপরাধিনীর মত সেলিমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

তাহার পর যাহা ঘটিল, পূর্ব্ব পরিচ্ছেদেই পাঠক তাহা দেখিয়াছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পরদিন সেই অন্ধতমসাবৃত কারাকক্ষে মাহরুণ নির্জ্জনে বসিয়া আপনার অদৃষ্টের কথা চিন্তা করিতেছে। ঊর্দ্ধে ছিদ্রাপথের আলোক-

রশ্মি দ্যুতি ক্ষীণ ;—বাহিরে যে সূর্য্যাস্তকাল উপস্থিত হইয়াছে, ইহা তাহারই সংবাদ।

আবার নিষ্ঠুর অন্ধকার মাহরুণকে গ্রাস করিতে আসিতে লাগিল। কক্ষের কোণে তখনও খাদ্যদ্রব্যাদি দেখা যাইতেছে—তাহার অতি অল্প মাত্রই সে স্পর্শ করিয়াছিল। এইগুলি যোগাইতে একজন প্রহরী দুইবার তাহার কক্ষে দর্শন দিয়াছিল—তাহার সহিত সে কথামাত্র কহে নাই।

দীর্ঘকালব্যাপী অব্যাহত নীরবচিন্তায় মাহরুণ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিল, "খোদা! আর কতদিন এ যন্ত্রণা সহ্য করিব! সাপের মাথার মণি ত পাইলাম না, দংশনের বিষেই জ্বলিয়া মরিলাম। আমার অদৃষ্টে ত এই হইল, কিন্তু জানিনা, সেই নির্দ্দোষী সেলিমাকে ভাগ্য কোন্ পথে লইয়া গিয়াছে। সেলিমা! সেলিমা! আমার মত তুমিও কি কারাগারে? এ দুনিয়ায় কি বিচার নাই, ভাল-বাসা নাই, বিশ্বাসের স্থায়িত্ব নাই, প্রেমের একপ্রবণতা নাই? হায়! তুমি কি আর জীবিত আছ? গুপ্তকক্ষে তাতারিণীর তীক্ষ্ণ অসিতে বিদ্ধ হইয়া তোমার প্রাণ গিয়াছে। হায় সেলিমা! সেলিমা! আমিই তোমার মৃত্যুর কারণ হইলাম।"

শেষ কথাগুলি বলিবার সময় মাহরুণ পাগলের মত চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই কঠোর চীৎকারে নীরব কারাকক্ষ বড়ই আকুল হইয়া পড়িল।

সহসা দ্বারের বাহিরে একটা শব্দ হইল। মাহরুণ বুঝিল, আহার-সামগ্রী লইয়া প্রহরী আসিয়াছে। প্রহরী প্রবেশ করিয়া লণ্ঠন রাখিল। আহার্য্যগুলি যথাস্থানে স্থাপন করিল।

লণ্ঠনের তীব্র আলোক, মাহরুণের চক্ষে সহিল না। সে ক্রমাগত অন্ধকারে থাকিয়া, নিশাচরের মত হইয়া পড়িয়াছে। মাহরুণ চক্ষু মুদিত করিল।

প্রহরী হাসিয়া বলিল,—"মাহরুণ! কেমন আছ?"

এ বিদ্রূপ-প্রশ্ন বাণের মত তাহার হৃদয়ে আঘাত করিল।

মাহরুণ ঘৃণার স্বরে বলিল,—"একটা সামান্য কীটকে পদদলিত করিয়া লোকে তখনই আহা করিয়া উঠে, আর তোমরা একটা মানুষকে এত যাতনা দিতেছ? তোমাদের হৃদয়ে কি দয়ামায়া কিছুই নাই?"

প্রহরী বলিল,—মাহরুণ! দয়া করিবার ক্ষমতা আমাদের কই? আমরা হুকুমের চাকর। বাদশাহের আদেশ, অনাহারে রাখিতে—আমি কেবল দয়া করিয়া তোমায় খাবার দিয়া যাই।"

মাহরুণ তীব্র হাসি হাসিয়া বলিল—"তোমাদের জল-রুটী ফিরিয়া লইয়া যাও। যাহা দিয়াছ, তাহা প্রায় সমস্তই মজুত রহিয়াছে।"

"কেন, তুমি কি কিছুই খাও নাই?"

"খাইবার প্রয়োজন নাই। জীবনে যাহার সাধ থাকে, সে খাদ্য গ্রহণ করে। আমার মরিতে সাধ। খাদ্যের সঙ্গে একটু বিষ দিয়া উপকার কর না কেন?"

প্রহরী তখন চলিয়া যাইবে বলিয়া লৌহদ্বার খুলিয়াছিল। দুইটি কবাটের মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া, মাহরুণের প্রতি চাহিয়া ঘাড় নাড়িয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—"তিনি বিষ খাইয়া মরিয়াছেন, তুমি না খাইলে প্রেমের গৌরব থাকিবে কেন?"

প্রহরীকে আর বলিতে হইল না। এই কথায় মাহরুণ ক্ষিপ্ত-ব্যাঘ্রের মত উঠিয়া অর্দ্ধোন্মুক্ত কবাট—সবলে চাপিয়া ধরিল। দুইটি ভীমকায় কবাটের মধ্যে নিষ্পেষিত হইয়া, প্রহরী ভীষণ আঘাতপ্রাপ্ত হইল। মাহরুণ পুনরায় কবাট খুলিবামাত্র হতভাগ্যের মৃতদেহ কারাবক্ষে লুণ্ঠিত হইল।

মাহরুণ তখন দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য। ঘোর উন্মাদ—ক্ষিপ্রহস্তে প্রহরীর পায়জামা আংরাখা প্রভৃতি খুলিয়া নিজে পরিধান করিল। চাপরাশ,

কোমরবন্ধ-সমেত হাতিয়ার খুলিয়া লইল। চাপরাশে প্রহরীর নাম লেখা ছিল, সেটা আলো ধরিয়া পড়িয়া লইল। তাহার পর লণ্ঠনটি উঠাইয়া কারাগারের বাহিরে আসিল। কারাদ্বার বন্ধ করিতে ভুলিল না।

তিনটি ফাটক পার হইয়া মাহরুণ এক গহ্বরমুখে উপস্থিত হইল। প্রহরী প্রবেশকালে এই তিনটি ফাটক খুলিয়া রাখিয়াছিল। মাহরুণ একে একে সে গুলি বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর প্রস্তরময় সোপান বাহিয়া উপরে উঠিল। বাহিরের মুক্তবাতাসে উপস্থিত হইয়া, মাহরুণ বলিয়া উঠিল,—"আঃ—এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম।"

প্রহরী যাহা বলিয়াছিল, তাহাতে মাহরুণ পাগলের মত হইয়াছিল। "সেলিমা! সেলিমা! তুমি বিষ খাইয়াছ—আমার দোষে তুমি মরিয়াছ—একবার তোমায় দেখিতে পাইলাম না!"

সম্মুখেই প্রাঙ্গণ। স্থিরভাবে মাহরুণ প্রশস্ত প্রাঙ্গণ পার হইল। উপর হইতে একজন জিজ্ঞাসা করিল, "কে যায়?"

মাহরুণ বলিল,—"প্রহরী মহম্মদ হোসেন।"

আর কেহ কোনও কথা কহিল না! অদূরেই সেলিমার পুরী। গবাক্ষে গবাক্ষে যত আলো জ্বলিত, তাহার এক চতুর্থাংশও জ্বলিতেছে না। মাহরুণ ধীরে ধীরে পুরীর দ্বারদেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। মনে ভাবিল—"সেলিমা! তুমি কি সত্যই ইহলোকে নাই? প্রহরী নিশ্চয় মিথ্যা বলিয়াছে। আর একবার তোমায় দেখিব।' জন্মের শোধ দেখিয়া চলিয়া যাইব। আর তোমার সুখের পথে কণ্টক হইব না।"

দ্বারের নিকটবর্ত্তী হইয়াই মাহরুণ যে দৃশ্য দেখিল, তাহাতে সে চমকিত হইল। তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। বক্ষের শোণিতপ্রবাহ দ্রুতবেগে ছুটিতে লাগিল। মাথা ঘুরিতে লাগিল।

সে বিস্ময়স্তিমিত-নেত্রে দেখিল, মশাল লইয়া অনুমান শতাধিক লোক বহিস্তোরণ অভিমুখে আসিতেছে। সমস্ত পথটী সৈনিকবৃন্দে পরি-

সেই বৃক্ষের অন্তরাল হইতে বাদসাহ দেখিলেন, সমাধির উপর এক মনুষ্যমূর্ত্তি।—[illegible] পৃষ্ঠা।
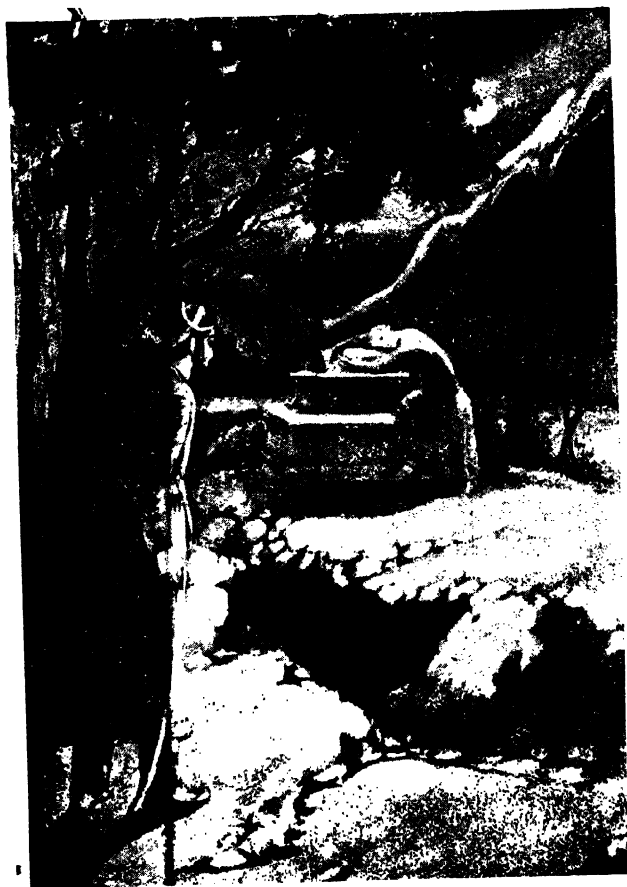
Emerald Ptg. Works.

পূর্ণ—মধ্যে শববাহীরা শবাধারে কাহার মৃত-দেহ লইয়া আসিতেছে। সকলেই নিস্তব্ধ—মুখে কথাটি মাত্র নাই। অগ্রপশ্চাদ্বর্ত্তী সৈনিকগণের হস্তে উন্মুক্ত তরবারি। মশালবাহীরা পাশে পাশে চলিয়াছে। সেই মশালের আলোক, সৈনিকদিগের অস্ত্রফলকের, শবাধারের বহুমূল্য মণিখচিত আবরণ-বস্ত্রের উপর পড়িয়া, ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে।

সে সবই বুঝিল। সেলিমা আর ইহলোকে নাই। বুঝিল,—অভিমানিনী, দর্পিতা, পতিপ্রেমনিরতা, সেলিমা আত্মহত্যা করিয়া কলঙ্কের হাত এড়াইয়াছে। কিন্তু কে সেলিমার এই মৃত্যুর কারণ।

তাহার হৃদয় ক্রমশঃ বিকল হইয়া পড়িতে লাগিল। দুইদিন কাল প্রায় অনাহার, তাহার পর এই সমস্ত ঘটনা-পরম্পরা তাহাকে যেন একটা জড়পিণ্ডবৎ করিয়া তুলিয়াছিল। সে মন্ত্র-মুগ্ধের মত, উন্মাদের মত, সেই শববাহী-দলের পশ্চাতে থাকিয়া, ধীরে ধীরে দুর্গদ্বার অতিক্রম করিল।

শববাহীরা কতক পথ আসিয়া, উপত্যকা-প্রবাহিতা শ্বেতোপলময়ী গিরিনদীর তীরভূমিতে উপস্থিত হইল। গভীর নিশীথে বিরল অন্ধকারে সেই স্থান বড়ই গভীর দেখাইতেছিল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যেন শতধারে ফুটিয়া উঠিয়াছে। চতুর্দ্দিক হইতে সদ্যপ্রস্ফুটিত বন্যপুষ্পের সুগন্ধ আসিতেছে। ক্ষুদ্র বৃহৎ তরুরাজির মাথায়, শাখায়, পল্লবে, মাণিক্যরাশির মত জোনাকি জ্বলিতেছে। পার্ব্বত্য শীতলবায়ু, উপত্যকার প্রত্যেক লতাবল্লরীর সুগন্ধি কুসুমগুলিকে নীরবে চুম্বন করিয়া, চকিত ও কম্পিত করিয়া তুলিতেছে।

কৃষ্ণপক্ষ,—তখনও চন্দ্রোদয় হয় নাই,—আকাশে অল্প অল্প মেঘ করিয়া আছে। নক্ষত্র নাই,—চন্দ্রের দীপ্তি নাই, কেবল অন্ধকার। অন্ধকার, মৃত্যুর গাত্রাবরণ। তাই আজ অন্ধকারের এত বাড়াবাড়ি—এত ঘনীভূত ভাব। সেলিমা মরিয়াছে, তাই আজ প্রকৃতির প্রাণ

কাঁদিয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতি, কৃষ্ণবস্ত্র-পরিশোভিতা হইয়া, সেলিমাকে কোলে লইতে আসিয়াছে।

মশালধারীরা পর্ব্বতের উপত্যকার একান্তভাগে দাঁড়াইল। অস্ত্র-ধারীরা তাহাদের পশ্চাতে দাঁড়াইল। শবাধার নামাইয়া, তাহার চারিদিকে প্রচুর স্থান রাখা হইল। সকলেই যেন উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাহার আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছে।

অনেকক্ষণ পরে চন্দ্রোদয় হইল। তখন মোতিমহলের তোরণের নিকট সহসা মশালের আলোক দেখা গেল। সকলেই বুঝিল, সময় হইয়াছে। প্রহরীরা সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইল। চারিজন মৌলবী সমভিব্যাহারে স্বয়ং দিল্লীশ্বর আসিয়া, সেই উপত্যকায় দাঁড়াইলেন। সৈনিকেরা অস্ত্রমুখ অবনত করিয়া সম্মান করিল। সকলেই নীরব। কেহ মুখ ফুটিয়া দিল্লীশ্বরের জয়োচ্চারণ করিল না।

সমাধির সমস্ত আয়োজনই পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ছিল। মৌলানাগণ সেই অন্ধকার-বিমণ্ডিত নিসর্গ-বক্ষ স্তম্ভিত করিয়া সুগভীর-স্বরে কোরাণ হইতে শান্তিসূচক শ্লোকাবলী আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। শবাধারের উপর বিচিত্র-বর্ণের রাশিকৃত সুগন্ধি পুষ্পরাশি। সমাধিগর্ভের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত ফুলের মালা বিছান হইয়াছে। খনিত-সমাধির চারিদিকে বহু-মূল্য অগুরু ইস্তাম্বুল ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই উপত্যকায় যেন স্বর্গের সুগন্ধ বহিয়াছে।

সেলিমার মৃতদেহ বাহির করিয়া, সুগন্ধি গোলাপজলে স্নান করান হইল। তৎপরে অগুরু, চন্দন ও অন্যান্য সুগন্ধিদ্রব্যে সেই সুন্দর দেহ চর্চ্চিত করা হইল। শেষে শবাধার সেই সমাধিগর্ভে নামাইবার সময় বাদসাহ আবেগপূর্ণকণ্ঠে বলিলেন,—"সেলিমা! পরলোকে আবার তোমার সহিত মিলিব। তোমার উপর যে অত্যাচার করিলাম, এ অভাগার জীবনব্যাপী প্রায়শ্চিত্তে তাহা শোধ হইবে না।"

দুই চারিটী পবিত্র উষ্ণ অশ্রুবিন্দু বাদসাহের চক্ষু হইতে কবরের উপর পড়িল। একটা আকুল উষ্ণনিশ্বাস প্রাণের গভীর বেদনা জানাইয়া, শীতল বায়ুস্তরে মিশাইল। সে সময়ের প্রাণের অব্যক্ত কাতরতা দারুণ মর্ম্মজ্বালা, সেই দীর্ঘনিশ্বাস ও উষ্ণ-অশ্রু—যেন সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারিল না। প্রেয়সী মহিষী মমতাজ বেগম মরিবার সময়ও বুঝি সাজাহান এত ব্যাকুল হন নাই।

গভীর শোকে মুখ বস্ত্রাবৃত করিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে বাদসাহ শূন্য-হৃদয়ে, প্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়া পুনরায় মহলে ফিরিলেন।

সোণার মোতিমহল শূন্য হইল,—যাহার জ্যোতিঃতে পূর্ণ ছিল,—সে আর নাই!

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সেলিমার মৃত্যুর পর দশ দিন অতীত হইয়া গিয়াছে। বাদসাহ বড় একটা কাহারও সহিত মেশেন না! মন সর্ব্বদাই চিন্তাযুক্ত। এ কয়দিন তিনি সেলিমার মোতিমহলেই যাপন করিয়াছেন। পূর্ব্বে মনে মনে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন,—সপ্তাহকাল সেলিমার মহলে উপস্থিত থাকিবেন, তাহা ধর্ম্মবিধানের মত করিয়া পালন করিলেন; কিন্তু আনন্দ-উৎসবের স্বর্ণমন্দিরে কাঁদিয়া দিন কাটিল।

হাসি নাই, অশ্রু আসিতেছে,—প্রেম নাই, চির-বিরহ আসিয়াছে,—প্রীতি নাই, বাদসাহের প্রাণ অনুশোচনায় ভরিয়াছে। উজ্জ্বল আলো নাই,—চিরান্ধকার আসিয়াছে। দেবী চলিয়া গিয়াছে,—দানবী তাহার শূন্য আসনে বসিয়া বিভীষিকা দেখাইতেছে। সুগন্ধি দীপোজ্জ্বলিত সুবর্ণকক্ষ পুতিগন্ধময় শ্মশান হইয়াছে।

বাদসাহ কখনও বা সেলিমার পরিত্যক্ত শয্যায় বিলুণ্ঠিত হইয়া শূন্যনেত্রে দ্বারপথে চাহিয়া থাকেন। কখনও বা গভীর রাত্রে সুনীল

আকাশের দিকে উদাস-দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া, ক্লান্ত হইয়া, আবার উপাধান সিক্ত করিতে থাকেন। সেলিমা স্বর্গে,—তাই ঊর্দ্ধদিকে উদাস-দৃষ্টি। আকাশে অত নক্ষত্র,—কই তাহার মধ্যে ত সেলিমা নাই। থাকিলেও আমার মত পাপিষ্ঠকে দেখা দিবে কেন?

পরিত্যক্ত কক্ষে, প্রতিমা-বিসর্জ্জিত শূন্য দালানে—সেলিমার প্রত্যেক চিহ্নই বর্ত্তমান। তাহার বীণ্ রহিয়াছে—এস্‌রাজ্ রহিয়াছে,—সে নাই। তাহার মতির মালা রহিয়াছে—তাহার রত্নখচিত পেশোয়াজ রহিয়াছে,—সে নাই। আধার রহিয়াছে—আধেয় নাই। প্রেম রহিয়াছে—মানুষ নাই। সঙ্গীতের কাকলী রহিয়াছে—সঙ্গীত নাই। সুবাস রহিয়াছে—ফুল শুকাইয়াছে। যাহা ভাল, তাহা নাই—আছে স্মৃতি—দারুণ দীর্ঘশ্বাস, করুণ ক্রন্দন।

এখন জিন্নৎ-বেগমের নাম করিলে সাজাহান ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠেন। একদিন জিন্নৎ দেখা করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন—বাদসাহ হুকুম দিলেন, "উহাকে কুত্তা দিয়া খাওয়াও।" বিপদ গণিয়া জিন্নৎ-বেগম, সেই দিনই কাশ্মীর পরিত্যাগ করিয়া, চুপে চুপে দিল্লী-যাত্রা করিয়াছেন।

সাজাহান সর্ব্বদাই মনে মনে ভাবেন,—"আমি সেলিমার মৃত্যুর কারণ। মিথ্যা সন্দেহে সেলিমাকে আমিই নষ্ট করিলাম।"

শোকের প্রারম্ভে, মাহরুণের অবরোধের কথা বাদসাহ এতদিন ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সমাধির আয়োজনে, সেলিমার শোকে, তাঁহার এ সম্বন্ধে সংবাদ লওয়ার অবসরও ছিল না। যে দিন সংবাদ লইলেন,—সে দিন শুনিলেন, বন্দী কারাকক্ষে স্বেচ্ছাকৃত অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। প্রকৃত যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা তিনি শুনিলেন না।

মাহরুণ যে প্রহরীকে হত্যা করিয়া পলাইয়াছিল, তাহা তৎপর দিবসই ধরা পড়ে। কারাগার হইতে বন্দী পলাইয়াছে, এ সংবাদ

বাদসাহের কর্ণগোচর হইলে কাহারও প্রাণ থাকিবে না, তাজেই কারাধ্যক্ষপ্রমুখ প্রহরীরা ষড়যন্ত্র করিয়া প্রচার করিল, "বন্দী কারাগারে নিজ দোষে মরিয়াছে।" তাই তাহারা সেই রচিত-সংবাদটা শোকাকুল দিল্লীশ্বরকে সহজেই শুনাইয়া দিল।

একদিন বাদসাহের ইচ্ছা হইল, একবার সেলিমার সমাধি দেখিতে যাইবেন,—সমাধির উপর শুইয়া মর্ম্মজ্বালার শান্তি করিবেন। তিনি কাহাকেও সঙ্গে লইলেন না। একাকী বাহির হইয়া উপত্যকার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গভীর নিশীথে সেই জনহীন উপত্যকার মধ্যে প্রবেশ করিতে সাজাহানের সাহসপূর্ণ হৃদয়ও কম্পিত হইল।

কাল কাল গাছের পাতার মধ্যে লুকাইয়া, যেন কে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল,—"ঐ হত্যাকারী আসিতেছে।" তারকামণ্ডিত নভোদেশে বসিয়া যেন সেলিমা বলিতেছে,—"এস! এইখানে উপরে এস। আমায় পাইবে। কবরে আমার যাহা ছিল, তাহা মৃত্তিকাসাৎ হইয়াছে।" নৈশসমীরণ হতাশস্বরে যেন কাণে কাণে বলিতেছে,—"ছি অবিশ্বাসি!—এ প্রেম তোমার পূর্ব্বে কোথায় ছিল!"

তখন জ্যোৎস্নাপক্ষ। গাছের পাতায়, লতাগুল্মের গাত্রে, শ্বেতোপলময়ী গিরিনদীর স্রোতে, আর সেই অদূরবর্ত্তী শ্বেতমর্ম্মরনির্ম্মিত সেলিমার উপর হসিত-কৌমুদী পড়িয়াছে।

সহসা নৈশ-নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, অতি মধুর বংশীরব উত্থিত হইল। উপত্যকায়, গিরিকন্দরে, ক্ষীণতরঙ্গ নদীগর্ভে, সেই বংশীধ্বনি করুণার উৎস বহাইয়া ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল। সেই সকরুণ বিলাপ সঙ্গীত বাদসাহের প্রাণ উন্মাদ করিয়া ফেলিল। তিনি অতি বিস্মিত পদক্ষেপে, ধীরে ধীরে সমাধির নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন।

একটী ঘন পল্লবাবৃত বৃক্ষ, সমাধিকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল। সেই বৃক্ষের অন্তরাল হইতে বাদসাহ দেখিলেন, সমাধির উপর এক মনুষ্যমূর্ত্তি!

দিল্লীশ্বরের শরীর বিস্ময়ে কণ্টকিত হইল। স্থির করিতে পারিলেন না, গভীর নিশীথে সমাধির উপর কে বসিয়া? তিনি সাহসে ভর করিয়া, সমাধির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ঝরণার জল বহিয়া গিয়া একটী ক্ষুদ্র গহ্বর হইয়াছিল, সেইটি পার হইবার জন্য যেমন সাজাহান নিম্নে নামিলেন, অমনি কতকগুলি পাথর গড়াইয়া গিয়া একটা মহা শব্দ হইল। বাদসাহ তাহাতেই একটু অন্যমনস্কভাবে নিম্নে দৃষ্টি করিলেন। মুখ তুলিয়া দেখেন, সমাধির উপর যে বসিয়াছিল—সে নাই।

সাজাহান বিস্ময়াপ্লুতনেত্রে চারিদিকে চাহিলেন। কেহ কোথাও নাই। দ্রুতপদে সমাধিপার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, সমাধির উভয় পার্শ্বে কাল সাদা অনেকগুলি উপলখণ্ড পড়িয়া আছে। কাল পাথরের জমিতে সাদা পাথর বসাইয়া কোন অজানিত হস্ত, অক্ষর রচনা করিয়া গিয়াছে। বাদসাহ ঈষৎ অবনত হইয়া, পরিস্ফুট চন্দ্রালোকে বিস্মিতচিত্তে পাঠ করিলেন, পারসী অক্ষরে উভয় পার্শ্বে লেখা রহিয়াছে—

"সেলিমা।"

"মাহরুণ।"

সমাধির উপর রাশীকৃত যত্নসজ্জিত সুগন্ধি বন্য-কুসুম। নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন,—শাদা ফুলের জমীর মধ্যে লাল ফুল দিয়া লেখা রহিয়াছে—

"সেলিমা।"

"মাহরুণ।"

দেখিয়া বাদসাহের বিস্ময়,—ভয়ে পরিণত হইল। তখন তিনি সেই জনমানবশূন্য উপত্যকায় দাঁড়াইয়া, আকুলকণ্ঠে চীৎকার করিলেন— "মাহরুণ! মাহরুণ! কোথায় তুমি,—একবার দেখা দাও। তুমি এখন স্বর্গের জীব। আমার সেলিমার সংবাদ বলিয়া যাও। আমায় কৃপা কর। আমি দুনিয়ার বাদসাহ, তোমার কাছে মার্জ্জনা চাহিতেছি।"

সেই জলসিক্ত, আর্দ্রবস্ত্রমণ্ডিত, নগ্নসৌন্দর্য্য সন্ধ্যার অন্ধকার ও মৃদুপ্রবাহী সমীরণ ভিন্ন আর কেহই দেখিল না।—৪৯ পৃষ্ঠা।

Emerald Ptg. Works.

কেহই আসিল না। প্রতিধ্বনিটা ঘুরিয়া ফিরিয়া লয় পাইল। উপত্যকা পুনরায় শব্দশূন্য। তখনও জ্যোৎস্না হাসিতেছে।

জ্যোৎস্নার হাসি বিষবৎ বোধ হইল। বাদসাহ সেই গভীর নিশীথে, ধীরপদবিক্ষেপে বিস্ময়াকুলিতচিত্তে প্রাসাদাভিমুখে ফিরিতে লাগিলেন।

কিছুদূর আসিবার পর, সমাধিস্থান হইতে আবার সেই সুরময়ী সঙ্গীত-লহরী উত্থিত হইল। কিন্তু এবার বাঁশীস্বর নহে। যেন কিন্নর-কণ্ঠজাত সঙ্গীত।

বাদসাহ দাঁড়াইয়া শুনিলেন। গানের কথাগুলি স্পষ্ট বুঝা গেল, কে যেন কোমলকণ্ঠে সুর তুলিয়া গাহিতেছে।—

দুখুয়া মে কৈসে কহুঁ মেরে সজনী।

পরিচিত গান! এ যে তিনি সেলিমার মুখে শতবার শুনিয়াছেন। কিন্তু কই কখনও এমন ভাববিহ্বল হন নাই।

মোতিমহলে ফিরিয়া, সাজাহান শয্যাতলে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। তবু নিস্তার নাই। মোতিমহলের উন্মুক্ত গবাক্ষপথে সঙ্গীত-লহরী আবার ছুটিয়া আসিতে লাগিল। এইরূপ রাত্রির পর রাত্রি, সেই নদী-তীরস্থ সমাধিস্থান হইতে কখনও বংশীধ্বনি, কখনও বা সঙ্গীত শ্রুত হইতে লাগিল। সাজাহান মর্ম্মজালায় অধিকদিন কাশ্মীরে থাকিতে পারিলেন না। দিল্লীতে ফিরিলেন, ইহার কয়েক মাস পরে, মমতাজ বেগমের রূপবহ্নিতে ঝাঁপ দিয়া সকল জ্বালা জুড়াইলেন।

অনেকদিন অবধি উপত্যকাবাসীরা সভয়চিত্তে বেগমের সমাধিস্থান হইতে ঐরূপ করুণ নিশীথ-গীতি ও মধুর বংশীধ্বনি শুনিতে পাইত; কিন্তু কেহ কখনও সাহস করিয়া তাহার রহস্যোদ্ভেদ করিতে চেষ্টা করে নাই। ঘটনাটা অনেক দিন অলৌকিক বলিয়া চলিয়া আসিয়াছিল।

হিরণ্য-মন্দির

প্রথম পরিচ্ছেদ

"উঠে এস সবিতা!"

"না—আমি যাব না।"

"কেন—"

"তুমি আগে প্রতিজ্ঞা কর।"

"ছিঃ! প্রতিজ্ঞা না ক'র্‌লে বিশ্বাস ক'র্‌বে না?"

"না—আগে হ'লে ক'র্‌তাম্, এখন আর নয়।"

"এত অবিশ্বাস কেন সবিতা?"

"তোমার ব্যবহারে। কাল রাত্রে তুমি আমায় লুকিয়ে চ'লে যাচ্ছিলে কেন? আমায় ভালবাস না ব'লে—কেমন?"

"ছিঃ—তোমায় ভালবাসি না, ও কথা ব'লো না! তুমি সোণার সবিতা, তুমি অত সুন্দর।"

"সুন্দর ব'লে ভালবাস? সোণার ব'লে ভালবাস? রূপ দেখে ভুলেছ? কালো হ'লে ভালবাস্‌তে না। তুমি আমার চেয়ে আরও সুন্দর কোথাও পেয়েছ—না হ'লে আমায় ছেড়ে যাবে কেন?"

"এ কথার উত্তর কি দিব সবিতা! তোমায় কেন ভালবাসি, মনকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে উত্তর পাই না। তোমায় কেমন ভালবাসি, হৃদয়ের মধ্যে, বাহ্যজগতে উপমা খুঁজ্‌লেও পাই না। ঈশ্বর জানেন—তিনিই সব দেখ্‌তে পান। এ বিশ্ব সেই অনন্ত-পুরুষের প্রেমোজ্জ্বলিত। প্রেম অবিনশ্বর,—সৌন্দর্য্য নশ্বর। ফুল ফুটে—আপনি সুবাস বিলায়, ঝরিয়া পড়ে। ফুলের স্মৃতি লোপ হয়—গন্ধ থাকে। সৌন্দর্য্য যায়—প্রেম থাকে। বাঁশীর সুর বায়ুপথে ভাসিতে ভাসিতে কাণের মধ্যে প্রবেশ

করে, পাগল করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। সঙ্গীত যায়—সুর থাকে। আমার চক্ষে তুমি অনন্ত-সুন্দরী, কিন্তু তা বলিয়া তোমায় ভালবাসি না।—যাক্—ও সব কথা—এখন জল থেকে উঠে এস।"

সুন্দরী উঠিল না। আগ্রীব-নিমজ্জিত হইয়া—সে মৃণালকান্তি সুগোল বাহুযুগলের আন্দোলন, সেই গভীর হ্রদের সুনীল সলিলরাশি আলোড়িত করিতে লাগিল। ঢেউগুলা, যেন সেই সুকোমল স্পর্শে ফুলিয়া উঠিয়া—চক্রাবর্ত্তরূপে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তরঙ্গগুলা চলিতে চলিতে, গোটাকতক শ্বেত ও রক্তপদ্মের মৃণালের উপর আঘাত করিয়া, তাহাদিগকে মৃদুসঞ্চালিত করিয়া দিল। সেই সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী শ্যামল বীথিপরিপূর্ণ পাহাড়ের কোল হইতে একটা ভীমরাজ চীৎকার করিয়া উঠিল। একটা লোহিতবক্ষ বুল্‌বুল্—সমীর-স্তরে নিশ্চিন্তে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, সেও খুব ঊর্দ্ধে উঠিয়া ভীমরাজের চীৎকার প্রতিধ্বনি করিল। সেই নির্জ্জন হিমাচলের উপত্যকাভূমি যেন ক্ষণকালের জন্য অনন্ত-সৌন্দর্য্যে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

সেই আকণ্ঠ-নিমজ্জিতা সুন্দরী হাসিয়া উঠিয়া বলিল,—"দেখ্‌লে সুদর্শন! কি একটা কাণ্ড ক'র্‌লাম। একেবারে তিন চার্‌টে পাখীকে কেমন ক্ষেপিয়ে তুলেছি।"

"বেশ ক'রেছ, তুমি জগৎ মাতাতে পার! পাখী ত ছার! এখন আমায় যে ক্ষেপিয়ে তুল্‌লে? উঠে এস।"

সবিতা উঠিল না। বলিল,—"কেমন নীল—ঘোর নীল, শীতল, সুগন্ধি, জলের রাশি? এমনটী আর কোথাও দেখেছ কি? কাশীতে গঙ্গায় ত কত খেলা ক'রেছি, কিন্তু সে এমনটী নয়। এই হরিদ্বার কত সুন্দর,—আর এই পুণ্যহ্রদের জল কত শীতল?"

সুদর্শন কাতরভাবে বলিল,—"সে ত দেখ্‌তে পাচ্ছি। উঠে এসে সব বল না। আমি হাঁ ক'রে শুন্‌ব।"

সবিতা—আবার বলিতে লাগিল,—"তার পর শোন—সেই শীতল জলে আকণ্ঠ ডুবে আছি। প্রাণ যেন শীতল হ'য়ে যাচ্চে। বুকের আগুন যেন জল হ'য়ে প'ড়্ছে। প্রাণটা মাঝে মাঝে বড় জ্ব'লে উঠ্ত। সেটা থেমেছে। আমার মতে—এই শীতল জলে ডুব্লে, সব জ্বালা জুড়াতে পারি।"

সুদর্শন চমকিয়া উঠিয়া বলিল,—"ছি! অমন কথা মুখে আন্তে নেই। তবে আমি জলে নামি।"

সবিতা দৃঢ়স্বরে বলিল,—"বেশ ত—সে ত আরও সুখের কথা। তুমি আমি দুইজনে ডুবিব। এই অতল, কৃষ্ণ সলিলরাশির চিরশীতল রাজ্যে, সোণার সিংহাসনে তোমায় আমায় পাশাপাশি হইয়া বসিয়া অনন্তসুখ সম্ভোগ করিব। তুমি ত এখান হ'তে আর আমায় গভীর রাত্রে ফেলে চ'লে যাবে না।"

আবেগপূর্ণস্বরে, সুদর্শন বলিল,—"সবিতা! সবিতা! তোমায় মিনতি করি, ঘরে এস! তোমার শরীর অসুস্থ হবে, আর পিতা দেখ্লেই বা কি ব'ল্বেন! সন্ধ্যা হ'য়েছে, আরতির শাঁক-ঘণ্টা বাজ্ছে, চল আরতি দেখি গে।"

সেই দুষ্টা জল হইতে উঠিল না। হাসিতে হাসিতে বলিল,—"আর ভুলিব না সুদর্শন! তোমার মিষ্ট কথা, অনেক শুনেছি। এখন আর আমি বালিকা নই। আগে প্রতিজ্ঞা কর।"

সুদর্শন বলিল,—"আচ্ছা ক'র্ছি। পিতার মুখে শুনেছি, শপথে পাপ হয়। কিন্তু শপথই ক'র্ছি। কি প্রতিজ্ঞা—"

কিন্তু শপথ করিবার সময় হইল না। পর্ব্বতের উপরে শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত, এক ছায়াময় ন্যগ্রোধতলে দাঁড়াইয়া গৈরিক-বসন-পরিহিত জটাজূটভূষিত, এক সৌম্যমূর্ত্তি মহাপুরুষ। তিনি গম্ভীরকণ্ঠে ডাকিলেন,—"সবিতা।"

প্রতিজ্ঞার কথা ভাসিল—নির্ব্বন্ধ ভাসিল। সে গভীর আহ্বান অবজ্ঞা করিতে সবিতার সাহস হইল না। সবিতা তাড়াতাড়ি জল হইতে উঠিয়া পড়িল। সেই জলসিক্ত, আর্দ্রবস্ত্রমণ্ডিত, নগ্নদেহের নগ্নসৌন্দর্য্য, সন্ধ্যার অন্ধকার ও আকাশের দুই একটী ফুটন্ত তারকা, মৃদুপ্রবাহী সমীরণ ভিন্ন আর কেহই দেখিল না। সে মূর্ত্তি দেখিয়া বোধ হইল, যেন কোন দেববালা রাত্রিসমাগম দেখিয়া, মানস-সরোবরের স্নিগ্ধ জলরাশি হইতে ভীত ও চকিত নেত্রে উঠিয়া, তাহার নিজের উজ্জ্বলিত নির্জ্জন কক্ষে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চারিদিকে নৈশ-নিস্তব্ধতা। নীল আকাশের কোলে অন্ধকার। পাহাড়ের কৃষ্ণবর্ণ গাত্রে সুগভীর অন্ধকার। সন্ন্যাসীর পত্রময় ক্ষুদ্র কুটীরের চারিদিকে অন্ধকার। কেবলমাত্র সেই নির্জ্জন উপত্যকার কুটীরমধ্যে এক ক্ষুদ্র দীপ জ্বলিতেছে।

পাপিয়া ঘুমাইয়াছে। কোকিল ঘুমাইয়াছে। ভৃঙ্গরাজ বুলি ছাড়িয়াছে। খদ্যোৎ জ্যোতিঃ নিভাইয়া বিশ্রাম করিতেছে! সমগ্র প্রকৃতি নিদ্রার স্বপ্নময় রাজ্যে সুষুপ্ত—জাগিয়া আছে কেবল সমীরণ। তাহার মৃদু সন্‌সনানির নিবৃত্তি নাই। আর কোলাহল করিতেছে—কেবল অদূরবর্ত্তী গোমুখীর মুখনিঃসৃত রজতকান্তি, ধীর-বিগলিত, মৃদু উচ্ছ্বসিত, স্নিগ্ধ ধারাময় বারিপ্রবাহ। সেই ঘোর নিশীথে সবাই ঘুমাইয়াছে, কেবল সন্ন্যাসীর অসুযুপ্ত অবস্থা।

দীপালোকে বসিয়া নিভৃত কুটীরে সেই মহাপণ্ডিত সন্ন্যাসী শাস্ত্রপাঠ করিতেছেন। ধীরচিত্তে, প্রশান্তভাবে, স্মিতবদনে ভাষ্য, টীকা, সমালোচনার আবৃত্তি দ্বারা মূল শ্লোকের গভীর অর্থ সরল করিয়া আনিতেছেন। সন্ন্যাসী আবৃত্তি করিতেছিলেন—

ত্বমাদিদেব পুরুষঃ পুরাণস্তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততঃ বিশ্বমনন্তরূপ ॥

আবৃত্তিই হইল, টীকা পড়িবার অবসর হইল না। কে একজন সেই অন্ধকারে গা ঢাকিয়া, অতি সন্তর্পণে কুটীরদ্বারে মৃদু করাঘাত করিল। দ্বার খোলাই ছিল, অল্প আঘাতে সম্পূর্ণ খুলিয়া গেল।

সন্ন্যাসী মুখ তুলিলেন। আগন্তুককে ভাল চিনিতে পারিলেন না। গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন,—"কে তুমি?"

উত্তর নাই। মূর্ত্তি, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইল।

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"সুদর্শন, এত রাত্রে কেন বৎস? সবিতার ত কোন অসুখ হয় নাই?" সন্ন্যাসীর সম্বোধন স্নেহবিপ্লুত।

"না প্রভু"—আর বলা হইল না। সুদর্শনের কণ্ঠ রুদ্ধ, স্বর বিকৃত।

সন্ন্যাসী সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—"বৎস! কাঁদিতেছ কেন?"

সুদর্শন, হৃদয়ের বেগ প্রশমিত করিয়া কম্পিতকণ্ঠে উত্তর করিল, "গুরুদেব! আপনি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, প্রতারণার প্রায়শ্চিত্ত কি, বলিয়া দিন্।"

সন্ন্যাসী আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, বিস্মিতচিত্তে বলিলেন,—"তোমার তাহাতে কি প্রয়োজন? খুলিয়া বল—কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তোমার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ, কম্পিত। তোমার হৃদয় চঞ্চল। এ গভীর রাত্রে তুমি পাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিতে উঠিয়া আসিয়াছ। কারণ কি সুদর্শন?"

সুদর্শন নির্ব্বন্ধ সহকারে বলিল,—"প্রভু! আগে বলুন, তার পর সব বুঝাইয়া বলিব। গুরুর নিকট প্রতারণার প্রায়শ্চিত্ত কি?"

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"প্রায়শ্চিত্ত অষ্টাহ উপবাস—কিম্বা তুষানল।"

সুদর্শন প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা শুনিয়া চুপ করিয়া কি ভাবিল। পরে

ধীরে ধীরে বলিল, "প্রভু ! এ ত গুরুপাপে লঘুদণ্ড ! ধর্ম্মের ব্যবস্থা বড় দয়াপূর্ণ দেখিতেছি। কিছু কঠোর দণ্ড ব্যবস্থা করুন।"

সন্ন্যাসী এমন গোলযোগে আর কখনও পড়েন নাই। একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন,—"বৎস ! আমার পাঠের ব্যাঘাত হইতেছে। কি হইয়াছে, খুলিয়া বল।"

সুদর্শনের চক্ষে তখন ধারা বহিতেছে। সে স্তিমিত দীপালোকে, সেই অশ্রুধারা স্বল্পজ্যোতির্ম্ময় হইয়াছে। রুদ্ধকণ্ঠে সুদর্শন বলিল,—"গুরুদেব ! এ নরাধম আপনার সহিত প্রতারণা করিয়াছে। আমি হিন্দু না হইয়াও ছদ্মবেশে আপনার গৃহ কলঙ্কিত করিয়াছি !"

সন্ন্যাসী, সর্পদষ্ট ব্যক্তির ন্যায় চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সেই জটাজুটমণ্ডিত—বিভূতিচর্চ্চিত সুদীর্ঘ দেহ যেন আরও প্রসারিত হইল। পরুষকণ্ঠে বলিলেন,—"কে তুমি ! পরিচয় দাও।"

"আমি মুসলমান,—অহিন্দু !

"মুসলমান,—অহিন্দু ! কেন তবে শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিলে ?"

সন্ন্যাসীর চির-প্রসন্ন মুখই সুদর্শন দেখিয়া আসিয়াছে। সেই ক্ষমা, ধৈর্য্য, তিতিক্ষা ও প্রেমাধার সন্ন্যাসীর উদার-হৃদয়ে ক্রোধসঞ্চার দেখিয়া, সরল-হৃদয় সুদর্শন ভয় পাইল। সন্ন্যাসীর পায়ে ধরিয়া বলিল, "প্রভু ! ক্ষমা করুন। আমি মুসলমান হইলেও নীচবংশীয় নহি। দুনিয়ার বাদ্‌সা সাহান্‌সা আকবরসাহ আমায় বন্ধু বলিয়া কোল দিয়াছেন। এ অধমের, দাসানুদাসের নাম—ফৈজী।"

সন্ন্যাসী—উত্তেজিতস্বরে বলিলেন—

"ফৈজী ! তুমি ফৈজী ! সেই পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ফৈজী ! বৎস ! হিন্দু-ধর্ম্ম অনুদার নহে। আমি হিন্দু ভাবিয়া, ব্রাহ্মণতনয় ভাবিয়াই, তোমায় আশ্রয় ও শিক্ষা দিয়াছিলাম। জানিতাম না—মুসলমান এত মেধাবী

হইতে পারে। তোমার সমস্ত অপরাধ ভুলিয়া গেলাম। শিষ্য, পুত্রাপেক্ষা প্রিয়তম, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। কিন্তু তুমি এ পরিচয় পূর্ব্বে দাও নাই কেন? কিম্বা না দিয়া চলিয়া গেলে না কেন?

সুদর্শন সাহস সঞ্চয় করিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—

"প্রভু! কারণ ব্যতীত কার্য্য হয় না। এখন অনেক কারণ-সমষ্টি ঘটিয়াছে। প্রথম—আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়াছি। বাদসাহ যে জন্য আমায় পাঠাইয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধ করিয়াছি। হিন্দুর দেশে রাজ্য করিতে হইলে, তাহাদের আপনার করিতে হইলে, তাহাদের আত্মীয় করিতে হইলে, তাঁহাদের ক্রিয়াকাণ্ড আচার-ব্যবহার ধর্ম্মপদ্ধতি সবই জানিতে হইবে। হিন্দু-মুসলমানের ভ্রাতৃভাব বর্দ্ধন করা, প্রীতির বাঁধন দৃঢ় করা, বাদসাহের উদ্দেশ্য। আমি আপনার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, হিন্দু-জাতিকে, হিন্দু দেব-দেবীকে সর্ব্বদাই রক্ষা করিয়া চলিব। দিল্লীর দরবারে হিন্দুর প্রাধান্য বৃদ্ধি করিব।"

সন্ন্যাসী মনে মনে কি ভাবিলেন, প্রকাশ্যে বলিলেন—

"বৎস! শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। তোমার উদ্দেশ্য মহৎ—উদারতা গভীর বুঝিতেছি। আমার শিক্ষা সার্থক হইয়াছে। এখন দ্বিতীয় কারণ—

সুদর্শন বলিতে লাগিল—

"সবিতা আমায় ভ্রাতৃবৎ স্নেহ করে। আশ্রমে আসা অবধি সে আমার সঙ্গিনী। দুজনে কাশীতে একত্রে এক বৎসর কাটাইয়াছি। জানিতাম না, যৌবনে সেই সরল ভালবাসা, সেই পবিত্র আনুরক্তি, সময়ে অন্যমূর্ত্তি ধারণ করিবে। সরলা ব্রাহ্মণকন্যা, গুরুকন্যা আমায় প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিবে।—আমি অধম হইলেও রমণীর পবিত্র ভালবাসার মর্য্যাদা বুঝি। প্রভো! সবিতার সম্মুখে আর প্রলোভনরূপে থাকিতে চাই না। প্রেম অতি পবিত্র, ইহা কলঙ্কিত করিতে চাই না—সুধায় বিষ মিশাইতে চাই না। নন্দনে নরক প্রতিষ্ঠা করিতে চাই না।"

সন্ন্যাসী চিন্তামগ্ন হইলেন। চিন্তার ফলে বুঝিলেন, "উভয়কে এখন পৃথক্ করাই শ্রেয়।" আবার চিন্তা—তাহার যেন শেষ নাই।

সহসা মৌন ভঙ্গ করিয়া সন্ন্যাসী বিকৃত-কণ্ঠে ডাকিলেন—"সুদর্শন!"

সুদর্শন সন্ন্যাসীর মুখ দেখিয়াই কতক বুঝিল—বলিল, "আজ্ঞা করুন।"

"এই রাত্রেই, সবিতার নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বেই তুমি আমার আশ্রম ত্যাগ কর।"

"প্রভু! আপনার আদেশের পূর্ব্বেই তাহার জন্য বুক বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছি। রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে। আকাশে তারা ক্ষীণ-জ্যোতিঃ হইতেছে, রজনীর দ্বিতীয়যাম উত্তীর্ণ। প্রভু—বিদায় দিন, জন্মের মত—

আর কথা বাহির হইল না। সেই সুন্দরগণ্ডে ধারা বহিতে লাগিল। সুদর্শন কম্পিতহস্তে গুরুর পদধূলি লইল। তাহার চক্ষের উষ্ণ প্রবাহের কয়েক বিন্দু সন্ন্যাসীর পায়ে পড়িল। সন্ন্যাসী চমকিয়া উঠিলেন। সন্ন্যাসী তিনি—সকল প্রবৃত্তিই জয় করিয়াছেন; কিন্তু স্নেহ তখনও তাঁহার হৃদয়ভূমি পরিত্যাগ করে নাই। সহজাত মানবপ্রবৃত্তির সহিত সংগ্রাম করিয়াও তখনও, হৃদয়কে তিনি মরুভূমি করিতে পারেন নাই। প্রবৃত্তির সহিত সংগ্রাম যে কতদূর দুরূহ, পরীক্ষা-ক্ষেত্রে তাহা সন্ন্যাসী যে না বুঝিলেন, তাহা নয়।

অপরাধী যখন স্বেচ্ছায় অপরাধ স্বীকার করে, অনুশোচনায় দগ্ধ হইতে থাকে, তখন তাহার অপরাধের গুরুত্ব অনেকটা কমিয়া আসে। মানুষের প্রবৃত্তি লইয়া বিচার করিতে গেলে, এইরূপই দাঁড়ায়। আইন-আদালতের নাগপাশবন্ধন, অবশ্য স্বতন্ত্র কথা।

হৃদয়ও এমন উদার আছে, যাহা সামান্য ক্ষমাপ্রার্থনায় অতি গুরুতর অপরাধের কথা ভুলিয়া যায়। সুদর্শনকে সন্ন্যাসী ভালবাসিতেন। সন্তানজ্ঞানে তাহাকে জ্ঞান বিতরণ করিয়াছিলেন। শিষ্যজ্ঞানে তাহাকে

অবাধে বিনাসন্দেহে সবিতার সহিত মিশিতে দিয়াছিলেন। সবিতা-সুদর্শনের মধ্যে যে একটা ভালবাসা ছিল—সে ভালবাসা যে কেবল একটা হৃদয়ের সরল বিনিময়, কালে যে অবস্থান্তর পরিগ্রহ করিয়া অন্য ভাবে পরিপুষ্ট হইবে না, এটাও সন্ন্যাসী ঠিক দিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন তিনি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। প্রকৃত জ্ঞানী, নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলে ভ্রমপ্রদর্শকের কাছে আরও কৃতজ্ঞ হন। সন্ন্যাসীর উদারহৃদয়ে, একটা মহা ঘাত-প্রতিঘাত উপস্থিত হইল। তিনি সুদর্শনের সরলতায়, আত্মত্যাগে, তাহার গুণের পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন।

সুদর্শনের সকল দোষ মার্জ্জনা করিয়া সন্ন্যাসী স্নেহময়কণ্ঠে বলিলেন, "বৎস! তুমি যাহাই হও না কেন—আমি চিরকাল তোমায় সেই ব্রাহ্মণ যুবক বলিয়া স্মরণ রাখিব। তুমি যে দিল্লীর বাদশাহ মহানুভব আকবরের মিত্র—ফৈজী, তাহা কখনই ভাবিব না। আমি সংসার-ত্যাগী, সমাজত্যাগী বিজনবাসী উদাসীন। একটা মায়ায় আবদ্ধ হইয়া আছি মাত্র।

"যে সমাজে থাকে, তাহার জাতি রাখার প্রয়োজন। তুমি আমার গৃহে এতদিন ছিলে, আমি তাহাতে জাতিচ্যুত হই নাই। কারণ, সমাজের সহিত আমার সম্বন্ধ অতি অল্প। বৎস! যাহা শিক্ষা দিয়াছি, তাহাতেই বুঝিতেছ, চিত্তজয়ের অপেক্ষা আর কিছুতেই প্রকৃত বীরত্ব উপযুক্ত মহত্ত্ব দেখাইতে পারা যায় না। তুমি কর্ত্তব্যের মুখে প্রবৃত্তিতে বলিদান করিলে, তোমাকে আর অধিক কি বলিব? সব ভুলিয়া যাও বৎস! আমি তোমায় ক্ষমা করিলাম। কিন্তু সাবধান! আর কখনও সবিতার সম্মুখে প্রলোভনস্বরূপে উপস্থিত হইও না। আর একটী কথা—আমার নিকট ঈশ্বরের নামে শপথ কর—কখনও হিন্দুর বেদানুবাদ করিবে না। সকল শাস্ত্র অনুবাদে তোমায় অধিকার দিলাম।"

"তাহাই স্বীকার করিলাম প্রভু! আপনার আদেশ শিরোধার্য্য।

একটী শেষ কথা! এই অঙ্গুরীয়কটি রাখিয়া দিন্। দিল্লী চলিলাম, বাদসাহের সঙ্গে চিরকালই থাকিতে হইবে। যদি কখনও কৃপা করিয়া স্মরণ করেন বা কোন প্রয়োজন হয়, বা কখনও বিপদে পড়েন, তবে এই নিদর্শন—অঙ্গুরীয়ক পাঠাইলেই শ্রীচরণ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইব।"

সুদর্শন অশ্রুপ্লাবিত চক্ষে, উদ্বেলিত-হৃদয়ে, সন্ন্যাসীর চরণ-বন্দনা করিয়া বিদায় হইলেন। ভগ্নহৃদয়ে বিষন্নমনে—চিরজন্মের মত সেই চিরপরিচিত শৈলমণ্ডিত উপত্যকার নিকট বিদায় লইয়া অন্ধকারে মিশাইলেন।

সন্ন্যাসী বিষন্নমনে কুটীরদ্বার আবদ্ধ করিয়া পুঁথি বন্ধ করিলেন। তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। আর পড়া হইল না। অশ্রুপ্রবাহ অনুরোধ মানিল না। প্রবৃত্তির বাঁধ ভাঙ্গিল। মায়াবর্জ্জিত সন্ন্যাসী, মায়ার অধীন হইয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। এই অন্ধকারে, এই ঘোর নিশায়, তাঁহার স্নেহের সুদর্শনকে চলিয়া যাইতে আদেশ করিয়া অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহার মনে এই অনুশোচনাই প্রবল হইল। সুদর্শনের সেই মলিন মুখ, ধারাপ্লাবিত আরক্তিম গণ্ডদেশ, চখের উপর জাগিয়া উঠিল। তিনি আবার দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন প্রকৃতি ম্লানমূর্ত্তিতেও হাসিতেছে। যেন তাঁহার চক্ষে অশ্রু দেখিয়া বিদ্রূপ করিতেছে। সুখের দিন অতীত হইলে, স্মৃতির প্ররোচনায় অতীতের স্মরণে যে ক্ষীণ হাস্যোদয় হয় প্রকৃতির সেই ভাব। আকাশে নক্ষত্র মলিন, খানকয়েক মেঘ মলিন তারকাপুঞ্জের স্থিররশ্মি মথিত করিয়া, পাগলের মত এদিক ওদিক ছুটিতেছে। সন্ন্যাসীর প্রাণ বড়ই কাতর হইল। যে চিরাশ্রয়, যে স্নেহমমতায় বঞ্চিত, তাঁহাকে বিদায় করিয়া সন্ন্যাসী আত্মহারা হইলেন। আবার তাঁহাকে সংসারে ফিরিতে হইল।

হরিদ্বারের সেই নির্জ্জন উপত্যকা আকুলিত করিয়া, সেই গভীর নিশীথে সন্ন্যাসী ডাকিলেন, "সুদর্শন—প্রাণাধিক, ফিরিয়া আইস।"

সে আকুল আহ্বান কেবল অসার প্রতিধ্বনি রাখিয়াই, বিশ্বব্যাপী শীতল বায়ুরাশিতে মিশাইল। যাহাকে ডাকিলেন—সে আর ফিরিল না। কাতর-আহ্বান উপত্যকার প্রস্তরময় গাত্রে কয়েকবার প্রহত হইয়া, শূন্যে বিলীন হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ব্রাহ্মণবেশী ফৈজী, যে কত বড় ত্যাগ-স্বীকার করিলেন, সন্ন্যাসী তাহার ক্ষীণতম আভাসটুকু পাইলেন মাত্র। তাঁহার পালিতা কুমারীর প্রতি ফৈজীর হৃদয় বহুপূর্ব্বেই সমর্পিত হইয়াছিল। ফৈজী জানিতেন না, সবিতা তাঁহার প্রতি কতদূর অনুরাগশালিনী হইয়াছে। ফৈজী সেই দিন সন্ধ্যাকালে গঙ্গার তীরে একথা প্রথম উপলব্ধি করিলেন, বুঝিলেন—যাহা দাঁড়াইয়াছে,—তাহাতে তাহার ম্লেচ্ছত্ব প্রকটিত করিলেও সবিতার চক্ষে তিনি আর অস্পৃশ্য হইবেন না, সে তাহার প্রণয় প্রত্যাখ্যান করিবে না।

কিন্তু একটী নিষ্কলঙ্ক, কিশোর হৃদয়ের কোমলতার সুযোগ লইয়া, তাহার উপর অযথা প্রভাব বিস্তার করিলে, গুরুর প্রতি কিরূপ কৃতঘ্নতা হইবে, তাহাও তিনি উপলব্ধি করিলেন। ফৈজীর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তবু দৃঢ়সংকল্প করিলেন, কর্ত্তব্য পালন করিবেন। সবিতার নেত্রপথ হইতে সরিয়া যাইবেন। সে সংকল্প গুরুকে নিবেদন করিলেন। তাই সে গভীররাত্রে, আর প্রলোভনের মত থাকিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিবেন না, এই ভাবিয়া, জন্মের মত বিদায় লইয়া আসিলেন।

কিন্তু যাই যাই করিয়াও যেন অবাধ্য চরণ চলিতে চায় না। আর একবার সেই নিষ্কলঙ্ক রূপজ্যোতিঃমণ্ডিত, সুষুপ্তমুখ, সেই নিদ্রাসমাচ্ছন্ন স্বপ্নময় সৌন্দর্য্যরাশি না দেখিয়া, জন্মের মত বিদায় হওয়াটা যেন তাহার পক্ষে একটা মহা অসম্ভব কার্য্য হইল। ফৈজী ফিরিলেন, কম্পিতহৃদয়ে

আর একবার সেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পর্ণকুটীর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। উপলমণ্ডিত শীতল গুহাতলে কঠিন পর্ণশয্যায় কোমলা সবিতা ঘুমাই-তেছে। সে মূর্ত্তিতে, নিদ্রার স্বপ্নের ঘোরেও অবিশ্বাস নাই, উত্তেজনা নাই, সন্দেহ নাই। সে মুখ প্রেমমাখা, বিশ্বাসমাখা, সোহাগমাখা, সরলতা-মাখা। ক্ষীণ দীপালোক মুখের উপর পড়িয়াছে, তাহাতেই যেন সেই অনিন্দ্য রূপসীর রূপের জ্যোতিঃ আরও উজ্জ্বল হইয়াছে।

সেই প্রভাত-মল্লিকার মত অতি শুভ্র, নিদ্রালসে সমাচ্ছন্ন, চিন্তাশূন্য, কলঙ্কশূন্য, সুন্দর বদন যেন শতধারে সৌন্দর্য্য লইয়া, সেই কলুষহীন শুভ্র হৃদয়খানি বিশ্বাসে পূর্ণিত করিয়া কত সুখস্বপ্ন দেখিতেছে। ধীরে ধীরে শ্বাসনিশ্বাস বহিতেছে—সেই আলুলায়িত ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম, কতক মুখের উপর, কতক শিথিল বক্ষের বসনের উপর পড়িয়া, সৌন্দ-র্য্যের উপর যদি কোন সুন্দর অবস্থা থাকে, তাহারই সৃষ্টি করিয়াছে।

সুদর্শন সেই গুহামধ্যে সবিতার পবিত্র শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া, প্রেমো-দ্বেগ রুদ্ধকণ্ঠে বলিল,—"সবিতা! শেষ বিদায় লইতে আসিয়াছি। হায়! জানিনা, কেন মুসলমানের গৃহে জন্মিয়াছিলাম। হৃদয়ে অনন্ত প্রেম লইয়া কেন বাহ্যে মুসলমান হইয়াছিলাম? ঈশ্বর! সর্ব্বশক্তিমান্ তুমি। এই বিশাল সৃষ্টির, এই বিরাট বিশ্বের ক্ষুদ্র জীবকে, কেন প্রভু এই ভীষণ সমস্যায় ফেলিলে? কেন এই সুন্দরী-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-কন্যার রূপ-জ্যোতিঃতে আমায় পতঙ্গবৎ মুগ্ধ করিলে? এই অনাঘ্রাত অনুপ-মেয় বনকুসুমের সৌন্দর্য্য আমার ন্যায় অপ্রেমিক কি বুঝিবে প্রভু!

"যাহা পাইব না—তাহার আশা কেন? যাহার চিন্তায় পাপ, তাহার কথা ভাবি কেন? যে আমার হইবে না, ঘটনাচক্র যে মিলনের পথ রোধ করিতেছে—সে মিলন-বাসনা তৃপ্তির, অসার স্বপ্নের সাফল্য আকাঙ্ক্ষা কেন? সবিতা! সবিতা! আর তোমার সম্মুখে প্রলোভন লইয়া থাকিব না! কিন্তু যেখানে থাকিব—তোমার সুন্দর মুখ,

তোমার ঐ নিষ্কলঙ্ক সরল ভালবাসা, তোমার ঐ পবিত্র হৃদয়ের উদারতার স্মৃতি লইয়া, তোমারই ধ্যানে জীবন কাটাইব।"

"না, আর এখানে থাকা উচিত নয়। সন্ন্যাসীর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি, শীঘ্রই আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাইব। সন্ন্যাসী পাঠ সমাপ্ত করিয়া হয়ত এখনই আসিতে পারেন। আর কেন—আশা গিয়াছে, ভালবাসা বিসর্জ্জন করিয়া উদাসীন হইয়াছি। সংসার হইতে মুক্তিমার্গে আসিয়াছি—হৃদয় শ্মশান করিয়াছি, আমার যাহা কিছু ছিল, যাহা এই হৃদয়ের সর্ব্বস্ব ছিল—তাহা নির্জ্জন উপত্যকায় রাখিয়া, জন্মের মত চলিয়া যাইতেছি।"

সুদর্শন একখণ্ড লিখিত ভূর্জপত্র সবিতার শিরোদেশের উপাধানের নীচে রাখিয়া, অতি সন্তর্পণে দুই বিন্দু অশ্রু চক্ষে লইয়া, ত্বরিতপদে সেই গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। চোরের ন্যায় সভয়-হৃদয়ে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া, উন্মুক্ত উপত্যকার পথানুসরণ করিল। অদূরেই যেন কাহার পদশব্দ শ্রুত হইতেছিল। কে যেন কুটীরের দিকে আসিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে সন্ন্যাসী আসিয়া সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সবিতা নিদ্রিতা। সন্ন্যাসী নিশ্বাস ফেলিয়া, সেই সরলা নিদ্রিতা বালিকার মুখের দিকে চাহিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, গৃহত্যাগী আমি, এ সব গোলযোগ লইয়া থাকিলে, আমার সাধনার, অধ্যাপনার ব্যাঘাত হইবে। এই পিতৃমাতৃহীনা শিষ্যকন্যাকে নিজ কন্যাবৎ এতদিন প্রতিপালন করিয়াছি। সবিতা জানিতে পারে নাই, আমার সহিত তাহার প্রকৃত সম্পর্ক কি? আর এই সুদর্শন! এই যুবকের সুন্দর মুখশ্রী দেখিয়া যৌবনে ব্রহ্মচারীর বেশ দেখিয়া, স্নেহে ভুলিয়াছিলাম। এতদিন ধরিয়া ইহাকে সর্ব্বশাস্ত্রে দীক্ষিত করিলাম, সে আমার সুখের স্বপ্ন বিষাদবিষে পূর্ণ করিল। এক অজ্ঞানিত কর্ম্মফলে বৎসরকালমধ্যে এই নির্দ্দোষী সবিতা, এই নিরীহ সুদর্শন—ইহাদের

হৃদয়ে একটা গভীরতর আকাঙ্ক্ষাময় প্রেমের সৃষ্টি হইল। সুদর্শনকে বিছিন্ন করিলাম বটে, এ বিচ্ছেদ বাহিরে ঘটিল বটে, কিন্তু যেরূপ বুঝিতেছি, ইহারা আজীবন স্মৃতির যন্ত্রণায় জ্বলিয়া মরিবে। সুদর্শনকে স্থানান্তরিত করিয়াছি, সবিতাকেও আর কাছে রাখিতে ইচ্ছা করি না। দিনকয়েকের জন্য হরিদ্বারে আসিয়া শান্তিলাভ করিব ভাবিয়াছিলাম, তাহা আর হইল না। কালই তীর্থভ্রমণের ছলে সবিতাকে স্থানান্তরে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইব।”

এইরূপ উপায়-চিন্তায় সন্ন্যাসীর হৃদয়ের ভার লাঘব হইল। তিনি ধীরে ধীরে সে নির্জ্জন পর্ব্বতগুহা ত্যাগ করিয়া, মুক্তবায়ুতে একটী উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস মিশাইলেন।

সবিতা ও সুদর্শন ভিন্ন ভিন্ন গুহায় নিদ্রা যাইত। সুদর্শন যে আর তাহাকে ছাড়িয়া যাইবে না, সেই আশায় প্রলুব্ধ হইয়াই সবিতা নিরুদ্বেগচিত্তে নিদ্রা যাইতেছিল। প্রতিদিন প্রভাতে সুদর্শন গুহাদ্বারে আসিয়া ডাকিত, “সবিতা।” সবিতা সে আহ্বানে উত্তর দিত, “সুদর্শন আসিয়াছ ?” সে দিন বেলা অতিরিক্ত হইলেও কেহ আসিল না। কেহ ডাকিল না। সেই নবোন্মেষিত ঊষায় কেহ আর আদর করিল না—সেদিন নিদ্রাভঙ্গে সবিতার মন বড় চঞ্চল হইল।

বেলা হইয়াছে। রৌদ্র ফুটিয়াছে। এখনি সন্ন্যাসীর পূজার জন্য স্থান মার্জ্জনাদি করিতে হইবে। সবিতা শয্যা ত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি স্নান করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। দেখিল, সম্মুখে উপাধানের উপর একখণ্ড ভূর্জপত্রে কি যেন লেখা রহিয়াছে।—দেখিল এক পত্র। তাহারই উদ্দেশে।

পত্র পড়িয়া তাহার মাথা ঘুরিল। সবিতা ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল। তাহার আদরের সুদর্শন, তাহার হৃদয়ের দেবতা সুদর্শন তাহার জীবনের লক্ষ্য সুদর্শন, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে—

সবিতা এই পর্য্যন্ত পড়িল তাহার কৃষ্ণতারকাময় আয়ত লোচন অশ্রুভারাক্রান্ত হইল।

পত্রের শেষাংশে সবিতার দৃষ্টি পড়িল। লেখা আছে—"আমি বিধর্ম্মী। সবিতা, তুমি হিন্দু-কন্যা। তোমার আমায় মিলন অসম্ভব। আমি ব্রহ্মচারী বেশে তোমার পিতার আশ্রয়ে থাকিয়া, দিল্লীশ্বরের আদেশে সংস্কৃত শিক্ষা করিতে আসিয়াছিলাম। আকবর বাদসার প্রিয়তম বন্ধু ফৈজী, সুদর্শন নাম লইয়া, তোমাদের সহিত এতদিন মিশিয়াছিল। কিন্তু সবিতা, এ প্রতারণা আমার ইচ্ছাকৃত নহে। আমি বাদসাহের নিকট প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য কত কষ্টই সহ্য করিয়াছি! ব্রহ্মচর্য্যব্রতাবলম্বী হইয়া হবিষ্যান্ন ভোজন ও একবস্ত্রে কাটাইয়াছি।

"অগ্নিস্পর্শে অঙ্গারও লোহিত হইয়া বিশুদ্ধ হয়; সবিতা, আমিও সেইরূপ হইয়াছিলাম। আমি জ্ঞানতঃ তোমার সমাজধর্ম্মের উপর কোনরূপ উপদ্রব করি নাই। আমি পৃথক্ খাইতাম, পৃথক্ শুইতাম, কেবল একত্রে দুইজনে বেড়াইতাম। তোমার মুখের মিষ্ট কথা শুনিতাম, তোমার কিশোর-সুলভ, তাপসীবালার মত সরলতায় মোহিত হইতাম। আর তোমার সুন্দর, অতিসুন্দর-মুখখানি দেখিয়া, শারদ-কৌমুদী উছলিত জ্যোতির ন্যায় তোমার বিম্বাধরে উজ্জ্বল ফুটন্ত হাসি দেখিয়া, মনের সন্তোষলাভ করিতাম।

"এই বিশ্বপাতার রাজ্যে কত অপবিত্র পদার্থ আছে—দিনরাত ত তুমি তাহাদের স্পর্শ করিতেছ। এ হিসাবে আমা হইতে তোমাদের কোন অপবিত্রতাই ঘটে নাই। সবিতা! আমি বিধর্ম্মী, কিন্তু ভালবাসা, ধর্ম্ম মানে না, জাতি মানে না, সমাজ মানে না, বাধা মানে না, তুমি আমায় ভালবাস। আমি তোমায় ভালবাসি। এ অবিনশ্বর ভালবাসা ভুলিবার নয়। জাতি-ধর্ম্মগত বৈষম্যে এ ভালবাসা লোপ পাইবার নয়। আমি তোমার নয়ন-পথ হইতে অন্তরালে গেলেই,

কালে তুমি যদি আমায় ভুলিতে পার, তাই অনেক ভাবিয়া আমি জন্মের মত বিদায় লইলাম।

"তুমি পবিত্রা, তোমায় অপবিত্র করিতে পারিব না। তুমি কলঙ্কশূন্যা, তোমায় কলুষিত করিতে পারিব না। মর্ম্মযন্ত্রণায় কাতর হইয়াছি—বৃশ্চিক-দংশনে জ্বলিতেছি, হৃদয় জ্বলিয়া পুড়িয়া অঙ্গারে পরিণত হইবে, হউক—তাহাতে ক্ষতি নাই। তোমার স্বর্ণময়ী প্রতিমা স্মৃতিপথ হইতে কখনই মুছিব না। মুছিবার চেষ্টা করিলেও পারিব না। সবিতা! আমি অকৃতজ্ঞ নহি, হৃদয়হীন নহি। যাহা ঘটিয়াছে, ভুলিয়া যাও। লোকে নানা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে। সব কথা স্বপ্ন বলিয়া ভাবিয়া লও। সুদর্শন তোমার চক্ষে মরিয়াছে, এই বিশ্বাসেই হৃদয়ে শান্তিলাভ কর। যদি কখনও কোন বিপদে পড়, যদি কখনও কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয়, স্মরণ করিও, তোমার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিব।"

পত্র পড়া শেষ হইল। চ'খের জলের বাঁধন ভাঙ্গিল। সবিতা বালিকার ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। আশা ভাঙ্গিলে, সর্ব্বস্ব গেলে, কে না কাঁদে! সে কাঁদিল, কিন্তু সুদর্শনের উদারতায় ভুলিল। স্বার্থত্যাগের মহৎ দৃষ্টান্ত দেখিয়া, নিজের ভগ্ন-হৃদয়ে বল-সঞ্চার করিয়া লইল। একদিকে পিতা, অন্য দিকে সুদর্শন—একদিকে ভক্তি, অন্য দিকে প্রেম, ভক্তিরই জয় হইল। সবিতা, সুদর্শনকে ভুলিতে মনস্থ করিল। এ চিন্তায়, তাহার আরক্তিম গণ্ডে আবার অশ্রুপ্রবাহ বহিল। জানি না—কতদিন সেই অশ্রুরেখার ক্ষীণচিহ্ন বাহিরে শুষ্ক হইলেও তাহার সেই কোমল গণ্ডে, এক অতি পবিত্র স্মৃতির কৃষ্ণ-রেখা গুপ্তভাবে রাখিয়া গিয়াছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সুখের রাজ্য নহে—চারিদিকেই বিদ্রোহ! আকবর সাহ এই বিদ্রোহ দমনের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।

খালি বিদ্রোহ নহে, বর্ষব্যাপী প্রবল সমরানলে রাজ্য ছারেখারে যাইতে বসিয়াছে। রাজপুতকুল-গৌরব মহারাণা প্রতাপ সিংহ রাজপুতানায় মহা-বিপ্লব ঘটাইতেছেন। দলে দলে সমস্ত রাজপুতরাজগণ তাঁহার পতাকার অনুসারী হইতেছে। প্রতাপকে হীনবল করিতে হইলে, অগ্রে তাঁহার সহকারীদিগকে দমন করা আবশ্যক। প্রতাপের সহকারী রাজপুত সামন্তগণের মধ্যে শক্তিগড়ের রাণাসাহেবও একজন।

চিতোরে সেনা পাঠাইতে হইলে, শক্তিগড়ের মধ্য দিয়া পাঠানই বিশেষ সুবিধা। মিত্র ভাবিয়া, প্রথমে আকবর সাহ শক্তিগড়ের রাণাকে অনুরোধপত্র দিলেন, সে পত্রের অবমাননা ঘটিল। রাণা, নিজরাজ্য মধ্য দিয়া মোগলকে সেনা লইয়া যাইতে দিবেন না, প্রতিজ্ঞা করিলেন। প্রত্যুত দর্পিতভাবে উত্তর দিয়া বাদসাহকে আরও ক্রুদ্ধ করিয়া তুলিলেন।

আকবর সাহ সামান্য কেল্লাদারের এ অপমান সহ্য করিতে পারিলেন না। অম্বরাধিপ মানসিংহ—এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে ব্রতী হইলেন। অগণ্য মোগল-সেনা শক্তিগড়-দুর্গ বেষ্টন করিল। শক্তিগড়ের রাণা পরাজিত, হৃতসর্ব্বস্ব ও বন্দী হইলেন, আর বন্দিনী হইলেন, তাঁহার অন্তঃপুরিকাগণ।

প্রথমতঃ সমস্ত বন্দিনীরা সেনাপতি মানসিংহের শিবিরে প্রেরিত হইল। সেদিন প্রভাতে দরবার করিয়া, সেনাপতি তাহাদের সকলকে মুক্তিদান করিলেন, রহিল কেবল একজন। সে রমণী, ষোড়শী রূপসী, অতি সুন্দরী, ঠিক যেন দেববালা।

মানসিংহ সমাদরের সহিত সেই তরুণী, ষোড়শী, লাবণ্যময়ী

বন্দিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"সুন্দরি! বন্দিনীরা বীর-ভোগ্যাই হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, সকল বন্দিনীরাই দিল্লীশ্বরের নিকট প্রেরিত হয়। তুমি রাজপুত-কন্যা, সেই জন্যই আমি চিরন্তন প্রথার ব্যতিক্রম করিলাম। তোমার সুখস্বচ্ছন্দের কোন ব্যাঘাতই হইবে না। কোন কষ্টই হইবে না, আমার অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে তুমি সযত্নে স্থান পাইবে। রাজ্ঞীর ন্যায় সম্মান পাইবে।"

সেই সুন্দরী বন্দিনী, দিল্লীশ্বরের সেনাপতির এ অদ্ভুদ ব্যবহারের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে না পারিয়া, বিনীতস্বরে বলিলেন, "মহারাজ! আপনি ক্ষত্রিয়! বীরপুরুষ! সকলকে মুক্তি দিয়া যে উদারতা দেখা-লেন, অভাগিনী তাহাতে বঞ্চিতা হইল কেন?"

কথাটার উত্তর দেওয়া মানসিংহ সহজ ভাবিলেন না। কাজেই প্রথমে একটু হাসিলেন, তৎপরে একটু ভাবিলেন, শেষে একটু থতমত খাইলেন। জবাবটা কি দেওয়া যায়? জবাব আসিল না। অত বড় সেনাপতি—এক সামান্য রমণীর কথার উত্তর দিতে, বুদ্ধির ও ভাষার সহায়তাহীন হইলেন।

এই সঙ্কট পরীক্ষার সময় একজন প্রহরী আসিয়া বলিল, "মহারাজ। বাদসাহের দূত অপেক্ষা করিতেছেন। খবর বড় জরুরি।"

মানসিংহ যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। মনে মনে প্রহরীকে খুব তারিফ করিলেন। সেই সুন্দরী বন্দিনীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"সুন্দরি! এখন অন্তঃপুরে যাও। সময়ান্তরে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিব।"

মানসিংহ শিবির-কক্ষ হইতে বাহিরে চলিয়া আসিলেন। একটী সামান্য রমণীর সরল প্রশ্নের উত্তর করিতে যিনি শক্তিকে কুলাইয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না—তিনি রাজদূতের সহিত আর একটা রাজ্যজয়ের গভীর মন্ত্রণায় চিন্তামগ্ন হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাজ-দূতকে বিদায় দিয়া, মহারাজ মানসিংহ বিশ্রামকক্ষে আরাম করিতেছেন। দুইজন ক্রীতদাসী তাঁহাকে ব্যজন করিতেছে। সুবাসিত অম্বুরীর ধূমে সেই নিস্তব্ধ কক্ষ পরিপূর্ণ। মহারাজের মনও চিন্তানিবিষ্ট। তিনি অন্যমনস্কভাবে, নিকটস্থ স্বর্ণপাত্রে ন্যস্ত সঙ্কোচয়িত সুগন্ধি প্রসূনরাশি লইয়া কখন আঘ্রাণ লইতেছেন, আবার কখন বা দুই একখানি উন্মুক্ত পত্রের কিয়দংশ পাঠ করিতেছেন। এমন সময়ে কঞ্চুকী আসিয়া সংবাদ দিল, "মহারাজ! এক সন্ন্যাসী সাক্ষাৎলাভার্থী—আদেশ করুন।"

মানসিংহ চিন্তিতভাবে বলিলেন, "সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসী—আচ্ছা, এইখানেই লইয়া আইস "

এক গৈরিকপরিহিত, দীর্ঘকায়, ত্রিশূলহস্ত সন্ন্যাসী আসিয়া গৃহমধ্যে দাঁড়াইলেন। সে উন্নত, তেজঃপূর্ণ, বিভূতিমণ্ডিত দীর্ঘবপু দেখিয়া, মানসিংহ অবনতমস্তকে প্রণাম করিলেন।

সন্ন্যাসী আবেগপূর্ণ-কণ্ঠে, অর্দ্ধরুদ্ধস্বরে ডাকিলেন—"মহারাজ!"

"অনুমতি করুন।"

"মহারাজ! আপনি দিল্লীশ্বরের সেনাপতি—আমি সামান্য প্রজা। বিচারার্থী হইয়া আসিয়াছি। রাজন্! আমার ভিক্ষার ধন, দরিদ্রের সম্বল ফিরাইয়া দিন্।"

মানসিংহ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, মহা সমস্যায় পড়িলেন। সন্ন্যাসীর কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া বলিলেন,—"প্রভু! কি আজ্ঞা করিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছি না।"

"মহারাজ! আপনি রাজপুত, ক্ষত্রিয়। ন্যায্য বিচার করুন।—শক্তিগড়ের দুর্গ হইতে যে বন্দিনী আনিয়াছেন, তাহারা স্বাধীনতা পাইয়াছে। একজন খালি আপনার অন্তঃপুরে। তাহাকে মুক্তি দিন।"

এতক্ষণে মানসিংহ কথাটা বুঝিলেন, কিন্তু বিস্মিত হইলেন। এই সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর সহিত সেই সুন্দরী বন্দিনীর কি সম্পর্ক থাকিতে পারে, তাহা তাঁহার রাজবুদ্ধিতে আসিল না। তিনি শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন, "প্রভু! ও অসঙ্গত অনুরোধ করিবেন না। আমি দিল্লীশ্বরের কর্ম্মচারী মাত্র—আজ্ঞার অধীন।"

সন্ন্যাসী অশ্রুপ্লুত-চক্ষে বলিলেন,—"সত্য—কিন্তু অত বড় আকবর-সাহ, এক সামান্য রমণী লইয়া কি করিবেন? মহারাজ! মানসিংহ! সন্ন্যাসী হইয়াও যাহার জন্য পূরা সন্ন্যাসী হইতে পারি নাই, যাহাকে ঘটনাবশে স্থানান্তরে রাখিয়াও ইষ্টকর্ম্মে মনোনিবেশ করিতে পারি নাই—উদ্যানপালিতা লতার ন্যায় যাহাকে অতি যত্নে প্রতিপালন করিয়া এতবড় করিয়াছি, আমার সেই জীবনসর্ব্বস্ব—ভিখারীর ধনে তোমার ন্যায় রাজ্যেশ্বরের কি প্রয়োজন? তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেই দিল্লীশ্বরেরই বা কি প্রয়োজন?"

মহারাজ মানসিংহ সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বন্দিনী আপনার কে?"

সন্ন্যাসী স্নেহপ্লুতকণ্ঠে বলিলেন,—"আমার পালিতা কন্যা, আমার সর্ব্বস্ব। অতি শিশুকাল হইতে তাহাকে পালন করিয়া অতবড় করিয়াছি। আজন্ম-তাপস যেমন হরিণ-শিশু পালন করিয়া তাহার স্নেহাবদ্ধ হয়, আমি তাই হইয়াছি।"

মানসিংহ বিস্মিতভাবে বলিলেন, "আপনি দেখিতেছি ব্রাহ্মণ। সে ত পরিচয় দিয়াছে ক্ষত্রিয়া।"

"সত্য—সে ক্ষত্রিয়া, উচ্চবংশে তাহার জন্ম। কোন্ শাস্ত্রে আছে, ক্ষত্রিয়া-কন্যা ব্রাহ্মণের অপাল্য? সে আশ্রয়বিহীনা, দীনা। শক্তিগড়ের রাণার সহিত তাহার কোন সম্পর্কই নাই। আমিই তাহাকে কোন গুহ্য কারণে তীর্থভ্রমণের সময় দুর্গে রাখিয়া গিয়াছিলাম। দুর্গাধিপতি

আমার শিষ্য। আপনি দুর্গাধিপতিকে বন্দী করিয়াছেন, তাঁহার অন্তঃপুরিকাদের বন্দিনী করিয়াছেন।"

মানসিংহ, সবিতার অনিন্দ্য রূপরাশি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন। প্রথম দর্শনের সেই স্বল্প-আকর্ষণ, এই বিচ্ছেদ-সম্ভাবনায় আরও পূর্ণা-বয়ব প্রাপ্ত হইল। সেই বন্দিনীর তীব্রোজ্জ্বল কটাক্ষ, সুন্দর-ভ্রূযুগল, আকর্ণবিশ্রান্ত লজ্জাবনত চঞ্চল চক্ষু, ভ্রমরকৃষ্ণ কেশপাশ, আর সেই মুখের আদ্যোপান্তে মণ্ডিত, শুভ্রসারল্য তাঁহার অতবড় পাষাণ-হৃদয়ে একটা রেখা কাটিয়া দিয়াছিল। সবিতার রূপজ্যোতিতে তাঁহার হৃদয়কন্দরের আমূল পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

মানসিংহ কম্পিতস্বরে বলিলেন,—"ব্রাহ্মণ! এই পূর্ণযৌবনা, অনূঢ়া ক্ষত্রিয়া-রমণীকে লইয়া আপনি কি করিবেন? দেশের চারিদিকে যুদ্ধবিগ্রহ, চারিদিকে লুটপাট। এই দুর্দ্দিনে শক্তিহীন বৃদ্ধের আশ্রয় অপেক্ষা কি অম্বরাধিপের অবরোধ আপনার পালিত-কন্যার পক্ষে নিরাপদ নয়? আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তাহাকে দিল্লীতে পাঠাইব না।"

সন্ন্যাসী কথাটা একবার ভাবিয়া দেখিলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন,— "মহারাজ! সবিতা আমার পালিতা-কন্যা, কিন্তু উচ্চবংশীয়া। আপনাকে পরিচয় দিব না মনে করিয়াছিলাম। এই পালিতা বনলতার সৌন্দর্য্য নীরবে শুখাইবে মনে করিয়াছিলাম। জগৎকে ইহার পরিচয় জানিতে দিই নাই। কিন্তু মহারাজ, যখন অভয় দিয়া আমার অনূঢ়া কন্যাকে আশ্রয় দিতেছেন, তখন আপনার হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি। আজ শুভদিন আছে। আমি সবিতাকে আপনার হস্তে ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া সমর্পণ করিব।

মানসিংহ অস্ফুটস্বরে বলিলেন,—"বিবাহ! বিবাহ! অসম্ভব! রাজ্ঞী কমলকুমারী কি বলিবেন?" প্রকাশ্যে বলিলেন,—"এ প্রস্তাব

বিবেচনার যোগ্য। এই যুদ্ধাবসানে একটু নিশ্চিন্ত হই, আর একবার পদধূলি দিবেন।"

সন্ন্যাসীর মুখমণ্ডল অভিমানে, স্বল্পক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি তেজঃপূর্ণ গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"মহারাজ! তবে কি সবিতাকে উপভোগের, বিলাসের উপকরণ করিতে চান? রাজপুরীতে যেরূপ শত শত বিলাসদাসী আছে, তাহাদেরই দলভুক্ত করিতে চান?—না মহারাজ! আমায় ফিরাইয়া দেন। আমি সবিতাকে লইয়া যাই।"

মানসিংহের বীরহৃদয় সেই অলোকসামান্যা রূপবতীর তীক্ষ্ণকটাক্ষে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল। তিনি অনেক সুন্দরী দেখিয়াছেন, কিন্তু সবিতার চরণসেবার যোগ্যাও তাহারা নয়। বাত্যাতাড়িত উর্ম্মিরাজির ন্যায় তাঁহার মনে অনেক চিন্তা ভাসিয়া গেল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "এক ভয়, রাজ্ঞী কমলকুমারী। কিন্তু ক্ষত্রিয়-রাজার অন্তঃপুরে আরও অনেক মহিষী আছে। রাণী কমলকুমারীর তাহাতে কি? আমার সুখের জন্য, আমার ভোগের জন্য আমি যাহাকে চাই, কমলকুমারী তাহাতে বাধা দিবার কে? আমি সবিতাকে ধর্ম্মপত্নী করিব।"

মানসিংহ তখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রকাশ্যে বলিলেন, "দেব! আপনার আদেশ অবমাননা করিতে সাহস করি না। কিন্তু এ বিবাহ গোপনেই হইবে। উৎসবের কোন অবসরই নাই। সাক্ষী—আপনি, আর উপরের মেঘাম্বর-বিলাসী বৈকুণ্ঠশায়ী বিষ্ণু। আর কোন আপত্তি আছে?"

সন্ন্যাসীর চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেই দিনই সেই আশ্রমপালিতা সরলা সবিতা—অম্বরের রাজরাণী হইলেন। সেই সুদর্শনের চিরপ্রিয় সবিতা—ঘটনা-চক্রে সুখ ও ঐশ্বর্য্যের বিলাসপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু সবিতার এ জীবনাঙ্কের ঘটনাপূর্ণ যবনিকা এখানেই পড়িল না। আমাদের আরও একটু অগ্রসর হইতে হইবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অম্বরেশ্বরী মহারাণী কমলকুমারী এক স্বর্ণ-খচিত, আলোক-মণ্ডিত সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া আপন মনে গাহিতেছিলেন—

"যোতু ধনিয়া নেইয় চলি যাইবু
জহর খায়ে মরুব-রাজা মেরা—
লিখি লিখি পতিয়া কতই হম্ ভেজয়ু
খবর নই পঁইয়ু রাজা মেরা।"

"দূর্ হ ছাই, ওই গানটিই মনে আসে। আমি জহর খাইতে গেলাম কেন? মরিতে গেলাম কেন? যে নূতন আসিয়াছে, নূতন সোহাগিনী হইয়াছে, সেই মরিবে—সেই জহর খাইবে।"

নিকট হইতে কে যেন প্রতিধ্বনি করিল, "সেই মরিবে—সেই জহর খাইবে।"

রাণী কমলকুমারী সবিস্ময়ে পশ্চাতে ফিরিলেন। দেখিলেন, স্বর্ণ-শৃঙ্খলিত শুক তাঁহার মুখের কথা লইয়া, ঐরূপ বিদ্রূপপূর্ণ প্রতিধ্বনি করিয়াছে। ঘৃণাপূর্ণ কৃত্রিমক্রোধে, মহারাণী তাহার পিঞ্জরের মধ্যে খানিকটা পানের পিক ফেলিয়া দিলেন। পিঞ্জরটা একটু দোলাইয়া দিয়া বলিলেন,—"দূর্ নিমক্‌হারাম! আমারই দানা খাইয়া আমাকেই ঠাট্টা।" পাখীটা গালাগালি সায় সুদ ফিরাইয়া দিল।

ভিত্তিবিলম্বিত, নিষ্কলঙ্ক মুকুরগাত্রে মহারাণীর প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। সেই মদনমোহিনীর সৌন্দর্য্যময়ী প্রতিমার, একটী প্রতিদ্বন্দ্বী-মূর্ত্তি যেন মুকুর নিজবক্ষে লইয়া রাণীকে উপহাস করিতেছে। দোলায়িত, মণি-খচিত, বিচিত্র-বেণী, কজ্জল-রেখা-চিত্রিত, মন্মথের ক্রীড়াক্ষেত্রস্বরূপ সেই দুটি সুন্দর চক্ষু, সেই সমুন্নত গ্রীবাভঙ্গি, সেই ফুটন্ত হাসি, সেই অলসিত সৌন্দর্য্য-প্রতিবিম্ব দেখিতে দেখিতে, রাণী কমলকুমারী একটু হাসিলেন। মুকুরের কাছে আরও সরিয়া দাঁড়াইলেন—মনে মনে বলি-

লেন, "এই রূপরাশি, এই বাসনারাশি লইয়া, কেন আমি মরিব? সে মরিবে। কিন্তু কেন সে মরিবে? সে কি অপরাধ করিয়াছে? কেন আমি তাকে মারিব? সে ত আমার পাটরাণীত্ব কাড়িয়া লয় নাই। এ রাজসংসারে তার মতন কত আছে—কেন আমি তাহাকে মারিব?"

আবার চিন্তা। এবারের চিন্তায় সংকল্প আরও পরিস্ফুট হইল। রাণী চঞ্চলভাবে বলিলেন,—"তাহাকে মারিতেই হইবে। সে আমায় পথে বসাইতে আসিয়াছে। সে নিজে হাসিয়া আমায় কাঁদাইতে আসিয়াছে। নিজে সুখের সাগরে ডুবিয়া, আমায় দুঃখে ভাসাইতে আসিয়াছে; সে নিশ্চয়ই মরিবে, সেই জহর খাইবে। পুরুষের মন, বিশ্বাস নাই। এই রূপের জোরেই একদিন সে আমায় সিংহাসন হইতে দূর করিয়া দিতে পারে। সে সুন্দরী—নচেৎ আমার ভয়ের কারণ ছিল না।"

রাণীর সখি চঞ্চলা, দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এই সব কাণ্ড দেখিতেছিল। সে সহসা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "জহরের অত ছড়াছড়ি কেন রাণিজি! এ গরীবকে দুচারটা এনাম দিন্, বাঁচিয়া যাইবে।"

রাণী কৃত্রিম ক্রোধের সহিত বলিলেন,—

"দূর্ হ পোড়ারমুখী—তুই আবার এখানে ম'র্তে এলি কেন?"

"অনেক খবর—জরুর, সাঁচ্চা খবর। এক একটার দাম, দশ দশ্ আস্রফি।"

"ঠাট্টা রাখ—প্রকৃত কথা কি বল।"

"ব'ল্‌ব আর কি—আমার মাথা আর মুণ্ডু! নূতন রাণীর চ'খে জল দেখে এলুম। বাদসা নাকি মহারাজকে যুদ্ধে পাঠাচ্ছেন। রাণীজী নাকি ছাড়তে চান্ না। বিরহটা এখনই লেগেছে।"

"এরি মধ্যে এত? বলিস্ কি? শুনে হাসি পায় যে।"

"এতো পহেলা খবর। তার পরের খবর কি জান রাণীজী?

"না—"

"নূতন রাণী, রাজা যুদ্ধ থেকে ফিরে আস্‌বার পর পাটরাণী হবেন। মহারাজ ত এই আশ্বাস দিয়াছেন। তা হ'লে তোমার অদৃষ্ট—একেবারে সাফ্‌—অম্বরের মণিখচিত মহল ছেড়ে, আবার তোমাকে সেই পাষাণগড়ের পাথরের কক্ষে ফির্‌তে হবে।"

রাণী কমলকুমারী চিন্তামগ্না হইলেন। তাঁহার প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। সে তীব্র আঘাতে দুইটী মুক্তাফল চক্ষু বহিয়া ঝরিল। তিনি বুঝিলেন, কপাল ভাঙ্গিয়াছে। কপাল ভাঙ্গিলে কে না কাঁদে?

চঞ্চলা বড় মুখরা। কান্না দেখিয়া সে রাগিল। বলিল,—"তিনি, কাঁদিতেছেন বিরহে, তুমি কাঁদিতেছ নিরাশায়। আমারও যে কান্না পাইতেছে রাণীজী!"

একটা গোলাপফুলের মস্ত তোড়া সোণার ফুলদানের উপর থাকিয়া, গৃহের চারিদিকে সুবাস ছড়াইতেছিল। রাণী কমলকুমারী কিছুই সম্মুখে না পাইয়া, কৃত্রিম ক্রোধবশে তোড়াটা লইয়া—চঞ্চলার গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিলেন।

চঞ্চলা হাসিতে হাসিতে বলিল,—"রাণীজী! এ সোহাগের অভিমানের তালটা আমার উপর কেন? কেন মিছে কাঁদিতেছ সখি। বিধাতা তোমায় পাটরাণী করিয়া পাঠাইয়াছেন—রাজার মেয়ে, রাজার বধু, রাজার পত্নী তুমি; তোমার অধিকার একটা বাঁদীতে লইবে? ছিঃ! ছিঃ! আর চঞ্চলা জীবিতা থাকিতে তোমার নিমকের অপমান হইবে! এই দেখ রাণীজি—নূতন রাণী সবিতাসুন্দরীর মরণের জোগাড় করিয়াছি।"

চঞ্চলা চারিদিকে চাহিয়া একখানি পত্র মহারাণীর হাতে দিল। মহারাণী পত্র পড়িয়া বলিলেন,—"তুই এ চিঠি কোথায় পেলি?"

ভবানী জুটিয়ে দিয়েছেন।"

"এর জবাব গেছে?"

"হাঁ! নূতন রমণী লেখাপড়ার ভিতর যান্‌নি। আজ রাত্রে ভাঙ্গা শিবমন্দিরের কাছে আস্‌তে ব'লে দিয়েছেন।"

রাণী কমলকুমারীর মুখ আনন্দে উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। স্ত্রীলোকের প্রধান শত্রু সপত্নী। বিশেষতঃ রাজা রাজড়ার ঘরে—যেখানে ধন-দৌলত, মণিমুক্তা, ঐশ্বর্য্যসম্মান লইয়া কথা। রাণী গম্ভীরস্বরে বলি-লেন,—"এর পরিণাম কি হবে ভেবেছিস্ চঞ্চলা?"

"ভেবেছি, চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন, নির্ব্বাসন—না হয় কারাগার।"

"তা নয়, প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে। অতদূর গিয়ে কাজ নেই। যদি একটা গোলমাল হয়, আমাদেরও অনিষ্ট আছে।"

চঞ্চলা বলিল, "আমায় ছেলেবেলায় লোকে ভূতের ভয় দেখাতে চেষ্টা ক'র্‌ত। কোন্ বনের ভিতর ভূত আছে, তা অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখিয়ে দিত। আর আমি স্বচ্ছন্দে সেই বনের মধ্যে গিয়ে ভূত দেখি-বার জন্য ঘুরে বেড়াতাম। রাণিজি! সেই আমি। এ সব কাজে সাহস চাই। আজন্ম তোমার নিমক্ খেয়েছি। তোমার একটা উপকার ক'র্‌ব। তাতে ম'র্‌তে হয়, না হয় ম'র্‌লাম।"

"ভাল! যা বুঝেছিস্ তাই কর্। এই নে মতির মালা। এতবড় খবরটা আন্‌লি—তার বক্‌শিশ্।"

চঞ্চলা মালাছড়াটা লইয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

স্বর্ণপাত্রে গন্ধভরা রাশীকৃত শুভ্র চামেলি। সদ্যঃপ্রস্ফুটিত, সরস ফুলগুলির বোঁটাকাটা। আর চম্পক-কলির ন্যায় অঙ্গুলিবিশিষ্টা সুন্দরী সবিতা, সেই আধফুটন্ত ফুলগুলি লইয়া মালা গাঁথিতেছেন। নিকটস্থ

আর একখানি স্বর্ণপাত্রে আর এক ছড়া গাঁথামালা রহিয়াছে। তাহার সুগন্ধে সেই কক্ষ পরিপূর্ণ।

জ্যোতির্ম্ময় হীরকবলয়, হস্তের প্রতিকম্পনেই ঈষৎ সঞ্চালিত হইতেছিল। এলায়িত বেণীর ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি, বাতায়ন-পথ-প্রবিষ্ট মৃদু-সমীর ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছিল। ফুলের পর ফুলগুলি সূক্ষ্মসূত্র-গ্রথিত হইয়া বিচিত্রমাল্যে পরিণত হইতেছিল। নিজের কলকৌশল দেখিয়া, শিল্পী মুখ টিপিয়া টিপিয়া মৃদু হাসিতেছিলেন, এক এক বার দ্বারপথে সোৎসুক দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। এমন সময়ে অম্বরাধিপ গৃহপ্রবেশ করিলেন।

নূতন রাণী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মহারাজা, রাণীকে লইয়া এক আসনের উপর বসিয়া সাদরে চিবুক ধরিয়া প্রশ্ন করিলেন,—"সবিতা! মালা গাঁথিতেছ কার জন্য ?"

"আপনারই জন্য।"

"যুদ্ধ-ব্যবসায়ী সেনাপতি মালার মর্ম্ম কি বুঝিবে ? প্রেম-বিজড়িত এই পবিত্র পুষ্পমাল্যের গৌরব কি জানিবে ?"

"দেবতা পুষ্পের গুণগ্রাহী কি না, ইহা বিচার করিয়া ভক্ত তাঁহাকে অর্পণ করে না। আমি আপনার সেবিকা—দাসী। আপনার পূজার জন্য এই ফুলগুলি সংগ্রহ করিয়াছি। শুনিয়াছি, রাজপুতমহিলারা যুদ্ধযাত্রাকালে স্বামীকে বিজয়মাল্য পরাইয়া দেন। কুললক্ষ্মীর আদরের মালা পরিয়া বীরেরা যুদ্ধজয়ী হইয়া থাকেন।"

মানসিংহ, সবিতার রূপে ইতিপূর্ব্বেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এখন সরলতায় মুগ্ধ হইলেন। হাসিয়া বলিলেন,—"রণকল্যাণি! তোমার প্রার্থনা, সেই শক্তিরূপিণী ভবানী নিশ্চয় শুনিবেন। দাও—মালা পরাইয়া দাও। আমার অন্তঃপুরের পঞ্চাশৎ রাজপুতমহিষীর মধ্যে কেহই আমার বিজয়কামনা করে নাই।"

সবিতা মালা তুলিয়া লইয়া সলজ্জভাবে মহারাজের গলদেশে পরাইয়া দিলেন। মালা গাঁথিবার সময়, রাজাকে সাজাইবার জন্য সে সাহস ছিল, সে সাহস যেন এখন কমিয়া আসিল। সবিতা অম্বরেশ্বরের পার্শ্বে বসিলেন।

মানসিংহ বলিলেন,—"বোধ হয়, উপস্থিত যুদ্ধের পর দক্ষিণাপথে যাইতেছি। এবার গোলকুণ্ডা লইয়াই হাঙ্গাম। সবিতা! তোমার জন্য ভাল ভাল হীরক লইয়া আসিব।"

সবিতা নম্রস্বরে বলিলেন, "মহারাজ! আমি পথের ধূলি ছিলাম, আমায় আপনি সমাদর করিয়া বুকে স্থান দিয়াছেন। দরিদ্র ক্ষত্রিয়-কন্যাকে রাজমহিষী করিয়াছেন। অম্বরের রাজভাণ্ডারে রত্নের অভাব কি মহারাজ! যে রত্ন আমি পাইয়াছি, তার চেয়ে আর শ্রেষ্ঠ কি মহারাজ! চিরকাল যেন অনুগ্রহ-দৃষ্টি থাকে, এই অধিনীর প্রার্থনা।"

মহারাজ মানসিংহ মনে মনে যথেষ্ট প্রীত হইলেন। তিনি সবিতার হৃদয়ের ভাব বুঝিতে পারিলেন। সবিতার রূপের ও গুণের সমান পক্ষপাতী হইলেন। অন্তরে ও বাহিরে যার এত সৌন্দর্য্য, প্রাণে যার এত ভালবাসা, হৃদয়ে যার এত প্রেম, সে সুন্দরী যে সহজে তাঁহার হৃদয়াধিকার করিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? কোন মহিষীতেই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই। তাহারা রাজমহিষী হইয়া জন্মাইয়াছে,—মানুষ হইয়া জন্মায় নাই।

মানসিংহ আনন্দিতচিত্তে বলিলেন, "রাজ্ঞি! যুদ্ধ মিটিতে কিছু বিলম্ব হইবে। সমস্ত বন্দোবস্ত স্থির করিবার জন্য কাল আমি দিল্লী যাইব। তার পর ফিরিয়া আসিয়া যুদ্ধযাত্রা করিব। এরূপও হইতে পারে যে, হয় ত দিল্লী হইতেই সরাসর যাত্রা করিতে হইবে। তাহা হইলে এই শেষ দেখা। সবিতা—সবিতা—বিদায় দাও।"

কি এক ভবিষ্যৎ দুর্নিমিত্তে সবিতার মন ব্যাকুল হইয়া পড়িল।

প্রাণের ভিতর যেন ঝটিকা বহিতে লাগিল। আবেগভরে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া উঠিল। চক্ষে দুই চারিটী মুক্তাফল ঝরিয়া পড়িল। আর কথা কহা হইল না। বলি বলি করিয়াও বলা হইল না।

সেই পাষাণহৃদয় মানসিংহ, রাণীর চক্ষের জল দেখিয়া গলিলেন। কর্ত্তব্য—সম্মুখে ঘোর কর্ত্তব্য। সবিতাকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া কক্ষত্যাগ করিলেন। মনে রহিল—সেই সুন্দর আরক্তিম গণ্ডপ্রবাহী দুইটী মুক্তাফল। সেই মুক্তাফলের পবিত্র দীপ্তিরেখায়, মহারাজের স্মৃতি হইতে পঞ্চাশৎ মহিষী সরিয়া পড়িলেন। মানসিংহ মনে মনে ভাবিলেন—"যে সুন্দর তার সবই সুন্দর। এতদিন কেবল খেলা করিয়াছি। আজ প্রকৃত মহিষী পাইলাম !"

সমস্ত দিন মনটা খারাপ গিয়াছে। রাজা চলিয়া যাইবার পর—সবিতা খুব খানিকটা কাঁদিয়া হৃদয়ের ঝটিকা কতক শান্ত করিয়া লইয়াছে। কেন কাঁদিয়াছে তাহা সে ঠিক বলিতে পারে না। কত কি দুঃখ, কত কি আশঙ্কা, কত কি নিরাশা, একত্রে মিশিয়া যেন তাহাকে কাঁদাইয়াছিল।

সবিতার মন সুদর্শনকে ভুলিয়াছে কি না, সবিতার মনই জানে। রাজরাণী হইয়া সে যেন দরিদ্র সুদর্শনের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল। সবিতা হিন্দু-কন্যা। রাজ্যেশ্বরের ধর্ম্মপত্নী। পরের চিন্তা সে কেন করিবে ? সে অম্বরের ঐশ্বর্য্য চায় না, ধনরত্ন চায় না, সম্পদ্ চায় না—চায় কেবল পত্নী-জীবনের কর্ত্তব্য স্বামিসেবা। সন্ন্যাসী-কথিত বাল্যকালে শ্রুত সেই সীতা-দময়ন্তী-সাবিত্রীর স্মৃতিগুলি তাহার হৃদয়ে এখন পূর্ণশক্তি প্রকাশ করিয়াছে। হৃদয়ের দুর্ব্বলতা দমন করিয়া, তাই সে স্মৃতি হইতে সুদর্শনকে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। সে চেষ্টা সফল হইয়াছে কি না কে জানে ?

সমস্ত দিনই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ ছিল। সায়াহ্নে দ্বার খুলিয়া নূতন

রাণী বাহিরে আসিলেন। একবার মনে হইল, মহারাণী কমলকুমারীর সহিত দেখা করিয়া আসেন। সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া তিনি অন্তঃপুরস্থ উত্থানে প্রবেশ করিলেন।

উত্থানের চারিদিকে বৃত্তাকার, চতুষ্কোণ, আয়তাকার দূর্ব্বাক্ষেত্র। মধ্যে মধ্যে লোহিত কঙ্করময় ক্ষুদ্র ভ্রমণপথ। ভ্রমণপথের দুইধারে, বেলা, চম্পক, চামেলী, নাগকেশর, মতিয়ার ফুলভরা সুবাসমাখা গাছগুলি মৃদু-সমীরে ধীরে আন্দোলিত। স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতা-কুঞ্জ। লতাকুঞ্জের মধ্যে মর্ম্মর-বেদী, বেদীপার্শ্বে সুন্দর ফোয়ারা। ফোয়ারার রজতময় মুখ হইতে রজতধারা উঠিতেছে, পড়িতেছে, চারি-দিকে চূর্ণমুক্তার ন্যায় ছড়াইয়া পড়িতেছে—স্ফুটিত হইয়া বিম্বাকারে ঊর্দ্ধে উঠিতেছে—চারিপার্শ্বের বাতাসে সেই শীতল জলের কণা বহিয়া লইয়া ফুলের গায়ে মিশাইয়া দিতেছে।

রুদ্ধ-কক্ষের বাহিরে আসিয়া, বাহ্য-প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে সবিতা-সুন্দ-রীর হৃদয় প্রফুল্লিত হইল। সেই এক মর্ম্মর বেদিকার উপর উপবিষ্টা হইল। এমন সময়ে কে যেন ডাকিল—"রাণিজি!"

সবিতা পিছনে চাহিল। দেখিল—বড় রাণীর সখী চঞ্চলা। চঞ্চলাকে সবিতা পছন্দ করিতেন। মনের ভাব গোপন করিয়া বলি-লেন, "কেন চঞ্চল?"

"আমায় স্মরণ করিয়াছিলেন কেন?"

"একবার অম্বরের পুরাতন শিবমন্দিরে যাইতে হইবে। সেই ব্রাহ্মণকে আসিতে বলিয়াছি। তুমি আমার সঙ্গে যাইবে কি?"

"রাণীজির হুকুম! আমি বাঁদী। অনুমতি হইলেই তাহা পালন করিব।"

"ছিঃ! চঞ্চল! অমন করিয়া "বাঁদী" সাজিয়া হীনতা স্বীকার করিও না। ভগবানের রাজ্যে সবই সমান। আমি কুটীরে থাকি-

তাম—রাজরাণী হইয়াছি—আবার অদৃষ্ট বিগুণ হইলে পথে দাঁড়াইতে হইবে। তোমায় আমি সখীর মত, ভগিনীর মত দেখি!

চঞ্চলা—পাষাণী নয়, হৃদয়হীনা নয়। এ পবিত্র সরলতায় তার মন ভিজিল। মনে মনে ভাবিল,—"হায়! কেমন করিয়া ইহার সর্ব্বনাশ করিব।"

সবিতা অন্তঃপুরে আসা অবধি, একজন সর্ব্বদাই তাহার কাছে দিন রাত থাকিত। সে আর কেহই নয়—চঞ্চলা। থাকিতে থাকিতে চঞ্চলার সহিত সবিতার একটু অন্তরঙ্গতা ঘটিল। চঞ্চলা, পাটরাণীর সখী হইলেও সকল রাণীর কাছে এক এক বার যাইত। অপর রাণীরা বলিতেন—বড় রাণী সবিতার কক্ষের সকল সংবাদ জানিবার জন্যই, চঞ্চলাকে নূতন রাণীর কাজে দিনরাত যাইতে দিতেন। যে যাহা সন্দেহ করুক—কিন্তু সরলা সবিতা, চঞ্চলাকে ভালবাসিয়া বিশ্বাস করিতেন।

যে দিন এক বর্ষীয়সী চিঠি লইয়া অন্তপুরে আসে, চঞ্চলা, সবিতার নামের সেই চিঠি খুলিয়া পড়িয়াছিল। সে চিঠিতে খালি লেখা ছিল—"সবিতা! তোমার পিতৃ-আশ্রমের সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ-কুমার একবার তোমার সাক্ষাৎপ্রার্থী, তুমি রাজরাণী—এ দরিদ্রকে ভুলিও না। জন্মের মত দেশ ছাড়িয়া যাইব। একবার দেখা করিতে চাই। অম্বরের উপান্তে ভগ্ন শিবমন্দিরে রাত্রি একপ্রহর হইতে দ্বিপ্রহরের মধ্যে অপেক্ষা করিবে।"

চঞ্চলা ইহার মধ্যে দোষের কথা কিছু দেখিতে পায় নাই। সবিতার উত্তর সেইই লইয়া গিয়াছিল। সবিতা তাহাকে দিয়াই বলিয়া পাঠাইয়াছিল,—"তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে বলিও।"

নূতন রাণীর জীবনের মধ্যে কি এক অদ্ভুত রহস্য নিহিত,—তাহা চঞ্চলা জানিত না। উত্তর লইয়া যথাস্থানে পৌছিয়া দেখিল,—সেই ব্রাহ্মণ-যুবক অতুলনীয় রূপবান্।

চঞ্চলা কৌশল অবলম্বন করিয়া বলিল,—"রাণিজী পত্রের এই উত্তর দিয়াছেন।" তারপর একটু নিজের কথাটা চালাইয়া বলিল,—"তিনি আসিবেন বটে, কিন্তু এখন তিনি রাজরাণী, আপনার সহিত সর্ব্বদা দেখা করা একটা ভয়ানক কথা! অম্বরের রাজরাণীরা সূর্য্যের আলো দেখিতে পান না। আপনি তাঁর কে?"

সেই ব্রাহ্মণ যুবক এ কথার উত্তর দিলেন না। এক মর্ম্মভেদী দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"তুমি তোমার রাণীকে বলিও, তাঁহার কোন অসুবিধা হইলে আসিয়া কাজ নাই।"

চঞ্চলা বড় দুষ্টা; সে আবার কথা ঘুরাইয়া লইল। বলিল—"রাণীজী যে একথা বলিয়াছেন, তাহা নয়। আমি নিজেই বলিতেছিলাম। অম্বরের রাণীরা ত মধ্যে মধ্যে দেবালয়েও আসেন। তা আপনি আসিবেন, দেখা হইবে।"

ব্রাহ্মণ-যুবকের চোখের জল শুকাইল না। তিনি চলিয়া গেলেন। পাপীয়সী চঞ্চলা ভাবিল,—"এতো সুন্দর পুরুষ! আর এই নবীনা যুবতী! ইহাদের মধ্যে এমন কি আবশ্যকীয় কথা থাকিতে পারে, একবার গোপনে দেখিতেই হইবে।"

চঞ্চলা দুষ্টবুদ্ধি, সে বড়-রাণীর হিতাকাঙ্ক্ষিণী, স্বার্থ তাহার জীবনের মূল-মন্ত্র। সে অত হিতাহিত বিচার করিবে কেন?

সবিতা যখন চঞ্চলাকে সঙ্গে লইতে চাহিলেন, তখন সে আনন্দের সহিত স্বীকৃতা হইল। সুর বদ্‌লাইয়া কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "আ! মরি! কি সুন্দর রূপ তাঁর! রাণীজি! তিনি আপনার কে হন?" রাণী সবিতা-সুন্দরী এ কথার কোন উত্তর দিলেন না।

হঠাৎ রাণীর নিজের মনেও প্রশ্ন জাগিয়া উঠিল,—তিনি আমার কে হন? "বুঝি জন্মান্তরের কেউ" এই উত্তরও সহসা হৃদয়ে প্রতি-

ধ্বনিত হইল। নিজেই বিস্মিত ও লজ্জিত হইলেন। প্রকাশ্যে চঞ্চলাকে বলিলেন,—"কেউ নয়।"

ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি তেজ সঞ্চয় করিতে পারে—এই ভাবিয়াই সবিতা বলিয়াছিল,—"কেউ নয়।" কিন্তু চঞ্চলা সে উত্তরে ভুলিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

"তুমি আর আসিও না সুদর্শন!

"সবিতা! আমি জানি তোমার কাছে আসা এখন পাপ। তুমি পরস্ত্রী—রাজরাণী। তোমার মুখ সূর্য্যে দেখিতে পায় না। দেখিবার ইচ্ছা করিতাম না। কিন্তু জন্মের মত যাইতেছি।"

"কোথায় যাইতেছ?"

"দক্ষিণাপথে।"

"কেন?"

"যুদ্ধের জন্য।"

"বাদসা তোমায় সেনাপতি করিয়াছেন?"

"করেন নাই। আমি ইচ্ছা করিয়া হইয়াছি।"

"কেন—?"

"জীবনের ভার নামাইব। মরি—বেহেস্তে যাইব। বাঁচিয়া থাকি, আর তোমার চিন্তা করিব না—তাহা হইলে জাহান্নমে ডুবিব।"

"সুদর্শন! তুমি বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্, রাজ্যের উচ্চপদস্থ। বাদসাহ তোমার প্রিয়বন্ধু। তোমার আশা অনেক, ভরসা অনেক। তোমার এ বৈরাগ্য কেন? এ অনাস্থা কেন? আমায় ভুলিয়া যাও, পূর্ব্বের স্মৃতি ডুবাইয়া দাও। আমি ছিলাম, এ কথা ভুলিয়া যাও। চিত্তজয়ই বীরত্ব, এ কথা'ত সন্ন্যাসী তোমায় শিক্ষা দিয়াছেন।"

সুদর্শন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—

"ভুলিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছি, সবিতা! এতদিন ত ভুলিয়াই ছিলাম। কিন্তু যে দিন সন্ন্যাসীর মুখে শুনিয়াছি, তুমি রাজরাণী হইয়াছ—অম্বররাজ মানসিংহের মহিষী হইয়াছ, সেই দিনই একটা সাধ হইয়াছে, আর একবার দেখিব। জন্মশোধ—শেষবারের মত। মনে করিও না, তোমায় পাইলাম না বলিয়া মরিতে যাইতেছি। তোমায় আমায় মিলন অসম্ভব অপেক্ষাও অসম্ভব। তবু দেখিতেছি, জীবন যেন শূন্য, কেন, তা জানি না। উদ্যম নাই, শক্তি নাই, কার্য্যে ইচ্ছা নাই। কেবল চিন্তা, অনির্দ্দিষ্ট চিন্তা। এই মনোবিকারই আমার সংকল্প দৃঢ় করিয়াছে।"

সবিতা কথাগুলা লইয়া মনে মনে তোলাপাড়া করিল। পরে স্থিরস্বরে বলিল,—"সুদর্শন! জগতে ভালবাসা ত অনেক রকম আছে। আমরা বাল্যসঙ্গী, আমি চিরকালই তোমায় প্রিয়তম বন্ধু বলিয়া প্রাণ খুলিয়া ভালবাসিব। ইহাতে তোমার কি কোন সান্ত্বনা নাই? যাও, আর থাকিও না। আমি পরস্ত্রী—"

সুদর্শন কোন উত্তর করিল না। কথাগুলিতে তাহার বক্ষ যেন শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। এত আঘাত, সে কখনও পায় নাই। সেই সবিতা—আর সেই সুদর্শন। সেই সবিতা এখন তাহার সহিত দু-দণ্ড কথা কহিতেও ইচ্ছুক নহে। সে ধীরে ধীরে নীরবে অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া গেল। রাখিয়া গেল, কেবল একটা দীর্ঘশ্বাস। কেহ দেখিল না—কেহ তাহার প্রাণের কাতরতা বুঝিল না—কেবল বুঝিল সেই বায়ুরাশি। বায়ুস্তর নিজের করুণাপূর্ণ বক্ষে সেই কাতর উষ্ণনিশ্বাস মিশাইয়া লইল।

সবিতা দেখিলেন,—সুদর্শন চলিয়া গিয়াছে। তিনি একটু অগ্রসর হইয়া ডাকিলেন,—"চঞ্চলা!"

চঞ্চলা সেখানে নাই—কাজেই কেহ উত্তর করিল না। সবিতা

ভয় পাইলেন। রাত্রি তখনও দ্বিপ্রহর হয় নাই। ভগ্ন শিবমন্দির হইতে প্রাসাদের পথ যে খুব দূরে, তা নয়। তিনি একাকিনী যাইতেও পারেন। মনে করিলেন, চঞ্চলা হয় ত একটু আগে অপেক্ষা করিতেছে। সবিতা ভীতি-পূর্ণ কণ্ঠে একটু অগ্রসর হইয়া আবার ডাকিলেন,—"চঞ্চলা—চঞ্চলা।"

কেহই উত্তর দিল না। রাণী পশ্চাতে পদশব্দ পাইলেন। চমকিয়া দাঁড়াইলেন। এক দীর্ঘাকৃতি বস্ত্রাবৃত পুরুষ, সেই অন্ধকারের মধ্যে তাঁহার গতিরোধ করিল। বিদ্রূপপূর্ণ-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"অম্বরের রাজরাণি! এই অন্ধকারে কাহাকে প্রাণ খুলিয়া ভালবাসিতেছিলে?"

সে বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠস্বর সবিতা চিনিল। তাহার শরীরের ভিতর যেন তীব্র বিদ্যুতের জ্বালা ছুটিল। ভয়ে তাহার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। সবিতা কাতরকণ্ঠে বলিল,—"মহারাজ! কঠোর বিদ্রূপে মর্ম্মব্যথা দিবেন না। আমি অবিশ্বাসিনী নই।"

"তা'ত বুঝিলাম। ঐ ব্রাহ্মণ-কুমার কে?"

ব্রাহ্মণ-কুমারের পরিচয় দিতে সবিতার সাহস হইল না। অম্বরের রাজরাণী, এই গভীররাত্রে, ব্রাহ্মণবেশী মুসলমানের সহিত আলাপ করিতেছিলেন, কথাটাও বড় ভয়ানক। তাহা ছাড়া সুদর্শনের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করিলে, একটা ভয়ানক বিভ্রাট ঘটিতে পারে। সুদর্শন যে ফৈজী, বাদসার সহচর, এ কথা প্রকাশ হইলে মানসিংহ ও ফৈজীর দারুণ মনোভঙ্গ অপরিহার্য্য। কথাটা বাদসাহের কাণে গেলে, একটা বিপরীত কাণ্ড হইবে। সবিতা সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল,—"মহারাজ! ব্রাহ্মণ-কুমার আমার বাল্য-সঙ্গী। উহার পরিচয় নাই বা জানিলেন।"

মানসিংহ গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন,—"তুমি অম্বরের রাজরাণী, মহারাজ মানসিংহের মহিষী। গভীর রাত্রে রূপবান্ ব্রাহ্মণ-কুমারের সঙ্গে

পুরীর বাহিরে দেখা করিতে আসিয়াছ—সঙ্গে আবার চঞ্চলা। মহলে একথা কিরূপভাবে প্রতিধ্বনিত হইবে, বুঝিয়াছ কি?"

সবিতা দর্পিতভাবে বলিল,—"না মহারাজ! আগে বুঝি নাই। দোষ আমার, কিন্তু কেহ না বুঝে, আপনি ত বিশ্বাস করিবেন?"

মানসিংহ উত্তেজিতকণ্ঠে বলিলেন,—"না, আমিও বিশ্বাস করিব না। যদি তোমাদের কথাবার্ত্তা না শুনিতাম, না হয় বিশ্বাস করিতাম। দুইদণ্ড পূর্ব্বে হয় ত তোমার কথায় মরিতাম বাঁচিতাম। নারী-চরিত্রের রহস্য দেবতারাও বুঝিতে পারেন না। তুমি রাজকুলাঙ্গনা হইয়া, এই রাত্রে একাকী দুর্গের বাহিরে কেন আসিয়াছিলে, তাহার সন্তোষজনক কারণ কি দিবে?"

সবিতা মহা সমস্যায় পড়িল।

সুদর্শনকে রক্ষা করিতেই হইবে। সবিতা ভাবিল,—"মনে ত কোন পাপ নাই। ঘটনাচক্রে অপরাধী দাঁড়াইতেছি, যা হয় আমার অদৃষ্টেই ঘটুক।" সুদর্শনকে রক্ষা করিতেই হইবে, দ্রুতগতিতে সবিতা এই কথাগুলি ভাবিয়া লইলেন। কম্পিতস্বরে বলিলেন,-"মহারাজ! আপনি রাজা—বিচারক আপনি। যদি দোষী বিবেচনা করেন, দণ্ড ব্যবস্থা করুন। নীরবে রাজ-আজ্ঞা পালিত হইবে।"

পাষাণ-হৃদয় মানসিংহ চঞ্চলভাবে বলিলেন,—"যখন সমস্ত কথা বলিতেছ না, তখন আমার সন্দেহই সত্য। তুমি আর দুর্গ প্রবেশ করিতে পারিবে না। রাজপুরীতে তোমার স্থান নাই।"

মস্তকে সহসা বজ্র পড়িলে, আহত ব্যক্তি যেরূপ জ্ঞানশূন্য অবস্থায় উপস্থিত হয়, সবিতাও সেইরূপ হইয়া পড়িল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"মহারাজ! আপনার মহিষী হইয়া, অত বড় দুর্গে—এত বড় অম্বররাজ্যে স্থান পাইব না? কোথায় যাইব?"

মানসিংহ বিদ্রূপপূর্ণস্বরে বলিলেন,—"এ বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে অনেক

স্থান আছে। ধরিত্রী সকলেরই ভার বহন করেন। আমি ইচ্ছা করিয়া তোমায় দূর করিতেছি না। আদরে, বিশ্বাসে, হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি মহিষীর কর্ত্তব্যই করিয়াছ। তোমায় ভিখারিণী করিতে চাই না, অন্য দণ্ড দিতে চাই না। তোমাকে রাজরাণীর মতই বিদায় দিব। আজ রাত্রিতে কল্যাণেশ্বরের মন্দিরে থাক। কাল প্রাতে সেখানে বাহক ও শিবিকা যাইবে। তাহাদের যথা ইচ্ছা লইয়া যাইতে বলিও। আমার ইচ্ছা হইয়াছিল, তোমায় রাজরাণী করিয়াছিলাম। এখন সে ইচ্ছার বিরাগে তোমায় ত্যাগ করিতেছি।"

সবিতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"মহারাজ! আমি আপনার বিবাহিতা পত্নী—"

মানসিংহ কঠোর হাস্যের সহিত বলিলেন,—"রাজপুত রাজাদের এরূপ অনেক পত্নী থাকে।"

সবিতার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। অনেক চিন্তা মুহূর্ত্তমধ্যে হৃদয়ে আন্দোলিত হইল। পথিপার্শ্বস্থ এক শুষ্ক বৃক্ষকাণ্ড ধরিয়া, বজ্রাহতা বল্লরীর ন্যায় সবিতা ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল। তাহার মনে অত্যন্ত চিন্তা—আর তাহার চক্ষের সম্মুখে যেন বিরাট বিশ্ব এক মহাগভীর খাতের মধ্যে ধীরে ধীরে ডুবিয়া পড়িতেছিল।

চিন্তাবসানে সবিতা দেখিল,—সে একা। রাজা চলিয়া গিয়াছেন।

সেই বিরাট বিশ্বমাঝে, সূচীভেদ্য অন্ধকারের কোলে, সাধারণ রাজপথে সে আশ্রয়হীণা, অবলম্বন-হীনা। রাজরাণী হইয়াও সে ভিখারিণী। ভিখারিণীর তবু থাকিবার স্থান আছে, তাহার তাহাও নাই।

সবিতার সেই চিরসরল পবিত্র-হৃদয়ে, ক্রোধ, ক্ষোভ, অভিমান যুগপৎ আধিপত্য বিস্তার করিল। গর্জ্জিতা ফণিনীর ন্যায় অভিমান-দৃপ্তা সবিতা ভাবিল, "কি অপরাধ আমার, স্বামিন্! যে তুমি আমায় পরিত্যাগ করিলে? রাজা হইয়াও বিচার না করিয়া, তুমি কি দোষে

আমায় ত্যাগ করিলে ? কেন তুমি আমায় অবিশ্বাস করিলে ? আমি আশ্রমবিহঙ্গিনীর ন্যায়, মুক্তবায়ুতে চিরদিন বিচরণ করিয়া আসিয়াছি। দুইচারি দিনের মধ্যে রাণী সাজিতে পারিব কেন প্রভু ? তুমি দেখিলে না, বিচার করিলে না—বৃথা সন্দেহে আমায় বর্জ্জন করিলে! দোষ তোমার নয়! দোষ আমার অদৃষ্টের। তুমি সুখে থাক, কিন্তু মরিবার সময় একবার পায়ের ধূলা দিতে আসিও। যদি সতী সাধ্বী হই, দেবতা আমার এ তেজ রাখিবেন। তোমায় দেখা দিতেই হইবে।"

উপরে নীলাকাশে কত তারা জ্বলিতেছে। বায়ুস্তরে কত খদ্যোৎ ছুটাছুটী করিতেছে। নৈশ-সমীরণ অন্ধকারে রাজপুরীর দিকে ধীর-গতিতে চলিয়াছে। গাছে পাখী নীরব, সমগ্র প্রকৃতি সুষুপ্ত, কেবল সেই পথিমধ্যে, বিনিদ্র-নেত্রা সবিতা একা দাঁড়াইয়া কত কি ভাবিল। সে অন্যমনস্কভাবে কতকদূর অগ্রসর হইল। দেখিল, অদূরেই রাজ-পুরী! গবাক্ষপথ হইতে উজ্জ্বল দীপরশ্মি বিকীরিত হইয়া পার্শ্বস্থ হ্রদের কৃষ্ণ-সলিলরাশির উপর পড়িতেছে। অভিমানিনীর গণ্ড বহিয়া ধারা বহিল। সবিতা মনে মনে বলিল,—"ছি! আবার ওদিকে চাহিতেছি! অত নিষ্ঠুর যে, আবার তাহার কথা ভাবিতেছি! কিন্তু এ গভীর রাত্রে যাই কোথায় ?

সবিতা একবার মনে করিল, আশ্রমে ফিরিবে। কিন্তু তাহার পালকপিতা সন্ন্যাসী হয় ত কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, অথবা সে আশ্রমও নাই। আবার ভাবিল, "আশ্রমের পথও কোন্ দিকে তাহাও জানি না। কতদূর, কে আমাকে পথ দেখাইবে ? কোন দেবালয়ে গিয়া দেবতার সেবায় জীবন কাটাইব। কিন্তু তাহারও অনেক বিঘ্ন। প্রধান শত্রু—এ পোড়া রূপ যে ছাই সঙ্গে সঙ্গে। রূপ নষ্ট করিব কিরূপে ? সবিতা অনেক ভাবিল—কিছুই স্থির হইল না। যেদিকে চক্ষু যায়, সেই দিকেই চলিল।

প্রকৃতির চিরপ্রিয় কন্যা, প্রকৃতির ক্রোড়েই আবার ফিরিল। প্রস্র-বণে মুক্তাধারা আছে, বৃক্ষে সুমিষ্ট ফল আছে, বৃক্ষের পত্র আছে, পর্ব্বতের বক্ষে নির্জ্জন গুহা আছে, শুষ্ক পর্ণ আছে, ভগ্ন উপলখণ্ডও আছে, আর মাথার উপর সেই দীনের আশ্রয় অনন্ত শক্তিমানও আছেন। এতক্ষণের পর সে যেন চিন্তাসাগরে কূল পাইল।

সেই যামান্তকালে পথিমধ্যে বসিয়া, সবিতা উর্দ্ধনেত্রে আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল,—"সর্ব্বান্তর্য্যামী তুমি বিষ্ণু। আকাশের উপরে তুমি আছ প্রভু! আমি অকূলে আত্মসমর্পণ করিলাম। লজ্জানিবারণ! লজ্জা রক্ষা করিও।"

সেই অন্ধকারে, গভীর নিশীথে, একবস্ত্রে, রক্ষকমাত্রবিহীনা হইয়া, মহারাজ মানসিংহের মহিষী—দময়ন্তীর ন্যায় নিরাশ্রয় অবস্থায়, অম্বর ত্যাগ করিলেন। হায় রে! মানুষের অদৃষ্ট!

নবম পরিচ্ছেদ

রাজপুরীতে সবিতার নিকট বিদায় লইয়াই মানসিংহ দিল্লী যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু যাওয়া হয় নাই। সে দিন সন্ধ্যার সময়েই একটা বিশেষ কারণে তাঁহাকে পুনরায় অম্বরে ফিরিতে হয়। কোন আবশ্যকীয় কাজের জন্য তিনি গুপ্তভাবে পুরী প্রবেশ করেন।

অন্তঃপুরের দিকে নদীতীরে যে দ্বার আছে—সেই দ্বার দিয়াই মানসিংহ পুরী প্রবেশ করেন। তাঁহার একবার ইচ্ছা হইয়াছিল—সবিতার সহিত শেষ দেখা করিবেন—ও আবশ্যকীয় কার্য্য সারিয়া লই-বেন। অম্বর হইতে এক ক্রোশ দূরে এক প্রান্তরমধ্যে তাঁহার সেনারা অবস্থান করিতেছিল।

প্রবেশদ্বারেই দেখিলেন—চঞ্চলা দাঁড়াইয়া আছে। মহারাজকে সহসা উপস্থিত হইতে দেখিয়া চঞ্চলা শিহরিয়া উঠিল।

সবিতা দেখিল,—এক সুন্দরকান্তি যুবাপুরুষ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া

—৯৪ পৃষ্ঠা।

Emerald Printing Works.

মানসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"চঞ্চলা! এখানে দাঁড়াইয়া আছিস্ কেন? এ গুপ্তদ্বার খোলা কেন?"

চঞ্চলার হৃদয়ে প্রথমে ভয় হইয়াছিল। মহারাজের প্রশ্ন শুনিয়া তাহার সাহস হইল। সে বলিল,—"নূতন রাণী তাঁহার এক আত্মীয়ের সহিত সাক্ষাৎ জন্য ভগ্নমন্দিরে গিয়াছেন। আমি এখানে তাঁহার অপেক্ষা করিতেছি।"

মানসিংহের হৃদয় সন্দিগ্ধ হইল। এই গভীর নিশীথে, দাসীমাত্র সঙ্গে না লইয়া সবিতা কাহার সহিত দেখা করিতে গেল—তাহা তাঁহার মাথায় আসিল না। তিনি প্রবেশদ্বার বন্ধ করিয়া, একাকী মন্দিরের দিকে গেলেন। অন্ধকারের মধ্য হইতে শুনিলেন—দুইজনে কথোপকথন করিতেছে। কণ্ঠস্বরে চিনিলেন, একজন স্ত্রীলোক ও অপরটী পুরুষ। স্ত্রীলোকটী বলিতেছেন,—"আমি চিরকালই তোমায়"—আর শুনিতে হইল না। আগুন ধরিল।

তারপর যাহা ঘটিয়াছে, পাঠক তাহা জানিয়াছেন। মানসিংহ আর পুরীপ্রবেশ করিলেন না। চঞ্চলাকে কোন কথা প্রকাশ করিতে তিনি পূর্ব্বেই নিষেধ করিয়া আসিয়াছিলেন।

অগণ্য বাহিনী লইয়া মানসিংহ রাজপুতনায় চলিলেন। সবিতাকে নিরাশ্রয় করিয়া তাঁহার হৃদয় আদৌ ব্যথিত হইল না। সে পাষাণ বীরহৃদয় একটুও কাঁপিল না—টলিল না, কাঁদিল না। তিনি প্রতিজ্ঞামত কয়েক সহস্র আস্‌রফী ও চারিজন বাহক কল্যাণেশ্বরের মন্দিরে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল—রাণীজী সেখানে নাই। তাহাতেও নিষ্ঠুর মানসিংহের হৃদয় টলিল না। ধিক্ তোমায়! তুমি না রাজ্যেশ্বর? তুমি না দিল্লীশ্বরের সেনাপতি?

সমর-কোলাহলে, শত্রুমধ্যে অসি-আস্ফালনে, মানসিংহ অতীত ঘটনা ভুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথমে চেষ্টা সফল হইল

না—গভীরজ্বালায় অন্তর পলে পলে দগ্ধ হইতে লাগিল। শেষ সবই ভুলিলেন—কেবল ভুলিলেন না— সবিতার সেই সুন্দর মুখ! অতুলনীয় রূপরাশি—আর তাহার কলঙ্কময় ঘৃণিত ব্যবহার।

মানসিংহের পাপ-রাজ্যে পরদিন প্রভাত পর্য্যন্ত তিষ্ঠিতে সবিতার মন হইল না। অন্ধকাররাশি মথিত করিয়া—সবিতা একাকী পথ চলিতে লাগিল। যেদিকে দুই চক্ষু লইয়া যায়, সেই দিকেই তাহার সেই রক্তাভ চরণ দুখানি—বন্ধুর পথের উপলখণ্ডের অসংখ্য বাধা সহ্য করিয়া ও ক্ষত-বিক্ষত হইয়াও কর্ত্তব্যপালন করিতে লাগিল।

সবিতা আর চলিতে পারে না। বড়ই ক্লান্ত। আকাশের নক্ষত্র খুব ক্ষীণ জ্যোতিঃ হইয়াছে—প্রভাতের মৃদু বাতাস বহিতেছে—উষার আলোক ফুটিয়া উঠিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। জগতের নিদ্রাভঙ্গ-সময় উপস্থিত—প্রস্ফুটিত বন্য-পুষ্পের সুগন্ধে চারিদিক আকুলিত।

সবিতা একবার আকাশের দিকে চাহিল। সেই আকাশের উপর জ্যোতির্ম্ময়-আসনে একজন শ্রেষ্ঠ বিচারক আছেন—তাঁহার নিকট কর-যোড়ে অস্ফুটস্বরে কি ভিক্ষা করিল। মনে ভাবিল,—"সংসারের সুখ সবই ফুরাইয়াছে। এই পৃথিবীতে আমার আশ্রয় স্থান নাই।' এ জীব-নের ভার বহিয়া কোথায় বেড়াইব। অন্ধকারে পরিত্রাণ আছে, দিবা-লোকে এ পোড়-রূপ কোথায় লুকাইব? মরিলেই ত সব ফুরায়।" কাজেই সবিতা জীবন-বিসর্জ্জন করিবার কল্পনা করিল।

সম্মুখে এক স্বচ্ছসলিল-পূর্ণ—স্বল্প তরঙ্গময় হ্রদের বারিরাশি অন্ধকারে বিশ্রাম করিতেছে। সবিতা আর একদিন জলে ডুবিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু সেদিন সুদর্শন ছিল বলিয়া তাহার ডোবা হয় নাই। আজ সে সুশী-তল হ্রদে, সন্তপ্ত জীবনের ভার নামাইবার কল্পনা করিল।

বাধা দিবার কেহই নাই। সবিতা ধীরে ধীরে হ্রদের উচ্চপাড়ের উপর উঠিল। ঊর্দ্ধনেত্রে যুক্তকরে উপরের দিকে চাহিয়া বলিল,—

"আত্মহত্যায় পাপ আছে—হিন্দুর কন্যা, একথা খুবই বুঝি। কিন্তু আমার রূপরাশি—আমার শত্রু। এই সহজাত শত্রুর জন্য, ধর্ম্ম নষ্ট হইতে পারে। হে দয়াময়! হে সর্ব্বান্তর্য্যামি! এই ধর্ম্মরক্ষার জন্য—তোমার চরণে আশ্রয় লইবার জন্য হ্রদের জলে ডুবিয়া মরিব। আশ্রয় হইতে বঞ্চিত করিও না প্রভু!"

সবিতা সেই উচ্চপাহাড়ের উপর হইতে হ্রদের জলে পড়িল। হ্রদের স্থির সলিলরাশি ভয়ানক কম্পিত হইয়া উঠিল। রমণীর সেই সুন্দর দেহ, কৃষ্ণ-হ্রদের জলে ডুবিয়া আর ভাসিল না। সেই সঙ্গে সঙ্গে আর একজন দৃঢ়কায় বলিষ্ঠ পুরুষ—সেই হ্রদের জলে ঝাঁপ দিলেন। অল্প-ক্ষণমধ্যেই সবিতাকে তুলিয়া স্কন্ধে লইয়া—অদূরবর্ত্তী মোগল-শিবিরে পৌঁছিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

সে কালরাত্রি কাটিয়াছে। আবার দিবালোক—প্রকৃতিবক্ষ স্বর্ণ-রঞ্জিত করিয়াছে। আবার ধীরপবনে শিবির মধ্যস্থ এক নির্জ্জন কক্ষে সবিতার ঘন কৃষ্ণ কেশরাশি ঈষৎ বিকম্পিত হইতেছে। আবার সূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণ, সেই চিরসুন্দর মুখে পড়িয়া—তাহার জ্যোতিঃ বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

সবিতা ধীরে ধীরে নেত্রোন্মীলন করিয়া দেখিল—সে যে স্থানে আছে—তাহা সুবৃহৎ বস্ত্রাবাসের এক ক্ষুদ্র কক্ষ। তাহার পার্শ্বে একজন দাসী বসিয়া ব্যজন করিতেছে।

সবিতা আবার চক্ষু মুদিল। গত রাত্রের সমস্ত কথা মনে হইল। পূর্ব্বস্মৃতি ঘোরতর মর্ম্মবেদনা—নিরাশা জাগাইয়া তুলিল। সবিতা, পার্শ্ব-বর্ত্তিনী সেবিকাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কোথায়?"

"উত্তম স্থানেই আছেন। বেশী কথা কহিবেন না।"

"তুমি কে ?"

"আমি বাঁদী।"

"কার বাঁদী ?"

"নাম ব'লতে নিষেধ আছে।"

"আ'ম মরিতে গিয়াছিলাম, কে আমায় বাঁচাইল ?"

"যাঁহার গৃহে আপনি অবস্থান করিতেছেন, তিনিই আপনাকে জীবন দান করিয়াছেন।"

"কে সেই মহাপুরুষ, তাঁহাকে একবার দেখিতে পাই না ?"

"আপনি সুস্থ হইলে দেখিতে পাইবেন"

"আমি সুস্থ হইয়াছি—তাঁহাকে ডাকিয়া আন।

"হকিম্ নিষেধ করিয়াছেন। তাঁহার সহিত উপযুক্ত সময়ে আপনার সাক্ষাৎ হইবে।"

আবার সেই কৃষ্ণ-তারকাময় ইন্দীবর নেত্রযুগল মুদিত হইল। অতি-ক্লান্তিতে স'বতার তন্দ্রা আসিল। তন্দ্রার সঙ্গে স্বপ্ন আসিল। স্বপ্ন এক বিচিত্র রাজ্যের যবনিকা তুলিয়া দেখাইল—"এই দেখ, বারাণসীপ্রান্তে অবস্থিত সেই সন্ন্যাসী-আশ্রম। এখানে কত স্নেহ, কত মমতা, কত পবিত্রতা, কত শান্তি ছিল। এ স্থান ত্যাগ করিয়াই তোমার দুর্দ্দশা। এই দেখ, নবীন ব্রহ্মচারী সুদর্শন—এই দেখ, তোমার পালিত হরিণশিশু। এই দেখ, তোমার পুষ্পলতাময় বিচরণক্ষেত্র। সহসা তুমি কেন রাজ-রাণী হইতে গেলে ?" যবনিকা নড়িয়া গেল—সেই বিচিত্র স্বপ্ন কোথায় লুকাইল।

আবার নূতন রঙ্গ! সবিতা স্বপ্নে দেখিল—অম্বরের রাজপ্রাসাদে সে যেন সোনার সিংহাসনে বসিয়াছে। কত বাঁদী দাসী তাহার পদসেবা করিতেছে। কক্ষে কক্ষে কত সুগন্ধি দীপ জ্বলিতেছে। ভিত্তিগাত্রে কত সুন্দর সুবাসিত ফুলের মালা দুলিতেছে। আকাশে—পূর্ণচন্দ্র,

নীচে নীলমেঘ—তার নীচে শ্যামলপ্রকৃতি—তার নীচে—অম্বরের প্রস্তরময় রাজ-প্রাসাদ। রাজপ্রাসাদে রত্নময় সিংহাসনে বসিয়া রাজরাণী সবিতা। আর সবিতার চরণপ্রান্তে বসিয়া—অম্বরেশ্বর মানসিংহ! মানসিংহ—সবিতার সেই অশোকরাগলাঞ্ছিত চরণ দুখানি ধরিয়া বলিতেছেন—"মহিষী! আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।"

সবিতা অপ্রস্তুত হইয়া যেন বলিতে লাগিলেন—"মহারাজ! মহারাজ! দাসী আমি! হৃদয়েশ্বর তুমি—সর্ব্বস্ব আমার তুমি। আমি কি ও চরণের যোগ্য? তোমার কত আছে প্রভু! আমার আর কে আছে? তুমি সন্দেহ করিও না—সোহাগ কর। রোষ-কটাক্ষ করিও না,—কৃপাদৃষ্টি কর। আমায় রূঢ় কথা বলিও না—শিষ্ট-কথা বল। আমি ত রাজরাণী হইবার জন্য সৃষ্ট হই নাই প্রভু! তোমার সেবিকা হইবার জন্য বিধাতা আমায় পাঠাইয়াছেন।"

স্বপ্ন বড় মায়াবিনী। সে এ দৃশ্যের যবনিকা শীঘ্র সরাইয়া দিল। এবার যাহা দেখাইল—তাহা অতি ভীষণ। দেখিল—মহারাজের সম্মুখে সুদর্শন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। করযোড়ে তাহার জন্য সিংহাসনের একাংশ ভিক্ষা করিতেছে। মহারাজ মানসিংহ—কুটিলকটাক্ষে সুদর্শনের সে করুণ-ভিক্ষা উপেক্ষা করিলেন। তাহাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। সুদর্শন—চক্ষে করুণ-অশ্রু লইয়া, ধীরে ধীরে কোথায় চলিয়া গেল। আর সবিতা! ওহো সে দুঃখ অতি ভীষণ! রাজ্ঞী কমলকুমারী আসিয়া ঘৃণিতনেত্রে যেন সবিতাকে কত অপমান করিল,—কত লাঞ্ছনা করিল! অম্বরেশ্বর সিংহাসনে বসিয়া সবই দেখিলেন,—কিছুই বলিলেন না।

সবিতার বুকের উপর কে যেন গুরু-পাষাণের ভার আনিয়া চাপাইতেছে। সে আর সহ্য করিতে পারিল না,—চীৎকার করিয়া উঠিল।

বলিল,—"সুদর্শন! সুদর্শন! চলিয়া যাইও না,—আমায় সঙ্গে লইয়া যাও, পিতার কাছে পৌঁছাইয়া দাও।"

সবিতার স্বপ্ন সত্য হইল! সুদর্শন তাহার কাছে দাঁড়াইয়া যেন বলিতেছে,—"ভয় কি সবিতা! এই যে আমি। আমি তোমায় আশ্রমে পৌঁছাইয়া দিব।"

সবিতা চক্ষুরুন্মীলন করিল। দেখিল,—এক সুন্দরকান্তি যুবাপুরুষ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। তাহার কর্ণে বীরবৌলি,—গাত্রে বহুমূল্য পরিচ্ছদ, মাথায় সোনার কাজ-করা মণিখচিত উষ্ণীষ, আর কটীতটে কোষনিবদ্ধ কৃপাণ! সে বলিতেছে,—"ভয় কি সবিতা!"

সবিতা সে মুখ দেখিয়া,—তাহাকে যেন চিনিল। তাহার চক্ষে অশ্রু বহিল, তবু জিজ্ঞাসা করিল,—"কে তুমি—"

সেই বীরবেশী প্রবুদ্ধস্বরে বলিল,—"আমি সুদর্শন। সবিতা! আমায় চিনিতে পারিতেছ না?"

"হাঁ—তোমায় চিনিয়াছি। কিন্তু তোমার এ রাজবেশ কেন? তোমার সে গৈরিক, কমণ্ডলু কই?"

"সে সব চিরজন্মের মত বিসর্জ্জন করিয়াছি। তোমার সেই ব্রহ্মচারী সুদর্শন মরিয়াছে। এখন আমি শস্ত্র-ব্যবসায়ী ফৌজী। সম্রাট্ আকবরের সেনাপতি।"

"তুমি আবার কেন আমায় দেখা দিলে? আবার কেন আমায় সবিতা বলিয়া ডাকিলে? আমায় কেন এখানে আনিলে? তুমি কি জান না—আমি মহারাজ অম্বরেশ্বরের মহিষী?"

"জানি—সবিতা। তুমি হ্রদের জলে জীবন বিসর্জ্জন করিতে গিয়াছিলে, আমি দৈবযোগে তোমায় বাঁচাইয়াছি।"

"অন্যায় কাজ করিয়াছ! আমার আশ্রয় নাই—স্থান নাই, দাঁড়াইবার জায়গা নাই। আজ রাজরাণী হইয়া, পথের ভিখারিণী আমি।

প্রাণে দাবানলের জ্বালা—সেই জ্বালা জুড়াইতে গিয়াছিলাম। তুমি কেন বাধা দিলে? কেন শত্রুতা করিলে?"

সবিতা আর বলিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ। সে কাঁদিতে কাঁদিতে সকল কথাই শেষ সুদর্শনকে বলিল।

ফৈজী ক্রোধে ওষ্ঠাধর দংশন করিলেন। তিনি মর্ম্মজ্বালায় জ্বলিতে লাগিলেন,—ভাবিলেন, তাঁহার জন্য নিষ্কলঙ্কা সবিতার, সন্ন্যাসীর হৃদয়ের ধন সবিতার, এই নিদারুণ কষ্ট। ফৈজী মনে মনে এই অত্যাচারের প্রতিশোধ কল্পনা করিলেন। ধীরে ধীরে সবিতাকে বলিলেন, "যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। ফিরাইবার আর কোন উপায় নাই। আমিই সকল অনিষ্টের মূল। আমি ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিব। গভীর রাত্রে শিবিরের অবস্থা দেখা, আমার নিত্য কর্ত্তব্য। সে দিন এই কর্ত্তব্যের জন্য একটু দূরে গিয়া পড়িয়াছিলাম। আমি তোমায় আদতে চিনিতে পারি নাই। তবে বুঝিয়াছিলাম, হয় ত কেহ পদস্খলিত হইয়া হ্রদে ডুবিয়া গেল। আমি তৎক্ষণাৎ জলে পড়িয়া তোমায় তুলিলাম। একটা কথা—তুমি দিন কয়েক এখানে থাক। আমি যুবরাজ সেলিমের সহিত মিলিত হইবার জন্য এখানে অপেক্ষা করিতেছি। ইতিমধ্যে আমি সন্ন্যাসীর নিকট সংবাদ প্রেরণ করি। তিনি আসিয়া তোমায় লইয়া যাইবেন।"

সবিতা কথা কহিল না। আবার চক্ষু মুদিল। সুদর্শন কক্ষ ত্যাগ করিলেন। হিন্দু-পাচিকার দ্বারা সবিতার আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

দিন কাটিল—রাত্রি আসিল। গভীররাত্রে সবিতা—সংকল্প পরিবর্ত্তন করিল। ধীরে ধীরে মোগল-স্কন্ধাবার হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। কেহ দেখিল না—কেহ বাধা দিল না।

পরদিন প্রভাতে ফৈজী, সবিতার শিবিরত্যাগের কথা শুনিয়া

আশ্চর্য্য হইলেন না। তিনি সন্ন্যাসীকে সেই মুহূর্ত্তে সংবাদ প্রেরণ করিলেন।

সন্ন্যাসী নানাস্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বহুদিবসান্তে অনাহারখিন্না পথ-শ্রমক্লিষ্টা, মুমূর্ষ পালিতা-কন্যাকে একটী বৃক্ষতলে কুড়াইয়া পাইলেন। তাহাকে বুকে করিয়া নিজ কুটীরে লইয়া গেলেন।

সেখ ফৈজী ইচ্ছা করিয়া বাদসাহের নিকট যুদ্ধের ভার লইয়াছিলেন। তিনি শস্ত্র ও শাস্ত্র উভয় বিদ্যায় পারদর্শী। কাজেই বাদসাহ তাহাতে কোন আপত্তি করেন নাই। যুবরাজ সেলিম ও ফৈজী, এক যুক্ত-সেনা-দলের কর্ত্তৃত্বভার লইয়া চলিলেন।

সেলিম ও ফৈজী ভিন্ন ভিন্ন পথে অগ্রসর হইলেন। চারিদিক দিয়া শত্রুকে বেষ্টন করাই আকবর সাহের আদেশ ছিল। দায়ুদ খাঁ ও মানসিংহ ভিন্ন পথে দুইদিকে গেলেন। ফৈজী সপ্ত শত সৈন্য লইয়া সেলিমের পশ্চাতে থাকিয়া, এক পর্ব্বতের রন্ধ্র-পথ রক্ষা করিতে অগ্রসর হইলেন।

সৈন্যেরা অগ্রসর হইয়া বিঠল গ্রামের সন্নিহিত প্রশস্ত প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিয়াছে। সেই স্থানে দুই তিন দিন অবস্থান করিয়া, পার্ব্বত্য গুপ্ত পথগুলি দেখিয়া লওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য। এইখানে শিবির স্থাপ-নের পর, একদিন সন্ন্যাসী তাঁহার নিদর্শন অঙ্গুরীয় প্রেরণ করিয়া ফৈজীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সন্ন্যাসী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"বৎস! আমার সোণার সবিতা, তীব্র মর্ম্মজ্বালায়—সেই পাষণ্ডের অত্যাচারে—উন্মাদিনী হইয়াছে। আমার বোধ হয়, আর তাহার জ্ঞান ফিরিবে না। উন্মাদ অবস্থাতেই জীবন অবসান হইবে।"

এই ভয়ানক কথা শুনিয়া, ফৈজীর চিত্তজয় করা দিন দিন অসম্ভব হইয়া উঠিল। শত বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা, তিনি প্রতিমুহূর্ত্তে অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহারই দোষে সবিতার এ সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে।

যদি এ যুদ্ধে রক্ষা পান, তবে মানসিংহের এ অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে হইবে, এবং নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। সন্ন্যাসীর নিকট যে প্রতিশ্রুতি করিয়াছিলেন, তাহা ভঙ্গ না করিলে,—সবিতার সহিত আবার দেখা না করিলে,—আজ সে জগতের চক্ষে কলঙ্কিনী, নিরাশ্রয়া এবং রাজরাণী হইয়াও ভিখারিণী হইত না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

রাজস্থানের পর্ব্বতময় উপত্যকায়, কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। তাহাতে কোন পক্ষের নির্দ্দিষ্ট জয়পরাজয় মীমাংসিত হয় নাই। মহারাজ মানসিংহ শিবিরে বসিয়া সংগ্রামচিন্তায় নিমগ্ন। প্রতিহারী আসিয়া তাঁহার হাতে এক পত্র দিল।

মানসিংহ পত্র পড়িলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে বিস্ময়রেখা প্রকটিত হইল। শিবিরগাত্রবিলম্বিত তীক্ষ্ণধার অসির প্রতি একবার তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। আবার পরক্ষণেই তিনি কঠোর হাস্য করিয়া উঠিলেন। পত্রে লেখা ছিল—

"মহারাজ! আপনি বীর। আকবর সাহের এই আসমুদ্র হিন্দুস্থানের প্রধান সেনাপতি। এই পত্রপাঠ নির্দ্দিষ্ট-স্থানে সশস্ত্রে একাকী আসিবেন। না আসিলে বুঝিব, আপনি বীরধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতে চান।"

মানসিংহ একবার ভাবিলেন—হয় ত শত্রুর প্রলোভন। ছলনায় লইয়া গিয়া প্রাণবধ করিবে। আবার ভাবিলেন—রাজপুত কখনও এত নীচ হইতে পারে না, শত্রু হইলেও কখন এরূপ কুটিলতাময় পত্র লিখিতে পারে না। কিন্তু এই অদ্ভুত পত্রের লেখক কে? তিনি কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

রহস্যোদ্ঘাটন ইচ্ছায়, মানসিংহ সেই দিন গভীর রাত্রে সঙ্গীমাত্র

না লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানোদ্দেশে চলিলেন। এক ক্ষুদ্র পর্ব্বতপথে উঠিতে লাগিলেন। উপত্যকা পার হইয়াই সম্মুখে এক প্রস্তরময় ভগ্নমন্দির। এই স্থানে অপেক্ষা করিবার কথাই লেখা ছিল।

সেই নির্জ্জন বনপ্রদেশ দুইটী মশালের আলোকে পূর্ব্ব হইতেই উজ্জ্বলিত ছিল। সেই আলোতে পার্শ্ববর্ত্তী বিটপীরাজির ও পর্ব্বতগাত্রের প্রকৃত বর্ণ পরিলক্ষিত হইতেছিল। মানসিংহ দেখিলেন, এক গৈরিক-ধারী ব্রাহ্মণবেশী ব্যক্তি,অসি হস্তে সেই ভীষণ স্থানে অপেক্ষা করিতেছেন।

মানসিংহ গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"আপনিই কি আমায় নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছিলেন ?"

"হাঁ মহারাজ।"

"ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্র ছাড়িয়া কতদিন শস্ত্র ব্যবসায়ী হইয়াছেন ?"

"যে দিন হইতে ক্ষত্রিয়-বীরগণ মোগল বাদসাহের দাসত্ব আরম্ভ করিয়াছেন। যে দিন হইতে হিন্দুরাজারা নিরীহ অবলার উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেই দিন হইতেই ব্রাহ্মণ শস্ত্র-ব্যবসায়ী হইয়াছে।"

"সকল ক্ষত্রিয়রাজা সম্রাটের দাস হন নাই। কোন ক্ষত্রিয়-রাজাই জ্ঞানতঃ অবলাপীড়ন করেন নাই।"

"আপনি করিয়াছেন।"

"আমি ? অসম্ভব !"

"মহারাজের নূতন রাণীর কথা মনে পড়ে ? রাণী সবিতাসুন্দরী ?"

"হাঁ,—কিন্তু সে ত কলঙ্কিনী।"

"সে নিষ্কলঙ্কা, মহারাজ নিজে বিষম ভ্রমে পড়িয়াছেন। সে কলঙ্কিতা নয়, আপনার চক্ষুই কলঙ্কিত, আপনার চিত্তই কলুষিত।"

"ব্রাহ্মণ! মানসিংহকে এরূপ কঠোরবাক্য প্রয়োগের জন্য অন্য কেহ হইলে উপেক্ষিত হইত না। আপনি ব্রাহ্মণ—অবধ্য।"

"তাই ত বলিতেছিলাম,—মহারাজের চক্ষু প্রতারিত। আমি ব্রাহ্মণ নহি, তবু আমায় ব্রাহ্মণ বলিয়া ভাবিতেছেন। আপনার রজ্জুতে, সর্পভ্রম ঘটিয়াছে। আপনি অতি-পবিত্রাকে, দৈবের ছলনায় কলঙ্কিনী করিয়াছেন।"

"তুমি ব্রাহ্মণ নও,—তবে কে? আমায় এখানে আহ্বান করিবার উদ্দেশ্য কি?"

"মহারাজ! আজ আপনি যেমন আমার কথায় ও পরিচ্ছেদে প্রতারিত হইতেছেন,—আর একদিনও সেইরূপ হইয়াছিলেন। সে দিন যদি একটু অনুসন্ধান বা চিন্তা করিতেন, তাহা হইলে নির্দ্দোষী, নিষ্কলঙ্কা রাণীকে নিষ্ঠুরের ন্যায় বর্জ্জন করিতেন না।"

সেই ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ গৈরিকাচ্ছাদন খুলিয়া ফেলিলেন। কৃত্রিম জটা ও শ্মশ্রু বিদূরিত হইল। মানসিংহ সবিস্ময়ে দেখিলেন,—তাঁহার চিরপরিচিত সুহৃদ্ আবল্ ফায়েজ ফৈজী। মানসিংহ বড় গোলমালে পড়িলেন। ফৈজীর সহিত রাণীর কি সম্বন্ধ, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি ফৈজীর হস্তধারণ করিয়া বলিলেন,—"সখা, এ অদ্ভুত রহস্যের মর্ম্ম কি? তোমার সহিত রাণী সবিতার সম্বন্ধ কি?"

"রাণী সবিতা আমার ভগিনী, আমরা পবিত্র-সম্বন্ধে আবদ্ধ। ভগিনীর জন্য ভাই সবই করিতে পারে।"

ফৈজী, সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। বলিতে বলিতে তাঁহার বুক চোখের জলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

এবার অনুতাপ আসিয়া মানসিংহের হৃদয় বিদলিত করিতে লাগিল। সন্দেহের ভস্মাগ্নিতে আবার অনুরাগবহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। রাণীকে দেখিবার জন্য মানসিংহ অতি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। মানসিংহ আগ্রহের সহিত বলিলেন,—"ফায়েজ! দোস্ত্! রাণী কোথায়? আমার সবিতা কোথায়?"

ফৈজী বলিলেন,—"মহারাজ! আর তাঁহাকে পাইবেন না। তিনি এখন আর এ সংসারের নহেন। মহারাজ! তাঁহাকে দেখিয়া আসিতে পারেন—কিন্তু আপনার চক্ষে তিনি মৃতা।

মানসিংহ বলিলেন,—"পাই না পাই, একবার দেখিতে চাই। ফায়েজ! একবার তাঁহাকে দেখাও।"

*　　*　　*　　*　　*

মানসিংহ ও ফৈজী মশালহস্তে পর্ব্বতের উপত্যকা ভেদ করিয়া চলিলেন। সেই নির্জ্জন নিশায় অন্ধকারময় গুহাবক্ষ স্থানে স্থানে আলোকিত হইয়া উঠিল। সেই আলোক দেখিয়া দুই চারিটী পাখী পাখা ঝাড়িয়া উঠিল। মানসিংহ ও ফৈজী এক পর্ব্বতগাত্রস্থ গুহার দ্বারে উপস্থিত হইলেন।

সাঙ্কেতিক করাঘাতে দ্বার উন্মুক্ত হইল। ফেজী বলিলেন,—"মহারাজ আমার পশ্চাৎবর্ত্তী হউন, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে আপনাকে একটী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে। এই গুহাধিকারী সন্ন্যাসীর নিয়ম, অপরিচিতকে এইখানে আনিতে হইলে চক্ষু বাঁধিয়া আনিতে হইবে।"

মানসিংহ বড়ই অধৈর্য্য হইয়া পড়িতেছিলেন। এ প্রস্তাবে তাঁহার আপত্তি ঘটিল না।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর, উভয়েই এক গুহাদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মানসিংহের চক্ষের বন্ধন খুলিয়া দেওয়া হইল। তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন, গুহার মধ্যে পূজায় নিবিষ্টা নবীনাসন্ন্যাসিনীবেশে সবিতা।

তাঁহার ওষ্ঠে উচ্ছ্বসিত প্রেম-সম্ভাষণ বাধিয়া গেল। বুঝিলেন, তাঁহার কলুষিত প্রেমের ভাগিনী করিবার জন্য তাহাকে আহ্বান করিবার অধিকার আর তাঁহার নাই। যে অতুল প্রশান্তি, যে স্বর্গীয়-সুখের আভা তাহার কমনীয় মুখে দেখিলেন,—তাহাতে তাঁহার বাসনাপীড়িত-হৃদয় লজ্জিত হইয়া অবনত হইল।

মানসিংহ একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলেন,—সেই গুহার ভিত্তি অবলম্বন করিয়া একখানি চিত্রপট ঝুলিতেছে। সেই আলেখ্যখানির পদতলে স্তূপীকৃত নির্ম্মাল্য ও শুষ্ক মাল্যরাশি। চারিদিকে ধূপ দীপ জ্বলিতেছে। দেবপূজার যথাযথ আয়োজন, আবশ্যক সবই সেখানে। আর সেই প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে—আনতগ্রীবা সবিতা, নতজানু হইয়া ধ্যানমগ্না!

আ মরি! কি সুন্দর রূপ! মানসিংহ মনে মনে ভাবিলেন,—এক দিন ত এই সবিতা—অষ্টালঙ্কারে ভূষিতা, কৌষেয়পরিবৃতা হইয়া রূপজ্যোতিঃ উছলিত করিয়া, অম্বরের উজ্জ্বলিত প্রাসাদে আমায় প্রিয়সম্বোধন করিয়াছিল। আর আজ সেই সবিতা,—নিরলঙ্কারা, সামান্য গৈরিক-ভূষিতা হইয়াও তদপেক্ষা রূপবতী! ধন্য তোমায় বিধি!—এই রূপরাশির সমাবেশ করিতে তোমায় কতই না পরিশ্রম করিতে হইয়াছে!

মস্তকে অর্দ্ধাবগুণ্ঠন—তাহার পার্শ্ব দিয়া, সম্মুখ দিয়া কাল কাল চুলের রাশি—দুই রক্তিমগণ্ডের অর্দ্ধপথ আবৃত করিয়া পৃষ্ঠে পড়িয়াছে। যেন মুখবদ্ধ কৃষ্ণহস্তীশুণ্ড আসিয়া প্রস্ফুটিতা শারদীয়া নলিনীকে বেষ্টন করিয়াছে। সেই কৃষ্ণ-তারকা-মণ্ডিত নেত্রের স্থিরদৃষ্টি এক বিষয়ে সংন্যস্ত। সেই বিম্বাধরে যেন একটু মলিন হাসি লাগিয়া রহিয়াছে—সেই নিস্পন্দ দেহযষ্টির চারিধারে যেন রূপের তরঙ্গ খেলাইতেছে। যেন—রাজরাণী সবিতা অপেক্ষা সন্ন্যাসিনী সবিতা কতই সুন্দর, কতই প্রতিভাপূর্ণ, কতই মনোহারিণী হইয়াছে।

মানসিংহ মনে মনে ভাবিলেন, আজীবন পাষাণে বুক বাঁধিয়া অসিব্রত ধারণ করিয়াছি—এ মধুর প্রেমের মর্ম্ম বুঝিব কিরূপে? নিজের উপর বিশ্বাস করিতে পারি না,—এই সুরবালার উপর বিশ্বাস করিতে পারিব কেন? শত শত মহিষী-পরিবেষ্টিত হইয়া ইন্দ্রিয়লালসায় ব্যাকুলভাবে জীবন কাটাইয়াছি—এ পবিত্র স্বর্গীয়-প্রেম বুঝিব কিরূপে?

মানসিংহ আর একটু অগ্রসর হইলেন। সবিস্ময়ে দেখিলেন, তিনি সবিতাকে আদর ক'রিয়া একদিন অম্বরের প্রাসাদে যে আলেখ্য উপহার দিয়াছিলেন, এই পত্র-পুষ্পমালা-বেষ্টিত আলেখ্য তাঁহারই প্রতিকৃতি। পতি-প্রেম-নিরতা, একান্তানুরক্তা সবিতা তাঁহারই পূজায় নিমগ্না!

এবার মানসিংহের পাষাণ-বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া, চক্ষে জল আসিল। তাহার কৃতাপরাধের সীমা নাই—পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই—অকারণ সন্দেহে সাধ্বীর মর্ম্মপীড়াজনিত দীর্ঘনিশ্বাসে পরিত্রাণ নাই ভাবিয়া, তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল।

মানসিংহ কম্পিতস্বরে ডাকিলেন—"সবিতা ?"

সবিতা এতক্ষণ কিছুই জানিতে পারে নাই—পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল—তাহার ইষ্টদেবতা সম্মুখে।

সবিতা মনে মনে ভাবিল,—আমার স্বামী দেবতা অপেক্ষা দয়াবান্। দেবতার উপাসনায় ত দেবতা সহজে দেখা দেন না—কিন্তু স্বামী দেখা দিয়াছেন।

সবিতা সব ভুলিল। অতীতের অত কথা সে যেন সব ভুলিয়া গেল। মান অভিমান—অপমান—প্রত্যাখ্যান, অবিশ্বাস সবই ভুলিয়া গেল। সবিতা দেখিল,—তাহার হৃদয় মানসিংহময়—দেহ মানসিংহময়—সেই গুহা মানসিংহময়—মানসিংহ যেন অনন্ত-সুন্দর।

সবিতা উঠিয়া দাঁড়াইল, ধীরে ধীরে মানসিংহের সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিয়া প'ড়ল। অশ্রুপূর্ণনেত্রে বলিল,—"স্বামিন্! হৃদয়েশ্বর! আমার ইহকালের দেবতা, আমার সর্ব্বস্ব, দয়া করিয়া নিজে আসিয়াছ? এই দেখ, তোমার জন্য সিংহাসন পাতিয়াছি—স্বহস্তে পুষ্পচয়ন করিয়াছি—তুমি সুগন্ধ মাল্য ভালবাস বলিয়া কত কষ্টে মালা গাঁথিয়াছি—তোমার পাদপদ্মে দিয়া মনের শান্তিলাভ করিয়াছি। আমার বলিতে যাহা ছিল, তাহাও সব আগে দিয়াছি। প্রভু! আর আমার কি

আছে ?"—আর বলা হইল না। সেই ক্ষীণ গণ্ডে দরদরিত ধারা বহিল।

মানসিংহের সেই পাষাণে বাঁধা বুকটা যেন কে পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া দিল। তাহার কণ্ঠের মধ্যে যেন কে উত্তপ্ত লৌহশলাকা ভেদ করিয়া দিল—অনন্ত অনুতাপ-যাতনায় তাহার মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, তাহার পাপ অমার্জ্জনীয়—নিরপরাধী সবিতাকে ত্যাগ করিয়া তিনি মহা দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন। দেবতা ও মানুষ কেহই তাহাকে মার্জ্জনা করিবে না।

তিনি ধীরে ধীরে সবিতার পার্শ্বে বসিলেন, কিন্তু তাহার অঙ্গস্পর্শ করিতে সাহস হইল না। তিনি কাতরকণ্ঠে বলিলেন,—"সবিতা—সবিতা—আমায় মার্জ্জনা কর, কৃপা কর, সব ভুলিয়া যাও—আমার সঙ্গে আইস। আমি মহাপাপিষ্ঠ না হইলে, তোমার মত সাধ্বীকে পরিত্যাগ করিব কেন ?"

সবিতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"কি অপরাধ করিয়াছ তুমি প্রাণেশ্বর! তুমি শত শত লোকের সম্মুখে পদাঘাতে দূর করিয়া দিলেও—আমার প্রাণে এত ব্যথা লাগিত না। তোমার চরণে আঘাত লাগিয়াছে কি না, সেই ভাবনাই আমার প্রবল হইত। দাসী আমি—দাসীর কাছে প্রভুর অপরাধ অসম্ভব। সবই আমার অদৃষ্টের দোষ মহারাজ! তুমি ত আমায় রাজরাণী করিয়াছিলে—আমিই থাকিতে পারিলাম না। ও অনুরোধ আর করিও না! এ পাপমুখ সেই রাজ-পুরীতে আর দেখাইব না। কলঙ্ক—কলঙ্ক, মহারাজ চারিদিকে ঘোর কলঙ্ক!! আমার হৃদয় বড় দুর্ব্বল, অত সহিতে পারিব না।"

সবিতার মানসিক উত্তেজনা সহসা বাড়িয়া উঠিল। তাহার সর্ব্ব-শরীর কাঁপিতে লাগিল। সে সেই উপলমণ্ডিত গুহার মধ্যে শুইয়া পড়িল। তখন তাহার মাথা ঘুরিতেছে—সমস্ত বিরাট্-বিশ্ব ঘুরিতেছে।

মানসিংহ, সবিতাকে এতক্ষণ স্পর্শ করিতে সাহসী হন নাই। এখন তাহার সুন্দর দেহ কোলে লইয়া বসিলেন। সবিতার মুখে হাত বুলাইতে লাগিলেন,—সে স্পর্শে সবিতার প্রাণ আবার কাঁপিয়া উঠিল। আবার শরীরে বিদ্যুতের উত্তেজনা বহিল। মানসিংহ—কাতরভাবে সে বিশীর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"সবিতা! সবিতা! আমায় পরিত্যাগ করিও না। আমার সঙ্গে চল। কলঙ্ক আমিই তোমার শিরে দিয়াছি—আমিই স্বহস্তে মুছাইব। আমি সকল মহিষীকে পরিত্যাগ করিয়া—প্রকাশ্য-দরবারে অম্বরের সমস্ত প্রজা ডাকাইয়া—তোমায় রাজ্ঞী বলিয়া ঘোষণা করিব—তোমার নিকট মার্জ্জনা চাহিতেছি। অম্বরেশ্বর মানসিংহ, তোমার পাপিষ্ঠ স্বামী, আজ কাতরভাবে তোমায় এ অনুরোধ করিতেছে—তাহার অনুরোধ রাখ।"

সবিতা, মহারাজের চোখে জল দেখিয়া সহসা হাসিয়া উঠিল। বলিল, "হা! হা! অতবড় মহারাজ মানসিংহের চোখে জল! আকব্বর বাদসার প্রধান সেনাপতির চোখে জল! পাষাণের বুকে ফুটন্ত বারিধারা! বেশ—মহারাজ—বেশ। এতদিন তোমার এ সোহাগ কোথায় ছিল মহারাজ! যদি যাইতে হয়, রাজমহিষীর মত যাইব। দোলা আন, পাল্কী আন—ফৌজ আন—বাজনা বাজাও—আমায় পাশে বসাইয়া রাণীর মত করিয়া লইয়া যাও। কেমন মহারাজ?" সবিতা আবার হাসিয়া উঠিল।

ফৈজির নিকট মানসিংহ পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন, সবিতা তখন উন্মাদ-ব্যাধি-পীড়িতা। প্রথমে তাঁহাকে দেখিয়া সবিতার একটু চিত্ত-স্থৈর্য্য ঘটিয়াছিল। আবার অধিক উত্তেজনায়, রোগ পুনর্ব্বার দেখা দিয়াছে। সবিতার শেষ কথাগুলি—উন্মাদের প্রলাপ! মানসিংহ শিহরিয়া উঠিলেন।

তাহার কোলে সবিতা নিস্পন্দভাবে পড়িয়া আছে। বোধ হইল

যেন, দুষ্মন্তের কোলে শকুন্তলা শুইয়া—যেন লঙ্কাবিজয়ী রামচন্দ্রের কোলে, অশোক-কানন হইতে আসন্ন-উদ্ধৃতা সীতা শুইয়াছেন। সে অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল যেন, কঠোরতার কোলে করুণা শুইয়াছে, বিরাগের কোলে প্রেম শুইয়াছে—শ্মশানের বুকে সোণার ফুল ফুটিয়াছে। তুষারস্তূপে স্বর্ণপদ্ম ফুটিয়াছে।

মানসিংহ প্রেমভরে ডাকিলেন,—"সবিতা! সবিতা!" সবিতা কথা কহিল না। কহিবার শক্তিও তাহার নাই। মূর্চ্ছা আসিয়া তাহার সেই ক্ষীণ-দেহ অধিকার করিয়াছে।

মানসিংহ মহা বিপদে পড়িয়া ডাকিলেন,—"জল—জল—কে কোথায় আছ? এক বিন্দু বারি দাও—"

কেহ আসিল না,—গুহাতে পৌঁছিয়া প্রতিধ্বনি উত্তর করিল,—"জল—জল—কে কোথায় আছ—এক বিন্দু বারি দাও।"

সহসা সন্ন্যাসী সেই গুহামধ্যে দেখা দিলেন। তিনি সবিতার ঔষধের জন্য পর্ব্বতে এক ভেষজ-গুল্মের অনুসন্ধানে গিয়াছিলেন। আসিয়া দেখিলেন—মানসিংহের কোলে—মূর্চ্ছিতা সবিতা। সন্ন্যাসী আরক্তলোচনে বলিলেন,—"পাপিষ্ঠ! নিজের কীর্ত্তি দেখ। কে তোমায় এখানে আসিতে বলিল?"

মানসিংহ নীরবে এ তিরস্কার,—এ ভ্রূকুটী সহ্য করিলেন। সন্ন্যাসীর নিকট সহস্র অপরাধে অপরাধী। সেই অপরাধের ভারে তাঁহার মহত্ত্ব, গুরুত্ব, সেনাপতিত্ব, রাজত্ব সবই ডুবিয়া গিয়াছে। মানসিংহ লজ্জিতভাবে উত্তর করিলেন,—"প্রভু! আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে আসিয়াছি। এখন একটু জল দিন,—সবিতা মূর্চ্ছিতা।"

সন্ন্যাসী, মানসিংহকে দেখিয়াই ক্রোধমত্ত হইয়াছিলেন। সবিতা মূর্চ্ছিতা শুনিয়া বারিপাত্র আনিয়া দিলেন। এক উত্তেজক-লতার

কোমল পত্র পেষিত করিয়া, তাহার রস সবিতার মুখবিবরে নিসেক করিলেন। নিজে সবিতাকে কোলে লইয়া বসিলেন।

সন্ন্যাসী তিরস্কারপূর্ণস্বরে বলিলেন,—মানসিংহ! তুমি মহাপাপিষ্ঠ! অত বড় অম্বররাজ্যের অধিপতি তুমি, অত বড় দিল্লীশ্বরের সেনাপতি তুমি—তোমার কৃপাকটাক্ষে কত রাজ্য রক্ষা পায়, কত রাজ্য নষ্ট হয়—কিন্তু তুমি একটা সামান্য বিচার করিতে পারিলে না! অকারণে—সাধ্বী ধর্ম্ম-পত্নীকে পরিত্যাগ করিলে!"

মানসিংহ লজ্জায় মরিয়া গেলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন, "প্রভু! পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি, বলিয়া দিন্। যাহা বলিবেন, তাহাই করিব। সবিতাকে পূর্ব্ববৎ করিয়া দিন্।"

একদিন সুদর্শনবেশী ফৈজিও এই প্রশ্ন করিয়াছিল। সন্ন্যাসী বলিলেন,—"জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত দুই প্রকার পাপ। আমি বুঝিয়াছি, মহারাজ, তোমার চিত্ত অনুতাপে আকুলিত। তুমি অজ্ঞাত-পাপ করিয়াছ। অজ্ঞাত-পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে। তুমি সবিতাকে ধর্ম্ম-পত্নীরূপে পুনরায় গ্রহণ কর। রামচন্দ্র যেরূপ প্রকাশ্যসভায় সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে সীতাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন,—তুমিও তাহাই কর।"

মানসিংহ বিনা সংকোচে বলিলেন,—"তাহাই করিব। কিন্তু সবিতা ত জ্ঞানশূন্যা,—উন্মাদিনী—সে আমার সঙ্গে যাইবে কি?"

সন্ন্যাসী চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"সে ভার আমার। আমি একবার যেমন তাহাকে দিয়া আসিয়াছিলাম—আর একবার তাই করিব। পরশ্ব উত্তম দিন আছে। অম্বর এখান হইতে দূরের পথ নহে। তুমি আজই চলিয়া গিয়া যান-বাহনের বন্দোবস্ত কর। রাজতোরণসমূহ পুষ্পমাল্যে বিভূষিত কর,—সবিতা, রাজরাণীর ন্যায় নগরে প্রবেশ করিবে।—যে ঔষধ দিয়াছি, তাহাতেই সবিতার চেতনা ফিরিবে!"

মানসিংহ—তথা স্বীকৃত হইয়া—সন্ন্যাসীর চরণবন্দনা করিয়া বিদায়

লইলেন। গুহাদ্বারে আসিয়া উপত্যকার পথ ধরিলেন। দেখিলেন,—ফৈজি বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া কি চিন্তা করিতেছেন।

উভয়েই নির্ব্বাক্। সেই প্রস্তরমণ্ডিত উপত্যকা দুইজনেই নীরবে অতিবাহিত করিলেন। সঙ্কীর্ণ পথ পার হইয়াই একটু প্রশস্ত ক্ষেত্র। এইখানে ফৈজি পুনরায় মানসিংহের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন।

মানসিংহ, ফৈজির উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "প্রিয়মিত্র! এখানে সহসা পথরোধ করিলে কেন?"

ফৈজী রুষ্টস্বরে বলিলেন,—"মহারাজ! আপনার সহিত আমার সম্পর্ক এখনও ফুরায় নাই। সবিতা উন্মাদ-রোগে আক্রান্তা,—তাহার জীবন সঙ্কটাপন্ন। এজন্য আমিই প্রথম অপরাধী। দ্বিতীয়—অপরাধী আপনি। আজ দুইজনে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। আমার সহিত আপনাকে অসিযুদ্ধ করিতে হইবে। ফৈজি, তীক্ষ্ণধার অসি নিষ্কাশিত করিলেন।

মানসিংহ সবিস্ময়ে ফৈজির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন,—সে মুখে রহস্যের নামগন্ধ নাই। মানসিংহ বলিলেন,—"আমি বন্ধুর অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিতে এখনও শিখি নাই। আকবর সাহের সেনাপতির উপর অস্ত্রাঘাত করিতে পারিব না। আমার নিজের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা আমি নিজে করিয়াছি।"

মানসিংহ কোষ-নিষ্কাশিত অসি—ঘৃণার সহিত দূরে ফেলিয়া দিলেন। বলিলেন,—"বীরবর! ইচ্ছা হয় নিরস্ত্রের সহিত যুদ্ধ কর। মৃত্যু এখন আমি বড়ই সুখের জ্ঞান করিব। কিন্তু আমার প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থাটা আগে শুনিলে না কেন?"

ফৈজী রুষ্টস্বরে বলিলেন,—"ক্ষত্রিয়রাজ! এ জগতে আপনার এমন কি প্রায়শ্চিত্ত আছে, যাহা আপনার কঠোর পাপের উপযুক্ত শাস্তি।"

মানসিংহ, ফৈজীর নিকট—গুহামধ্যস্থ সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন।

কথাটা শুনিয়া—কৈজি সেই ভীষণ আত্মগ্লানির মধ্যেও আংশিক সন্তোষলাভ করিয়া, অন্যপথে চলিয়া গেলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

"পিতা—"

"কেন মা—"

"আমি কোথায়, স্বর্গে না নরকে?"

"ওকি কথা মা—তুমি আমার স্নেহময় কোলে। এখন কেমন আছ মা আমার?"

"বাবা—বড় যাতনা। স্নেহের কোলে মরিতেছি,—এর চেয়ে সুখ নাই।"

"ছিঃ সবিতা! ওকথা বলিও না,—আমার ভাঙ্গা বুক আরও কেন ভাঙ্গিয়া দাও মা?"

"বাবা, এ পাষাণময় গুহায়—এত অন্ধকারে মরিতে পারিব না। আমার অসুখ সারিবে না। আপনি মাতৃ-ক্রোড় হইতে লইয়া আমায় মানুষ করিয়াছেন। আপনার কোলেই মরিব। কিন্তু বাবা—"

"কিন্তু—কি মা?"

"একবার দেখিতে সাধ যায়। জন্মের মত—"

সবিতা আর বলিতে পারিল না। চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। বিশীর্ণগণ্ডে ধারা বহিতে লাগিল। সন্ন্যাসীর হৃদয়ও ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে অশ্রুধারা—সে করুণ-কথা—বড় মর্ম্মভেদী।

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"মা—সতী-লক্ষ্মী, আমার কথা মিথ্যা হইবে না—অরবিন্দকে অম্বরে পাঠাইয়াছি—সে এখনই ফিরিয়া আসিবে।"

সবিতা বলিল, "ততক্ষণ কি থাকিব? কিন্তু বড় অন্ধকার চিরকাল মুক্ত-কুটীরে, মুক্ত-উপত্যকায় অনবচ্ছিন্ন আলোকে বাড়িয়াছি,—এত

অন্ধকারে মরিতে পারিব না। এখান হইতে স্বর্গ কতদূর! জানি না—এখন বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু স্বর্গের উজ্জ্বলিত তোরণ, দেববালায় আলোকিত রত্নকক্ষ, মৃদু দুন্দুভি-নিনাদ, মঙ্গল শঙ্খধ্বনি, পারিজাতের গন্ধ—সবই যেন কে আমার বিকল ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে আনিয়াছে।

সন্ন্যাসী—বালকের মত অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। রুদ্ধস্বরে কাতরকণ্ঠে বলিলেন,—"মা! আজ রাজার আসিবার কথা আছে—তুমি কাতর হইও না। আবার আমি—শকুন্তলার ন্যায় তোমায় রাজ-পুরীতে রাখিয়া আসিব। তুমি আবার রাজরাণী হইবে।"

সবিতা—মৃদুস্বরে বলিল,—"রাণীগিরির সখ মিটিয়াছে। এ জগতে রাণীগিরি আর করিতে চাহি না পিতা! সন্ন্যাসীর কন্যা, দুঃখিনীর কন্যা, রাণী হইয়াও হইতে পারিলাম কই? দেবলোকে যদি যাই—তবে যেন চিরজীবন তাঁর সেবা করিতে পাই—এই আশীর্ব্বাদ করুন।"

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"সংসারসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়াও, তোমার মায়ায় আবার সংসার পাতিয়াছি। আমার মা নাই, বাপ নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই—কন্যা নাই—সর্ব্বস্ব আমার তুমি। আমার জপ তপ গিয়াছে—শাস্ত্রপাঠ গিয়াছে—চিন্তা গিয়াছে, শক্তি গিয়াছে, সাধনা গিয়াছে, আছ কেবল তুমি। তুমি ছাড়িয়া গেলে—আমার গৈরিক, দণ্ড, কমণ্ডলু সব নদীর জলে ভাসিবে! আর অমন কথা বলিও না সবিতা!"

সবিতা বলিল,—"না বাবা! আর বলিব না। বড় প্রাণের কষ্ট—তাই বলিয়াছি। এই গুহার চারিধারে আঁধার, আমার হৃদয়ে আঁধার, আমার প্রাণের মধ্য-কেন্দ্রে আঁধার, আমার চোখের সম্মুখে অন্ধকার—এত অন্ধকারে প্রাণ কেমন করিয়া উঠিতেছে।"

প্রভাতে সবিতা আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল। কাতরভাবে বলিল, "পিতা! আপনার আশীর্ব্বাদ ত পূর্ণ হইল না,—আর আমার বিলম্ব নাই। ঐ উপরে অনন্ত নীলাকাশের মধ্যে এক জ্যোতির্ম্ময়ী-মূর্ত্তি আমায় অঙ্গুলিসঙ্কেতে ডাকিতেছে। বলিতেছে,—আয়, এখানে আয় শান্তি পাইবি।"

সন্ন্যাসী বুঝিলেন, সবিতার শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত। তিনি আরও কাতর হইয়া উঠিলেন। শিষ্য অরবিন্দকে তিনি বহুপূর্ব্বে মানসিংহের নিকট পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। কিন্তু সে এখনও ফিরিল না কেন?

সহসা বাহিরে অগণ্য লোকের কোলাহল শ্রুত হইল। বাহিরে অশ্বের হ্রেষারব,—জনকোলাহল শুনা যাইতে লাগিল। সন্ন্যাসী চমকিয়া উঠিলেন,—সবিতাও সে শব্দ শুনিতে পাইল—বলিল,—"পিতা! পিতা! অই দেখুন, আমায় লইতে আসিয়াছে।"

ভীষণ স্বর,—ভয়ানক তৃষ্ণা, গাত্রদাহ,—সবিতা বলিল,—"জল দাও—বাবা।"

সন্ন্যাসী জলপাত্র সবিতার মুখে ধরিলেন। প্রাণের জ্বালা যেন একটু থামিল। এমন সময়ে কে একজন দ্বার ঠেলিয়া, সেই গুহাকক্ষে প্রবেশ করিল।

সন্ন্যাসী দেখিলেন মানসিংহ। বলিলেন,—"বৎস! আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে। কিন্তু সব বুঝি ফুরাইয়া যায়। সবিতাকে আর বুঝি রাখিতে পারিলাম না।"

মানসিংহ কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন। তিনি যে অসংখ্য যান-বাহন অশ্বপদাতী লইয়া সবিতাকে রাণীর মত লইয়া যাইতে স্বয়ং আসিয়াছেন। অম্বরের প্রত্যেক গৃহস্থ, সম্ভ্রান্ত, ধনী, প্রজাকে গৃহদ্বার মাঙ্গল্য পত্রপুষ্পে, ধ্বজপতাকায় ভূষিত করিবার আদেশ করিয়া আসিয়াছেন। কার জন্য তবে এ আয়োজন? সবিতা ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেলে, তিনি কি লইয়া ফিরিবেন? তাঁহার চক্ষে ধারা বহিল।

মানসিংহ তবুও কাতরকণ্ঠে ডাকিলেন,—"সবিতা! সবিতা, তোমায় লইতে আসিয়াছি।"

সবিতার জ্ঞান তখন শেষসীমায়! সে অবস্থাতেও সে চিনিতে পারিল। বলিল,—"স্বামিন্! হৃদয়েশ্বর, ইষ্ট-দেবতা, অনন্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া পরলোকে চলিলাম। ইহলোকে বড় জ্বালা। তোমার হইতে পারিলাম না, বড় ক্ষোভ। পদধূলি দাও,—আশীর্ব্বাদ কর, জন্মে জন্মে যেন তোমায় পাই—"আর বলিতে হইল না। দীপ চিরদিনের জন্য

নিভিবার পূর্ব্বে একবার উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। সুতরাং শীতল হস্ত,—সবিতার ইহলোকের চিহ্ন লোপ করিল। স্বামীপদপ্রান্তে মাথা রাখিয়া, সাধ্বী হাসিতে হাসিতে,—দেবলোকে চলিয়া গেলেন।

আর মানসিংহ ও সন্ন্যাসী,—উভয়েই সেই গুহাকক্ষে দাঁড়াইয়া স্পন্দহীন-নেত্রে সেই সদ্যোমৃত দেহের দিকে উদাস দৃষ্টিনক্ষেপ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। তাঁহাদের চক্ষে কিছুমাত্র অশ্রু নাই।

কে বলিল সবিতা মরিয়াছে? সন্ন্যাসী ও মানসিংহ দেখিলেন, সেই মরা-মুখে তখনও যেন কত হাসি উছলিয়া উঠিতেছে।

*　　*　　*　　*　　*

মানসিংহ পূর্ব্বসংকল্প-ত্যাগ করিলেন না। সবিতার সেই বিগতপ্রাণ তুষার-শীতল দেহ তিনি স্বয়ং বহন করিয়া, রৌপ্যময় মখমলমণ্ডিত শিবিকায় উঠাইলেন। জীবিত যাহাকে স্পর্শ করিতে তাঁহার সাহস হয় নাই, আজ মরণে তাহাকে বুকে লইয়া শিবিকায় উঠিলেন। অশ্বারোহীর দল অগ্রে, মধ্যে পদাতি,—তৎপরে শিবিকা—আবার পশ্চাতে অশ্বসাদী ও পদাতি। রাজরাণীর ন্যায় সবিতার মৃতদেহ অম্বরে পৌঁছিল।

সেই বিচিত্রবর্ণবহুল পতাকাশোভিত—পুষ্পতোরণময় রাজপথে অগণ্য জনতা। অলিন্দে, গবাক্ষে—অসংখ্য কুলনারী। তাহারা মঙ্গলধ্বনি করিবার জন্য শঙ্খ হস্তে লইয়া দাঁড়াইয়া। মানসিংহের আদেশে শঙ্খধ্বনি হইল না'—তবে সকলে পুষ্পবৃষ্টি করিল।

রাজপ্রাসাদের ভগ্নতোরণের মধ্য দিয়া বহুমূল্য শিবিকা অম্বরের পথে গেল। নাগরিকেরা আশ্চর্য্য হইয়া কোন রহস্যোদ্ভেদ করিতে পারিল না।

শিবিকা এক রত্নময় কক্ষের দালানে নামিল। বাহকেরা চলিয়া গেল। পুরাঙ্গনারা সুবর্ণপাত্রে মাঙ্গল্যশঙ্খ লইয়া—সুগন্ধি পুষ্পমাল্য, ধান ও দূর্ব্বা লইয়া দাঁড়াইয়া। সর্ব্বাগ্রে মহারাণী কমলকুমারী। রাজাজ্ঞায় অন্তঃপুরে শঙ্খধ্বনি হইল না। মঙ্গলমাল্য বর্ষণ হইল না।

মানসিংহের চক্ষে অশ্রুধারা, মুখ শুষ্ক, মলিন—যেন শবের ন্যায়। মহারাণী কমলকুমারী সে মুখ দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! এ শুভ দিনে চোখে জল কেন?"

মানসিংহ,—উন্মাদের ন্যায় বক্রদৃষ্টি করিয়া,—সেই শিবিকার রক্তবস্ত্র উন্মোচন করিলেন। মহারাণী ভয়ে শিহরিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। অনেক পুরাঙ্গনা চীৎকার করিয়া উঠিল। রাজ্ঞী কমলকুমারী বলিলেন,—"একি সর্ব্বনাশ মহারাজ!

মানসিংহ উন্মাদের ন্যায় বিকৃতহাস্যে বলিলেন,—"আমারই কীর্ত্তি কমলকুমারি! অম্বরের নূতন রাণী আসিয়াছেন, তোমরা নতজানু হইয়া সম্মান কর।"

কমলকুমারী আবার শিবিকাশায়িতা গতপ্রাণা সবিতার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহাতে তখনও যেন কত জ্যোতিঃ উছলিয়া পড়িতেছে। যেন তখনও সে মুখ শান্তিমাখা, প্রেমমাখা, স্নেহমাখা, জ্যোতিমাখা, সরলতামাখা। যার এ সুন্দর মুখ, সে যেন হাসিতে হাসিতে পৃথিবী ছাড়িয়া দেবলোকে গিয়াছে। রাণী কমলকুমারী অশ্রুমোচন করিতে করিতে সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

* * *

বিষাদ আসিয়া আনন্দের আসন অধিকার করিল। চিরবিরহ আসিয়া প্রেমকে সিংহাসনচ্যুত করিল। বিরাগ আসিয়া আকাঙ্ক্ষাকে তাড়াইল। দানবী আসিয়া দেবীকে দূরীভূত করিল। আশা ডুবিল,—প্রেমজ্যোতিঃ নিভিল,—শান্তি চলিয়া গেল,—সুখ রাজ্য-ছাড়া হইল,—নন্দনে শ্মশান দেখা দিল। মানসিংহ,—সবিতার পবিত্র চিতাভস্ম এক রত্নপাত্রে রাখিয়া, অম্বরের রাজপ্রাসাদে এক হিরণ্য-মন্দির স্থাপন করিলেন। তাহার মধ্যে সবিতার হিরণ্ময়ী প্রতিমা স্থাপিত হইল। বহুদিন ধরিয়া সেই হিরণ্য-মন্দিরের, হিরণ্ময়ী সবিতার সম্মুখে মানসিংহ,—লক্ষ্যহীন—সুখহীন উদাসজীবন লইয়া অশ্রুপাত করিয়াছিলেন।

এখনও অম্বরের প্রাচীন রাজপ্রাসাদে লোকে এই হিরণ্য-মন্দিরের স্থান দেখাইয়া দেয়। মন্দির লোপ হইয়াছে,—সে প্রতিমা কোথায় গিয়াছে। আছে কেবল অশ্রুময় অক্ষরে স্মৃতির করুণ-কাহিনী।

পান্না-মহল

প্রথম পরিচ্ছেদ

"রক্ষা কর! রক্ষা কর!"

রমণীর আর্ত্ত-কণ্ঠস্বর সহসা অজয়গড়ের উপত্যকায় ধ্বনিত হইল। পর্ব্বতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, কন্দরে কন্দরে সেই বিলাপস্বর প্রতিধ্বনিত হইল।

উপত্যকা-পথে, কিছু দূরে, জনৈক শ্রান্ত, তৃষ্ণার্ত্ত সৈনিকপুরুষ নির্ঝরের পার্শ্বে বসিয়া অঞ্জলি পূরিয়া জলপান করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। তিনি দীর্ঘপথ-ভ্রমণে ক্লান্ত, তাঁহার মুখমণ্ডলে শুষ্ক স্বেদ-চিহ্ন, কণ্ঠ ও তালু শুষ্ক,—অনেক খুঁজিয়া খুঁজিয়া এক নির্ঝরিণীর সন্ধান পাইয়াছিলেন। বিপন্ন রমণীর কাতরকণ্ঠধ্বনি উপত্যকা মথিত করিয়া, তাঁহার শ্রবণে প্রবেশ করিল। তাঁহার আর তৃষ্ণা নিবারণ করা হইল না। তিনি অঞ্জলিপূর্ণজল তখনই ফেলিয়া দিলেন।

নিকটেই তাঁহার অশ্ব, শুষ্ক-বৃক্ষশাখায় বল্গালগ্ন ছিল। অশ্বকে সম্বোধন করিয়া সৈনিক-পুরুষ স্নেহের স্বরে কহিলেন, "বিজয়! স্থির হইয়া থাক।"

কাতর-কণ্ঠধ্বনি লক্ষ্য করিয়া যুবক বেগে ধাবমান হইলেন। পার্ব্বত্য-পথ বড় বন্ধুর। ঘুরিয়া ফিরিয়া যাইতে একটু বিলম্ব হইল। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এক পরমা-সুন্দরী যুবতী বৃক্ষশাখায় বদ্ধ রহিয়াছেন। তাঁহার সম্মুখে রক্তচক্ষু পিশাচাকৃতি এক পুরুষ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহাকে দেখিলে নরকের দ্বারপাল বলিয়া মনে হয়। নিকটে এক চূর্ণশিবিকা।

যোদ্ধৃপুরুষ কোষ হইতে অসি নিষ্কাশিত করিয়া তাঁহার বিপরীত

দিক দিয়া সেই নরাধমের স্কন্ধে আঘাত করিলেন। রোষগম্ভীর-স্বরে কহিলেন,—"কে তুই ?"

সেই দুরাচার সভয়ে উত্তর করিল,—"মার্জ্জনা করুন। আমি আজ্ঞাবাহী ভৃত্য। আমার অপরাধ নাই।"

"তোর প্রভু কোথায় ?"

"তিনি বাহকের সন্ধানে গিয়াছেন।"

"এ চূর্ণ-শিবিকা কার ? বাহক কোথায় ?"

"বাহকেরা প্রাণভয়ে পলাইয়াছে। শিবিকা এই যুবতীর। দেব-দর্শন করিয়া, ইঁহারা এই পথে ফিরিতেছিলেন। আমার প্রভু, বাহক-দের মারিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন।"

"তুই রাজপুত ?"

"হাঁ,—আমি চন্দাবৎ।"

"আর তোর সেই নৃশংস প্রভু ?"

"তিনিও চন্দাবৎ।"

"চন্দাবৎগুলা রাজপুতের কলঙ্ক। তুই এ রমণীর পরিচয় জানিস্ ?"

"না—"

যোদ্ধৃপুরুষ তরবারির শাণিতভাগ তাহার স্কন্ধদেশে বসাইয়া দিয়া বলিলেন,—"সত্য বল্,—কুকুর। নচেৎ"—

"একলিঙ্গের নাম লইয়া বলিতেছি,—কিছুই জানি না।"

"এই রমণীকে বন্ধন করিল কে ?"

"তিনিই করিয়াছেন।"

যুবক সৈনিক, তাহার স্কন্ধদেশ হইতে তরবারি উঠাইয়া লইয়া বলি-লেন,—"পলাইবার চেষ্টা করিলে তোর মৃত্যু নিশ্চিত। যতক্ষণ না আমার কার্য্য শেষ হয়—স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাক্।"

যুবক ক্ষিপ্রহস্তে সেই বিপন্না রমণীর বন্ধন-মোচন করিলেন।

দস্যু-নিগৃহীতা রমণী ভয়ে শরপত্রের ন্যায় কাঁপিতেছিলেন। যুবক অভয় দিয়া বলিলেন,—"আপনি নিরাপদ হইয়াছেন। পরিচয় দিন্—রাখিয়া আসিতেছি। জ্যোতিঃসিংহ, আকবর বাদসাহের সেনানী। মোগলের নববিজিত রাজপুত-রাজ্যের প্রধান সৈনিক। তাহাকে আপনি বিশ্বাস করিতে পারেন।"

রমণী সহসা চমকিয়া উঠিলেন। জ্যোতিঃসিংহ! জ্যোতিঃসিংহ! ইনিই কি সেই জ্যোতিঃসিংহ? তাঁহার হৃদয়, ভয়ের পরিবর্ত্তে আনন্দের ক্রীড়াভূমি হইয়া উঠিল। অপরকে পরিচয় দেওয়া যাইতে পারিত, কিন্তু ইঁহাকে পরিচয় দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়,—ভাবিয়া বলিলেন, "বীর-পুরুষ! আপনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ! আপনি ধর্ম্ম-রক্ষা করিয়াছেন, জীবন-রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু পরিচয়ে বাধা আছে। আমায় এই পর্ব্বত-পথের বাহির করিয়া দিন্। নিকটেই গ্রাম আছে, শিবিকা পাইব।"

"তাহাই হউক। কিন্তু আপনি একাকিনী। আবার নূতন বিপদ্ ঘটিতে পারে।"

রমণী হাস্যমুখে বলিলেন,—"বাদসাহের নবীন সেনানী দুর্ব্বলহস্তে তরবারি ধারণ করেন না, তাহাও ত জানি।"

যুবক, এতক্ষণ রমণীর অতুল সৌন্দর্য্যরাশিতে আত্মহারা হইয়া তাঁহার কথা শুনিতেছিলেন। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন,—সেই দুর্বৃত্ত নিঃশব্দে সরিয়া পড়িয়াছে। তিনি মহা-বিপদে পড়িলেন। পথ-ঘাট জানা নাই, কি করিয়া উপত্যকা হইতে বাহির হইবেন?

রমণী, বীণাবিনিন্দিত স্বরে সলজ্জভাবে কহিলেন,—ভাবিতেছেন কি কুমার! চলুন, আমরা শীঘ্র বাহির হইয়া যাই। পাপিষ্ঠেরা দলে অধিকসংখ্যক, আবার অত্যাচার করিতে পারে।"

কি মধুর স্বর? কে যেন সুর-বাঁধা বীণায় ঝঙ্কার তুলিয়া দিল। আহা কি সুন্দর রূপ! প্রভাতকমলবৎ নিষ্কলঙ্ক সেই মুখ মন্মথের তীব্র শরময়

কটাক্ষের ক্রীড়াক্ষেত্র, আকর্ণবিশ্রান্ত চঞ্চল সেই চক্ষু! কি সুন্দর আবেণী সম্বদ্ধ-ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাশি! সুগোল, সুন্দর, সুডৌল বাহুযুগ, নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব্ব দেহযষ্টি! দেখিলে চক্ষের পলক পড়ে না। একবার দেখিলে আবার দেখিতে ইচ্ছা হয়। জন্ম জন্ম দেখিয়া সাধ মিটে না।

পাঠক! বাসন্তী-সমীরচুম্বিত, অর্দ্ধস্ফুটন্ত গোলাপের সৌন্দর্য্য দেখিয়াছ কি? হেমন্তের শিশির-স্নাত সেফালিকার মনোরম সৌন্দর্য্য দেখিয়াছ কি? বর্ষাবিধৌত চম্পকের গৌরকান্তির ছটা মনোযোগের সহিত দেখিয়াছ কি? কৃষ্ণমেঘপূর্ণ বিস্তৃত আকাশে, সৌদামিনীর তীব্র রূপ-জ্যোতিঃ কখনও দেখিয়াছ কি? এ সব দেখিয়া তোমার মন মোহিত না হইতে পারে,—কিন্তু এই রাজপুত-কন্যাকে দেখিলে বিধাতার নির্জ্জনসৃষ্ট সৌন্দর্য্য—মাধুরীতে মুগ্ধ হইয়া তোমায় উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হইতেই হইবে।

জানি না,—সেই যুবক-সৈনিক, এই অসূর্য্যম্পশ্যা মনোমোহিনীর স্থিরোজ্জ্বল কটাক্ষের অব্যর্থসন্ধানে পড়িয়াছিলেন কি না? কিন্তু নিশ্চয় বলিতে পারি, যোদ্ধৃপুরুষের প্রেমোচ্ছায়াবিবর্জ্জিত হৃদয় কি জানি কেন, দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার মুখে, অত ক্লান্তির সময়েও একটা উত্তেজনা দেখা দিয়াছিল। একটু পূর্ব্বে তিনি নিঃসঙ্কোচভাবে এই রমণীর সহিত বাক্যালাপ করিয়াছিলেন, এখন যেন সকল কথাতেই একটা সঙ্কোচ-বোধ হইতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে,—এই ভাবিয়া তাঁহার মনটা বড় চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল! যে কর্ত্তব্যপালন জন্য তিনি এই বিপদসঙ্কুল পার্ব্বত্য-পথে একাকী প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেটা যেন একটু শিথিল হইয়া পড়িতেছিল।

সেই যোদ্ধৃপুরুষ দেখিলেন, অন্ধকারের কালচ্ছায়া ক্রমশঃ উপর হইতে গভীর হইয়া নামিয়া আসিতেছে। সেই উপত্যকার শ্যামলভাব

অন্তর্হিত হইয়া, একটা তিমিরময় আবরণ তাহার উপর পতিত হইতেছে। তিনি সন্ত্রস্ত-স্বরে বলিলেন,—"সুন্দরি! জানি না এই বন্ধুর পথ চলিতে আপনার কত কষ্ট হইবে। আপনি আমার হাত ধরুন। নিকটেই আমার অশ্ব বাঁধা আছে।"

অন্য সময় হইলে অপরিচিত যুবকের হস্ত স্পর্শ করিতে রমণী স্বীকৃত হইতেন না, কিন্তু তখন নিরুপায়।

পথ বন্ধুর, সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, পদে পদে পদস্খলন হইবার আশঙ্কা। অগত্যা রমণী, যুবকের হস্ত ধারণ করিলেন। উভয়ে সাবধানে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

ক্ষুদ্র পথ—নানাবিধ ক্ষুদ্র বৃহৎ উপলখণ্ডে আকীর্ণ। দুই পার্শ্বে পর্ব্বত-প্রাচীর। তাহার উপরে, নীচে, আশেপাশে, ছোট, বড়, দীর্ঘ, খর্ব্ব শত শত শ্যামলপত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ। চারিপাশে নির্জ্জনতা। আকাশে, অস্তগামী সূর্য্যের লোহিত বর্ণ ক্রমশঃ মলিন হইয়া পড়িতেছে।

সহসা আট দশজন লোক এক রন্ধ্র পথ হইতে বাহির হইয়া তাঁহাদের পথরোধ করিল। সহসা আট দশখানি মুক্তকোষ, শাণিত তরবারি তাঁহাদের চারিপার্শ্বে সেই সন্ধ্যাচ্ছায়ায় ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। রাজপুত একা, তাহাতে আবার অসহায়া স্ত্রীলোক সঙ্গে। অন্ধকারে এতগুলা লোক মিলিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে। যুবতীকে পশ্চাতে রাখিয়া, বিপদভঞ্জনকে স্মরণ করিয়া, যুবক তরবারিহস্তে সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

আক্রমণকারীরা এবার হল্লা করিয়া উঠিল। যুবক দেখিলেন,—তাহাদের মধ্যে সেই পলাতক পাপিষ্ঠটাও রহিয়াছে। বুঝিলেন, সেই এই অনর্থ ঘটাইয়াছে। তিনি অসিপ্রহারে সর্ব্বাগ্রেই তাহার মস্তক স্কন্ধচ্যুত করিলেন। অমনি আর সকলে একেবারে তাঁহার উপর পড়িল। দেবাসুরসমরে কুমার কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় তিনি বীরবিক্রমে তরবারি চালনা করিতে লাগিলেন। হায়! কিন্তু তিনি একা।

যুবক যখন এরূপে বিপন্ন, তখন উপরের উপত্যকায় আর একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল। পঞ্চশত সৈনিকসঙ্গে এক বীরপুরুষ, সেই উপত্যকা অতিবাহিত করিয়া নীচে নামিতেছিলেন। নীচেকার সমস্ত ঘটনাই তিনি উপর হইতে কিছু কিছু দেখিয়াছিলেন। অন্ধকার হইয়া আসিতেছে, কাজেই তাঁহার নামিতে কষ্ট হইতেছিল। তিনি গম্ভীর-কণ্ঠে আদেশ করিলেন,—"তোমাদের মধ্যে কুড়িজন নীচে নামিয়া গিয়া যুবককে রক্ষা কর।"

সহসা "আল্লা হো আক্‌বর" শব্দে ভীমনাদে সেই রন্ধ্রপথ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। যুবক, ভগবানকে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়া, দৃঢ়-মুষ্টিতে অসি ধরিয়া আরও দুই জনকে নিহত করিলেন।

একবারে অধিক সংখ্যক মোগল-সৈন্য দেখিয়া, আক্রমণকারীরা পলাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাদের পথ রুদ্ধ। সেই উপত্যকা শোণিতরঞ্জিত করিয়া, পাঁচ সাতজন সেইখানেই মরিল।

এক সুগঠিত সৌম্যমূর্ত্তি পুরুষ আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। গম্ভীর-কণ্ঠে আদেশ করিলেন,—"সৈন্যগণ! ক্ষান্ত হও। আর রক্তপাতে প্রয়োজন নাই। এই মুষিকগুলাকে বন্দী কর।"

রাজপুতবীর ইতিপূর্ব্বে স্কন্ধদেশে গুরুতর আঘাত পাইয়াছিলেন। প্রচুর শোণিতস্রাবে তাঁহার শরীর বলহীন হইয়াছিল। সেই আগন্তুক বীরপুরুষ, সেই ক্ষতস্থান সযত্নে স্বীয় উত্তরীয় দ্বারা বাঁধিয়া দিলেন। সস্নেহস্বরে বলিলেন,—"জ্যোতিঃ! আঘাত কি গুরুতর লাগিয়াছে? তোমায় একা পাঠাইয়া আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম না। তোমার অশ্ব দেখিয়া পথের নিদর্শন পাইয়াছি। সময়মত না পৌছিলে, আজ তোমায় হারাইতাম।"

জ্যোতিঃসিংহ কৃতজ্ঞতাপূর্ণ-স্বরে বলিলেন,—"জাঁহাপনা! ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। আপনার করুণা ভুলিতে পারিব না।"

সেই আগন্তুক যোদ্ধৃপুরুষ, এতক্ষণ বৃক্ষান্তরালবর্ত্তী সেই ষোড়শীকে দেখেন নাই, এখন তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িল। তিনি সস্নেহে প্রশ্ন করিলেন,—"জ্যোতিঃ! কে এই ষোড়শী?"

জ্যোতিঃসিংহ সমস্ত ঘটনা বলিলেন।

নবাগত পুরুষ এক হিন্দুসেনানীকে আদেশ করিলেন,—"আহত সেনাপতিকে ও এই রমণীকে সেই হিন্দু-সন্ন্যাসীর কুটীরে লইয়া যাও। আমি পশ্চাতে আসিতেছি।"

সকলে সসম্ভ্রমে অবনত হইল। এই আদেশকারী আর কেহই নহেন—স্বয়ং আকবর সাহ। জ্যোতিঃসিংহ তাঁহার নবীন সেনাপতি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পর্ণশয্যায় জ্যোতিঃসিংহ শায়িত। তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া সেই অনিন্দ্য-সুন্দরী। সুন্দরী একদৃষ্টে জ্যোতিঃসিংহের সংজ্ঞাহীন মলিন মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহার ক্ষতস্থানে কৃষ্ণবর্ণের এক প্রলেপ লাগাইয়া দিতেছেন।

সেই নির্জ্জন কুটীর,—অতি নির্জ্জন। মধ্যে মধ্যে কেবল পার্শ্বোপবিষ্টা সুন্দরীর সংযত শ্বাসপ্রশ্বাস শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শুনা যাইতেছিল না। সেই ষোড়শী তন্ময়চিত্তে রোগীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। অপরাহ্নে জটাজুট-সমন্বিত এক সন্ন্যাসী আসিয়া গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। ধীরগম্ভীরস্বরে প্রশ্ন করিলেন,—"মা! জ্যোতিঃসিংহ কেমন আছে?"

সুন্দরী, রোগীর শয্যাপার্শ্ব হইতে একটু সরিয়া বসিলেন। ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "পিতঃ! রোগীর অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল। একটু আগেই চেতনা হইয়াছিল। এখন ঘুমাইতেছেন।"

সন্ন্যাসীর সেই শ্বেত-শ্মশ্রু-আবৃত, কুঞ্চিত মুখমণ্ডলে আনন্দ প্রকাশিত

হইল। তিনি উৎসাহপূর্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"ভবানীর কৃপায় জ্যোতিঃসিংহ এ যাত্রা রক্ষা পাইল। ঔষধ ধরিয়াছে।"

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলে অলকা, শয্যাশায়িত তাঁহার জীবনরক্ষক রাজপুত-বীরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। শত শত বার দেখিয়াও যেন দর্শনাশা মিটিল না। যেন একবার দেখিয়া নিমেষের মধ্যে পলক না পড়িতে পড়িতে আবার দেখিতে ইচ্ছা হয়। অলকা ভাবিতে লাগিলেন,—যেন কুমার জয়ন্ত, দেবাসুরের যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া এই নির্জ্জন গুহায় বিশ্রাম করিতেছেন।

রাজপুত্রী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"ভগবন্! কেন মহা পরীক্ষায় ফেলিলে? কেন এ রূপবহ্নিতে ঝাঁপ দিলাম? কেন এই অননুভূত ঘটনাপুঞ্জ সৃষ্টি হইয়া ইনি আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন? যাহাকে পাইব না, পাইবার আশা নাই, তাহার জন্য এ উন্মত্ততা কেন? চৌহান ও চন্দাবৎ চিরশত্রু। তাহার উপর আমার পিতা এই বীরশ্রেষ্ঠ জ্যোতিঃসিংহের প্রধান শত্রু। তিনিই ইহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছেন। তাঁহার অত্যাচারেই যথা-সর্ব্বস্ব-ভ্রষ্ট জ্যোতিঃসিংহ বাদসাহের সেনাপতিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। জ্যোতিঃ আমার হইতে পারেন; কিন্তু পিতা হইতে দিবেন কেন?"

রাজকুমারী অলকার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। শয্যাশায়িত রাজপুত-যুবক এবার নেত্রোন্মীলন করিলেন। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন,—"কোথায় আমি? কে এ মোহময়রাজ্যে আমাকে আনিয়াছে? কে তুমি দেববালা আমার শিয়রে বসিয়া?"

অলকা বড় বিপদে পড়িলেন। লজ্জা আসিয়া তাঁহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। লজ্জিত হইবারই কথা। কিন্তু সন্ন্যাসীর আদেশ, যে তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছে, তাহার কাছে লজ্জা কি? অলকা কোমল অথচ কম্পিত-কণ্ঠে উত্তর করিল, "আপনি চিন্তিত হইবেন না, নিরাপদ স্থানেই আছেন।"

"আপনি কে? কেন আমার শুশ্রূষা করিতেছেন?"

"আমি আপনার আশ্রয়দাতা সন্ন্যাসীর আজ্ঞাবর্ত্তিনী। আপনার সেবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছি।"

"নিযুক্ত হইয়াছেন,—কে নিযুক্ত করিল?"

"সন্ন্যাসী"—

"সন্ন্যাসী—কে তিনি?"

"তিনি মহাপুরুষ।"

"তা জানি—কিন্তু আমি এখানে আসিলাম কিরূপে?"

অলকা সমস্ত ঘটনা ধীরে ধীরে বলিয়া ফেলিলেন। জ্যোতিঃসিংহের সকল কথাই মনে পড়িল। তিনি সোৎসুকে প্রশ্ন করিলেন,—"বাদসাহ কোথায়?"

"তিনি আপনার সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দিল্লী গিয়াছেন। আপনার জন্য যানবাহন নিযুক্ত হইয়াছে। আরোগ্য হইলে আপনিও নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইবেন।"

"আপনি—এ বিপদে আমার জীবনরক্ষা করিলেন। আপনার কাছে কি বলিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইব? আপনি কি স্বর্গের দেববালা? আপনার শুশ্রূষায় সকল কষ্ট ভুলিয়াছি।"

অলকা এবার একটু লজ্জিতা হইলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন,—"আপনিই অগ্রে আমার জীবনরক্ষা করিয়াছেন। এ ছার জীবনের উপর আপনার পূর্ণ আধিপত্য—"

আর বলা হইল না। রাজকন্যা ভাবিলেন,—ছি! ছি! কি প্রগল্ভতাই করিলাম! কি বলিয়া ফেলিলাম!

জ্যোতিঃসিংহ করুণ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সুন্দরি! আপনার পরিচয় জানিতে কি কোন বাধা আছে?"

এ কথার উত্তর দিতে অলকার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। যে

জ্যোতিঃসিংহ তাহার পিতার জন্যই আজ ভিখারীবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছেন; যাঁহার রাজ্য ছিল, ঐশ্বর্য্য ছিল, সম্ভ্রম ছিল, বীর্য্য ছিল, সেই দুর্গাধিপতি প্রদ্যোৎসিংহের পুত্র—জ্যোতিঃসিংহ আজ উদরান্নের জন্য মোগল-বাদসাহের অধীনে সামান্য সৈনিক-কর্ম্মচারী। সন্ন্যাসী, জ্যোতিঃসিংহের পূর্ব্ব-পরিচয় জানেন। তিনিই অলকাকে সব বলিয়াছিলেন। পরিচয় পাওয়ার পর হইতে অলকার কৃতজ্ঞতা আরও দশগুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার সহানুভূতি ক্রমশঃ প্রেমে পরিণত হইয়াছে। পিতামাতা—পিতৃস্নেহ, সংসার, সব একদিকে; আর এই নিভৃতগুহায় পর্ণশয্যায় শায়িত রাজপুত-যুবক একদিকে। অলকা মনে মনে ভাবিয়াছে,—যদি তাহার ক্ষুদ্র প্রাণ তাঁহার গ্রহণীয় হয়,—যদি তাহার তুচ্ছ শরীর তাঁহার কাজে লাগে,—যদি তিনি তাহার ন্যায় দুর্ভাগিনী অবলার দান গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন, তবে হৃদয়দানেই তাহার পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

সঙ্গিনীকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া রাজপুত্র বুঝিলেন, পরিচয়দানে তাঁহার বিশেষ আপত্তি। তিনি আর কিছুই বলিলেন না। নেত্র দুটী পুনরায় নিমীলিত হইবার পূর্ব্বে বলিলেন, "বড় তৃষ্ণা—"

সুবাসিত ঔষধমিশ্রিত সরবত—সেই অনিন্দ্যসুন্দরী অলকা, তাঁহার মুখে ঢালিয়া দিলেন। রাজপুত-সৈনিক মনে মনে ভাবিলেন,—দেব-লোক হইতে অপ্সরা তাঁহার মুখে অমৃত ঢালিয়া দিতেছেন। সেই অমৃতের গুণে তিনি নিদ্রিত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"মা! আমি ভবানীর আদেশ পাইয়াছি। তিনি যাহা জানাইয়াছেন, তাহাই বলিতেছি। তোমাদের মিলন সুখের হইবে না। কাল সমস্ত রাত্রি গণনা করিয়া যাহা বুঝিয়াছি,—তাহাতে প্রতিপদেই বিঘ্ন।"

কুটীর-বাহিরে এক তমালতলে দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসী, অলকাকে উপ-রোক্ত কথাগুলি বলিতেছিলেন। আর অলকা—মলিনমুখে, অবনতবদনে একটী শুষ্ক তমাল-পত্র ছিন্ন করিতে করিতে তাহাই শুনিতেছিল।

পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদের বিবৃত ঘটনার পর পাঁচ সাত দিন কাটিয়াছে। জ্যোতিঃসিংহ দিল্লীতে ফিরিয়া গিয়াছেন। সন্ন্যাসী, অলকার পিতা দুর্গাধিপতিকে পত্র লিখিয়া নিরুদ্বিগ্ন করিয়া, তাহাকে আরও দুই একদিন আশ্রমে রাখিয়াছেন। সেই তীক্ষ্নবুদ্ধি প্রজ্ঞাবান্ সন্ন্যাসী বুঝিয়াছিলেন,—অলকা ও জ্যোতিঃসিংহ উভয়েরই মনে ঘটনাবশে প্রেম-সঞ্চার হইয়াছে। তাই জ্যোতিঃসিংহ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য না হইতে হইতেই তিনি আমাকে দিল্লীতে পাঠাইয়াছেন।

অলকা ধীরে ধীরে বলিলেন,—"পিতঃ! তবে কি কোন উপায়ই নাই?"

"না—মা! বৈধব্যযোগ দেখিতেছি। তোমাদের এখন হইতে এক বৎসর কাল দেখাশুনা নিষিদ্ধ। দেখা হইলেই বিপদ্ ঘটিবে। দৈবের কথা কখনও মিথ্যা হয় না,—জানিও মা!"

"পিতঃ, তবে আর দুর্গে ফিরিব না। আপনার সেবায়, সন্ন্যাসিনী হইয়া জীবন কাটাইব।"

"আমি সন্ন্যাসী—সংসারের সহিত আমার সম্পর্ক অল্প। আমি কোথায় থাকি, কোথায় যাই, স্থির নাই। আর কেন মা, আমায় মায়ায় জড়িত করিবি?"

অলকা এ কথার উত্তরে আর কিছু বলিতে পারিল না। মনে মনে ভাবিল, এক বৎসর কাটিতেই বা কত দেরি! কেন পিতামাতার মনে কষ্ট দিই। প্রেমের স্মৃতি লইয়া—জলন্ত-বহ্নি হৃদয়ে ধরিয়া কাল কাটাইব। তাঁহাকে পাই সুখী হইব—নতুবা পরলোকে ত আর কেহ বাধা দিবে না!

নিকটেই বাহকেরা ডুলি লইয়া বসিয়াছিল। অলকা, সন্ন্যাসীর পদবন্দনা করিয়া ডুলিতে উঠিলেন। সন্ন্যাসী আশীর্ব্বাদ করিলেন,—"মা! ভবানীর কৃপায় তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হউক।"

যতক্ষণ দৃষ্টি চলে,—ততক্ষণ সন্ন্যাসী অলকার গন্তব্য পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বোধ হইল, মহর্ষি কণ্ব যেন শকুন্তলাকে বিদায় দিতেছেন। আর দেখা যায় না,—দৃষ্টিপথ বনলতাগুল্মে বদ্ধ হইয়াছে, সন্ন্যাসী নয়ন মার্জ্জনা করিয়া কুটীরে ফিরিলেন।

সন্ন্যাসী আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া গুহামুখে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন,—"অনীতা!"

গৈরিক-বসন-পরিহিতা এক যুবতী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। গৈরিকে সে রূপ আরও উজ্জ্বল দেখাইতেছে। সে রূপ-বহ্নির তীব্রতা না থাকিলেও অনেক পুরুষ-পতঙ্গ তাহাতে ঝাঁপ দিতে পারে।

ভরা ভাদ্রে, দুইকূল ভরা, প্লাবিতাগঙ্গাবক্ষ অনুমান কর। তাহার অন্তরস্থ উদ্দাম খরস্রোতের প্রভাব লক্ষ্য কর। অনীতার মুখের দিকে চাহিলে, সেইরূপ একটা চাঞ্চল্যভাব দেখিতে পাইবে।

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"বৎসে! চিত্তসংযম করিতে পারিয়াছ কি?"

"না প্রভুঃ! লজ্জার মাথা খাইয়া আপনার কাছে বলিতেছি, এখনও পারি নাই,—কখনও পারিব তাহারও সম্ভাবনা নাই। আমায় অনুমতি দিন, আশ্রম হইতে চলিয়া যাই। আর এ পবিত্র স্থান অভাগিনীর দ্বারা কলুষিত হইবে না।"

সন্ন্যাসী এরূপ উত্তরের আশা করেন নাই। তাঁহার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। রুষ্টভাবে বলিলেন,—"পাপীয়সি! নিজের অদৃষ্ট জানিতে পারিলে, বোধ হয় চিত্তদমন করিতে পারিবি। তোর অহঙ্কার চূর্ণ হইবে, ভ্রম দূর হইবে। যে অনিষ্ট প্রতীকারের জন্য আমি এত চেষ্টা করিতেছি, তাহাও সিদ্ধ হইবে।"

সহসা প্রাচীরের নিম্নস্থান হইতে কে আবেগপূর্ণস্বরে বলিয়া উঠিল

"অলকা,—আমি আসিয়াছি।"—১২৮ পৃষ্ঠা।

Emerald Printing Works

এক প্রান্তভগ্ন, কৃষ্ণকায় বন্ধুরগাত্র শিলার উপর বসিয়া সন্ন্যাসী, অনীতাকে বলিতে লাগিলেন,—"অনীতা! আগে জ্যোতিঃসিংহের পরিচয় দিই। দুর্গাধিপতি,—প্রদ্যোৎসিংহ আমার শিষ্য। এখন সেই দুর্গ,—চন্দ্রায়ৎ গম্ভীরসিংহের দখলে। গম্ভীরসিংহ দাম্ভিক, অত্যাচারী, ষড়যন্ত্রী। চক্রান্ত দ্বারা দিল্লীশ্বরের কাণ ভারি করিয়া, প্রদ্যোৎসিংহের হস্ত হইতে দুর্গ কাড়িয়া লয়। অভিমানে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া, প্রদ্যোৎসিংহ নিশাযোগে ভিখারীর ন্যায় গৃহত্যাগ করেন। আমি তখন তীর্থে গিয়াছিলাম।"

"চিত্রাবতীর শিলাময় বক্ষে নৌকা লাগিয়া,—প্রদ্যোৎসিংহের নৌকা ডুবিয়া যায়। সেই নৌকায় একটী বালিকা ও একটী বালক ছিল। সেই বালক, প্রদ্যোতের একমাত্র পুত্র জ্যোতিঃসিংহ। আর সেই বালিকা তুমি,—অনীতা।"

"প্রদ্যোৎসিংহের হস্ত হইতে যখন দুর্গ ও জায়গীর স্খলিত হয়, তখন তিনি মৃতদার। এই গোলযোগের সময় তিনি এক কুলকন্যাকে গৃহে আনেন। এই যুবতীর সম্বন্ধে রাজপুরীতে নানা কথা উঠিল। নূতন রাণীর চরিত্রসম্বন্ধে শীঘ্রই একটা কলঙ্ক রটনা হইল। বর্ত্তমান দুর্গাধিপতি গম্ভীরসিংহ, প্রদ্যোৎসিংহের প্রধান সেনাপতি। নূতন রাজ্ঞী এবং তাঁহার নামে কলঙ্ক উঠিল। এ অপবাদ সহ্য করিতে না পারিয়া, প্রদ্যোৎসিংহ তাঁহার পত্নীকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করিলেন।"

"ইহার পরই প্রদ্যোৎসিংহের কপাল ভাঙ্গিল। গম্ভীরসিংহের চেষ্টায় দিল্লী হইতে রুবকারি আসিলে, তিনি রাত্রিযোগে পলায়ন করেন। গম্ভীরসিংহের ঔরসজাত জানিয়াও, মায়াবশে তোমায় পরিত্যাগ করেন নাই। নৌকা মগ্ন হইবার পর,—চিত্রাতীরবর্ত্তী শিবমন্দিরের এক সন্ন্যাসী তোমাদের উদ্ধার করেন। আমিই সেই সন্ন্যাসী।"

"আমি সন্ন্যাসী,—তোমাদের লইয়া কি করিব, কিন্তু প্রদ্যোৎসিংহের

মায়া ভুলিতে পারিলাম না। আগ্রায় আক্‌বর বাদসার কাছে প্রায়ই আমায় যাইতে হইত। সেখানে এক শ্রেষ্ঠী আমার প্রধান শিষ্য। তাহার উপর তোমাদের দুই জনেরই পালনভার দিলাম।"

"মনে আছে,—এক মাঘী পূর্ণিমায় আমি আগ্রা যাই। জ্যোতিঃ তখন বাদসাহের অধীনে কর্ম্মে ব্রতী,—শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। শ্রেষ্ঠী-পত্নীর মুখে শুনিলাম, তোমাদের বাল্যপ্রণয়,—যৌবনের ভালবাসায় পরিণত হইয়াছে। কথাটা ভাল লাগিল না।"

"মনে দুঃখ করিও না,—অনীতা! তোমার মাতার অপবাদের কথা তখনও ভুলি নাই। তোমার সহিত জ্যোতিঃসিংহের বিবাহ হইতে পারে না,—আমিই তাহা জানিতাম। কাজেই তোমায় পৃথক্ করিয়া নিজের আশ্রমে আনিয়া রাখিলাম।"

"তারপর জ্যোতিঃসিংহ আহত হইয়া আশ্রমে আসিলে, আমার পুনঃ পুনঃ নিষেধসত্ত্বেও তুমি, অলকা নিদ্রিতা হইবার পর, জ্যোতিঃ-সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছ। আমার আজ্ঞালঙ্ঘনে তোমার পাপ হইয়াছে। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত চিত্তদমন। তিনদিন তোমায় নিরা-হারে রাখিয়াছি,—মনঃস্থির করিতে বলিয়াছি,—কিন্তু তাহাও পারিলে না। এখন নিজ অদৃষ্ট ভাবিয়া সাবধান হও। জ্যোতিঃসিংহের সহিত তোমার মিলন যে কেন অসম্ভব, তাহা এখন বুঝিলে। জ্যোতিঃসিংহ পিতৃমাতৃহীন,—আমিই তাহার অভিভাবক। আমি না দেখিলে কে আর তাহাকে দেখিবে? দ্বাদশঘণ্টা চিন্তার অবসর দিলাম। কাল প্রভাতে আবার দেখা করিও।"

উদাসীন চলিয়া গেলে, অনীতা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনোভাব প্রকাশ করিল। যুক্তকরে ঊর্দ্ধনেত্রে আকাশের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল, "প্রেমাকাঙ্ক্ষা দমন করিব কি করিয়া? যেন এই আকাঙ্ক্ষা লইয়াই মরিতে পারি। জগতে আমার কিছুই নাই,—আছে কেবল

প্রেমচিন্তা। আর তুমি হৃদয়হীন সংসারবিরাগী,—উদাসীন, তুমি প্রেমের মর্ম্ম কি বুঝিবে ?”

অনীতার চক্ষু দিয়া দরদরবেগে অশ্রু বহিতে লাগিল। দুই চারি ফোঁটা,—সেই কৃষ্ণকায় পাষাণের উপর পড়িল। কিন্তু পাষাণ ভিজিবে কেন ? অনীতা উঠিয়া দাঁড়াইল। অস্থিরগতিতে আবার গুহার দিকে অগ্রসর হইল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল,—“যদি ছাড়িতেই হয়, আর একবার সেই কমনীয় রূপজ্যোতি দেখিয়া পতঙ্গবৎ তাহাতে ঝাঁপ দিয়া ঝলসিয়া মরিব।”

এই ঘটনার পরদিন, সন্ন্যাসী অনীতাকে কোথাও খুঁজিয়া পান নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যাগগনে একটা ক্ষীণ লোহিত ছায়া পড়িয়াছে। মেঘের উপর মেঘ,—সাদা, কাল, পাটল, হরিদ্রা, ধূসর,—কত রং, কত বৈচিত্র্য। আর সেই অত বড় নীল আকাশের একাংশ, চিত্রাবতীর নীল-সলিলে ডুবিয়া পড়িতেছে। কি দুঃখে, আকাশই জানে।

সেই সান্ধ্যপ্রকৃতি দেখিয়া, প্রেমিকের মনে নানা কল্পনা জাগিয়া উঠিতে পারে। কিন্তু চিত্রাবতীর বক্ষ ভেদ করিয়া যে ক্ষুদ্র দুর্গ আকাশে মাথা তুলিয়াছিল,—তাহার সর্ব্বোচ্চ মিনারে বসিয়া, এক ষোড়শ,—প্রকৃতির ক্ষণপরিবর্ত্তনীয় মধুর বিচিত্র দৃশ্য দেখিতেছিলেন। তাহার মনে কি চিন্তা উঠিতেছিল, তাহা কে বলিতে পারে ?

যিনি সান্ধ্যশোভা দেখিবার জন্য মিনারের উপর উঠিয়াছিলেন, ওড়না বিছাইয়া,—সেই মর্ম্মরমণ্ডিত মিনারতলে গাত্রজ্বালার শান্তি করিতেছিলেন, তিনি দুর্গাধিপতি গম্ভীরসিংহের একমাত্র কন্যা অলকা।

দেবদর্শনে গিয়া পথিমধ্যে দস্যুহস্তে পড়িয়া অলকা কিরূপে নিগৃহীতা হন,—ও কুমার জ্যোতিঃসিংহ কিরূপে তাঁহাকে রক্ষা করেন,

সন্ন্যাসীর যত্নে জ্যোতিঃসিংহের জীবন কিরূপে রক্ষা হয়, তাহার পরিচয় পাঠক পূর্ব্বেই পাইয়াছেন।

অলকা সেই নির্জ্জন মিনারে বসিয়া, জ্যোতিঃসিংহের কথা ভাবিতেছিলেন। চিত্রাবতীর শীতলসমীরচুম্বিত বাতাসেও তাঁহার হৃদয়ের উষ্মা বিদূরিত হইতেছিল না। পিতা,—কখনই শত্রুপুত্রের হাতে কন্যা সম্প্রদান করিবেন না। জ্যোতিঃসিংহও সাহস করিয়া দুর্গে আসিতে পারেন না। তবুও সন্ন্যাসীর আশ্রম হইতে আসিবার পর, তিনি একবার লুকাইয়া দেখা দিয়া গিয়াছিলেন।

চিন্তাও ভাল লাগিল না। যেন অত উচ্চ মিনারে চিত্রার শীতলবাতাস পৌছিতে পারিতেছিল না। সুন্দরী আবার অলিন্দে নামিয়া আসিলেন,—এই স্বল্পশ্রমে,—তাঁহার সেই রক্তকমলসদৃশ মুখমণ্ডলে, ক্ষুদ্র শিশিরবিন্দুবৎ ঘর্ম্মবিন্দু জাগিয়া উঠিল। ওড়নার প্রান্ত দিয়া মুখ মুছিয়া, অলকা একবার আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন,—তারপর ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—"ঠিক—এইখানে—ঠিক এই সময়ে তাঁর সহিত দেখা হইয়াছিল। এই প্রস্তরময় দুর্গগাত্রে রজ্জু-সোপান বিলম্বিত করিয়া, এই স্থানেই তিনি আমায় দেখা দিয়াছিলেন। চন্দাবৎবংশের সহিত, চৌহানকুলের বংশগত শত্রুতা। পিতা আমাদের বিবাহে কখন সম্মত হইবেন না। তাহা হইলে চিত্রার এই গভীর কৃষ্ণজলে, আমার মরণই ভাল। কিন্তু আর একবার তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা হয়, আর একবার যদি তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম!"

সহসা প্রাচীরের নিম্নস্থান হইতে কে আবেগপূর্ণস্বরে বলিয়া উঠিল, "অলকা,—আমি আসিয়াছি।"

রাজকুমারী অলকা সে স্বর শুনিবামাত্রই বুঝিয়াছিলেন,—জ্যোতিঃসিংহ আসিয়াছেন। সহসা রাজকুমারকে সম্মুখে দেখিয়া অধোমুখী হইলেন।

জ্যোতিঃসিংহ রাজকুমারীর সম্মুখে আসিয়া বলিলেন,—"অলকা! কতদিন আর এরূপে চোরের ন্যায় এই দুর্গে গমনাগমন করিব? সময়ে সময়ে মনে হয়, তোমার পিতার নিকট মনোভাব প্রকাশ করিয়া বলি। কিন্তু তাঁহার ঔদ্ধত্যের কথা মনে হইলে সে ভরসা হয় না। তোমার জন্মদাতা তিনি,—তাই তাঁহার শত্রুতা ভুলিয়াছি, তাঁহাকে আপনার বলিয়া ভাবিতেছি। সন্ন্যাসীর নিষেধসত্ত্বেও বিপদ গ্রাহ্য না করিয়া দুর্গে আসিতেছি। চল, অলকা! আর এ স্থানে থাকিয়া কাজ নাই; আমি তোমার জন্য মোগলের সেনাপতিত্ব ছাড়িতে প্রস্তুত। তোমায় লইয়া কুটীরে থাকিয়াও সুখী হইব। তোমায় লইয়া বিজনে নন্দন প্রতিষ্ঠা করিব।"

রাজকন্যা অলকা প্রথমে কথা কহিলেন না,—পরে ধীরে ধীরে বলিলেন,—"কুমার! ইহজীবনে আমাদের সুখী হওয়া অসম্ভব! এত বাধা-বিঘ্ন,—জানি না কোথায় ইহার পরিণাম। তুমি আমায় যেখানে লইয়া যাইবে,—সেই স্থানেই আমি সুখী হইব। কিন্তু আবার নূতন সর্ব্বনাশ উপস্থিত! পিতা আমার বিবাহের দিন স্থির করিবার জন্য,—সুরতান সিংহের সহিত পরামর্শ করিতে গিয়াছেন। শুনিতেছি, একেবারে সুরতানপুত্র দুর্জ্জয়সিংহকে সঙ্গে করিয়া আনিবেন। তুমি উদ্ধার না করিলে আমার আর অন্য কোন উপায় নাই। কিন্তু গোপনে পলায়নে বড় কলঙ্ক। সব সহিতে পারি, বংশের কলঙ্ক সহিতে পারি না। পলায়ন ভিন্ন কি আর কোন উপায় নাই?"

জ্যোতিঃসিংহ স্থির হইয়া কি ভাবিলেন,—পরে অলকার সমীরণ বিক্ষিপ্ত অলকরাজি যথাস্থানে বিন্যস্ত করিতে করিতে বলিলেন,—"অন্য উপায় ত চিন্তা করিয়া দেখি নাই,—আজ হইতে সপ্তাহান্তে তোমার সহিত দেখা করিব।"

"কোথায়?"

"এই দুর্গমধ্যে।"

"এ পথে আর আসিও না। তোমার প্রথম আগমনের দিনেই সন্দেহের কারণ ঘটিয়াছিল। প্রহরীরা কয়েকদিন নদীতীরে সতর্কতার সহিত পাহারা দিয়াছিল। পিতা চলিয়া যাওয়ার পর, তাহারা পাহারা শিথিল করিয়া দিয়াছে। তাই তুমি এত সহজে আসিতে পারিয়াছ।"

"তবে কি উপায়ে দুর্গে প্রবেশ করিব?"

রাজকন্যা চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"দুই এক দিনের মধ্যে উপায় বলিয়া পাঠাইব।"

জ্যোতিঃসিংহ নিশ্বাস ফেলিয়া অলকার মুখচুম্বন করিয়া রজ্জু বাহিয়া নীচে নামিয়া গেলেন। চিত্রার তীরদেশে তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর অপেক্ষা করিতেছিল। তাহাকে বলিলেন,—"সুন্দর! নৌকা লইয়া আইস।"

নৌকায় উঠিয়া জ্যোতিঃসিংহ চলিয়া গেলেন।

অলকা, চিন্তাকুল-চিত্তে, আলস্য ত্যাগ করিয়া ছাদের উপর দাঁড়াইলেন। সহসা দেখিতে পাইলেন, সেই অন্ধকারে কে যেন ধীরে ধীরে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। রাজকন্যা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?"

সম্মুখস্থ মূর্ত্তি কোন উত্তর করিল না,—ধীরে ধীরে নিকটে অগ্রসর হইতে লাগিল। সহসা অন্ধকারে হাস্যধ্বনি শ্রুত হইল,—রাজকন্যা ভীতা হইলেন।

মূর্ত্তি ক্রমে ক্রমে নিকটস্থ হইল। রাজকন্যার হাতখানি ধীরে ধীরে ধরিল। বলিল,—"ভয় পাইও না, আমি স্ত্রীলোক।"

"কে তুমি? দুর্গমধ্যে কি করিয়া আসিলে? তুমি স্ত্রীলোক—, কিন্তু তোমার উদ্দেশ্য কি?"

রমণী আবার হাসিয়া উঠিল। বলিল,—"ভয় নাই, আমি তোমার শত্রু নই।"

অলকা চিন্তিতা হইলেন। নবাগতা রমণী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি সুন্দরী দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু ভালবাসার মর্ম্ম বুঝিয়াছ কি?"

"এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?"

"বলিলেই বা ক্ষতি কি?"

"তুমি কে? এ পর্য্যন্ত তোমার পরিচয় পাই নাই।"

"যদি না দিই—"

"প্রহরী ডাকিব।"

"আমি স্ত্রীলোক,—প্রহরী আমার কি করিবে?"

"অলকা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে কেন আসিয়াছ? তোমার কি চাই?"

"আমি—কি চাই—যাহা পাইব না, যাহা পাইবার আশা নাই,—যাহাকে পাইয়া হারাইয়াছি,—আবার যাহা পাইব না, তাহাই চাই!"

"তোমার কথা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

রমণী বলিল,—"তুমি চৌহান-রাজকুমার জ্যোতিঃসিংহকে ভালবাস?"

অলকা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কে বলিল,—আমি তাঁহাকে ভালবাসি?"

রমণী, হৃদয়ের আবেগে বলিয়া উঠিলেন, "আমার নিকটে গোপন করিও না। তিনি এইমাত্র এখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন। আমি তোমাদের সকল কথাই শুনিয়াছি। তুমি প্রতিজ্ঞা কর, তাঁহাকে ভুলিয়া যাইবে, আর তাঁহাকে দেখিবার চেষ্টা করিবে না। জ্যোতিঃসিংহ আমার,—বাল্যকাল হইতে আমরা একত্রে,—তুমি তাঁহাকে কাড়িয়া লইতেছ, তাঁহারই জন্য পাগলিনীর মত আমি দেশে দেশে বেড়াইতেছি।"

রাজকুমারী অলকা এখন কতক বুঝিতে পারিলেন। কিয়ৎকাল

তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। অবনতমস্তকে চিন্তা করিলেন। পুনর্ব্বার যখন মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখিলেন, তখন কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। রমণী যেমন সহসা আসিয়াছিল, সেইরূপ সহসা অদৃশ্য হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অলকা বিষণ্ণ-চিত্তে নিজের মহলে প্রবেশ করিলেন। একজন দাসীকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহল হইতে কোন স্ত্রীলোককে বাহির হইতে দেখিয়াছিস্?" দাসী বলিল, "কাহাকেও দেখিতে পাই নাই।" প্রহরীদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তাহারাও কিছু বলিতে পারিল না। অপরিচিতা রমণীর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

অলকা অত্যন্ত চিন্তান্বিতা ও কিছু ভীতা হইলেন। এ রমণী কে? কি তাহার অভিপ্রায়? দুই এক দিনের মধ্যে সুরতানসিংহ আসিয়া উপস্থিত হইবেন। ইতিমধ্যে যদি জ্যোতিঃসিংহ সংবাদ না পান, তাহা হইলে কি হইবে?

গভীর রাত্রে বাতায়ন মুক্ত করিয়া, রাজকন্যা একবার আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। নক্ষত্রমালিনী নীল আকাশে 'অন্ধকার,— চিত্রার জলের উপর অন্ধকার। চারিদিক নিস্তব্ধ।

সেই গভীর রাত্রে নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া দুর্গ-তোরণ হইতে ঘণ্টানিনাদ হইল। রাজকন্যা বুঝিলেন, রজনী তৃতীয়প্রহর। বাতায়ন রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিলেন। শয়ন করিয়া সেই রমণীর বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

নিদ্রিতাবস্থায় কেবল দুঃস্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

দুর্গের উত্তরাংশে চিত্রাতীরে প্রস্তরমণ্ডিত কল্যাণী-মন্দির। এই কল্যাণী-দেবী চোহান ও চন্দাবৎদিগের অধিষ্ঠাত্রীদেবী। দুর্গাধিপতি, পুরুষানুক্রমে এই প্রতিমার পূজা করিয়া আসিতেছেন।

প্রভাতকালে কৌষেয়-বসন-পরিভূষিতা হইয়া রাজকন্যা পূজায় বসিয়াছেন। স্থির স্তিমিত, নিষ্পন্দ নিশ্চল—স্বর্ণ-প্রতিমা, সেই পাষাণ-প্রতিমার পদমূলে বসিয়া, একমনে দেবীর ধ্যান করিতেছেন। পূজা সাঙ্গ হইলে, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন।

তাহার পর আসন ত্যাগ করিয়া রাজকন্যা, মন্দিরের উত্তরাংশের এক ক্ষুদ্র গৃহের দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, মৃদু মৃদু করাঘাত করিলেন। দ্বার খুলিয়া গেল।

গৃহমধ্যে অজিনাসনে একজন ভৈরবী বসিয়া রহিয়াছেন। যেন শান্তি ও বিবেক সেই ভৈরবীর মুখমণ্ডলে চিরবাসস্থান স্থাপন করিয়াছে। ভৈরবী অজিনাসনে উপবিষ্ট—পার্শ্বে সিন্দুরমণ্ডিত ত্রিশূল। নিকটে নর-কপাল, শব ও ভস্মরাশি। গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা, ললাটে সিন্দুর ও চন্দনের মিশ্ররেখা, আর সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি।

অলকা ভক্তিভরে ভৈরবীর সম্মুখে প্রণত হইলেন। ভৈরবীর গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর হইল।

রাজকন্যা সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি দেখিলেন মা ?"

ভৈরবী কোন কথা কহিলেন না, কিন্তু তাঁহার ললাটে চিন্তা-রেখা দেখা দিল। রাজকন্যা ইহা দেখিতে পাইলেন না। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গণনায় কি দেখিলেন ?"

ভৈরবী ধীরে ধীরে কহিলেন, "বৎসে ! ভবিষ্যৎ জানিয়া কি হইবে ?"

অলকা কাতরস্বরে অনুনয় করিয়া আত্মভবিষ্যৎ জানিতে চাহিলেন।

ভৈরবী বলিলেন,—"অলকা ! তোমার ও জ্যোতিঃসিংহের মিলন অবশ্যম্ভাবী, গণনায় এইরূপ পাইতেছি। কিন্তু মিলনের ফল শুভ নয়। কিসে অশুভ ঘটিবে, তাহা জানিতে পারি নাই। তবে—বিশেষ করিয়া দেখিতেছি,—তোমার বৈধব্যযোগ নাই।"

রাজকন্যা অলকাসুন্দরী, ভৈরবীর চরণবন্দনা করিয়া পুরীমধ্যে

প্রবেশ করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, সন্ন্যাসীর কথার সহিত ভৈরবীর কথার মিল নাই। জ্যোতিষের উপর তাঁহার অবিশ্বাস জন্মিল। দৈবের উপর বিশ্বাস দৃঢ় হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

চারিদিকে গভীর অন্ধকার। বনপথে সেই অন্ধকার আরও গভীর হইয়াছে। গাছের কোলের অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া—শাখার নিম্নে—পল্লবের ক্রোড়ে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সমগ্র বনভূমি নিস্তব্ধ। চারিদিকে শাল, তমাল প্রভৃতি গগনস্পর্শী বৃক্ষসমূহ।

গাছের মাথায় মাথায়, ক্ষুদ্র বৃহৎ হীরকখণ্ডবৎ অসংখ্য জোনাকী জ্বলিতেছে। সেই অন্ধকার-বেষ্টিত সমুন্নতশীর্ষ তরুরাজির গভীর পল্লবের মধ্যে দুই একটা নিশাচর পক্ষী অস্ফুট শব্দ করিতেছিল।

এই গভীর রাত্রে, এই নিস্তব্ধ বনপথে—একজন অশ্বারোহী অতি-কষ্টে পথ অতিবাহন করিতেছে। বনমধ্যে গমনাগমনে কাঠুরিয়ারা একটা সঙ্কীর্ণ পথের সৃজন করিয়াছিল এবং পরিচিত বলিয়াই সেই সাহসী যুবক অতিকষ্টে অশ্বচালনা করিতেছিলেন।

অশ্ব এতক্ষণ কোনরূপে গমন করিতেছিল, কিন্তু কি দেখিয়া যেন সহসা ভয় পাইয়া দাঁড়াইল। অশ্বারোহী অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া দেখি-লেন, সেই অন্ধকারবেষ্টিত বনপথে—অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তি।

সাহসী সৈনিক, হস্তস্থিত বর্শা দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে দাঁড়াইয়া ?" কে যেন তাঁহার কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিয়া বলিল, "কুমারের জয় হউক !"

অশ্বারোহী চিনিতে পারিলেন, তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর কর্দ্দমসিংহ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত বিলম্ব করিলে

যে? আমি সঙ্কেত স্থানে তোমার অপেক্ষায় অনেকক্ষণ থাকিয়া ফিরিয়া যাইতেছিলাম। মনে ভাবিয়াছিলাম, তোমার চেষ্টা বিফল হইয়াছে!"

"আপনার আশীর্ব্বাদে কার্য্য সফল করিয়াছি, কিন্তু অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছে।"

কুমার বলিলেন,—"তবে চল। যখন বিপদকে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইয়াছি—আর ফিরিব না।"

"আজই?"

"হাঁ—আজই—এই রাত্রে।"

"একটা কাজ করুন। অশ্ব এইখানে রাখিয়া যান। আমরা দুর্গের অতি নিকটে আসিয়াছি।"

"অশ্ব কোথায় রাখিব?"

"একটা বৃক্ষমূলে বন্ধন করুন। আমি ফিরিবার সময় লইয়া যাইব।"

"তাহাই হউক; কিন্তু বর্ষা—তরবারি, যোদ্ধৃবেশ?"

যদি সেই অন্ধকারে কাহারও দৃষ্টিক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে সে হয় ত দেখিতে পাইত, কর্দ্দমের মুখে একটু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কর্দ্দম মনে মনে বলিল, "প্রণয়িনী-সন্দর্শনে যাইতেছেন, তরবারি ও বর্ষায় কি হইবে?" প্রকাশ্যে বলিল,—"বর্ষাটাও রাখিয়া যান। যেরূপ বেশে আছেন, তাহাতেই চলিয়া যান। তরবারি সঙ্গে থাক। শত্রুপুরী!!"

যুবক ক্ষিপ্রহস্তে বৃহৎ বৃক্ষশাখায় অশ্ববল্গা বন্ধন করিলেন। ধীরপদে অগ্রসর হইয়া কর্দ্দমসিংহের প্রদর্শিত পথে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন।

বনের পার্শ্বেই ক্ষুদ্র পাহাড়। পাহাড়ের উপর দিয়া ক্ষুদ্র গিরিনদী বহিয়া যাইতেছে। এই গিরিনদীই চিত্রার সহিত মিলিয়া দুর্গের পরিখা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কর্দ্দম, অতিকষ্টে পথ ঘুরিয়া এই ক্ষুদ্র নদী পার হইল।

যুবক বলিলেন, "কৰ্দ্দম! আমরা ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে পৌছিতে পারি নাই। হয় ত তোমার কৌশল ব্যর্থ হইবে। তোমার বন্ধুর পাহারার সময় হয় ত উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।"

কৰ্দ্দম এ কথায় উত্তর করিল না। সে প্রস্তর-প্রাচীরবেষ্টিত ভীম-কায় দুর্গের এক গুপ্তদ্বারে গিয়া দুই চারিবার আঘাত করিল। ভিতর হইতে ঠিক সেইরূপ আঘাতশব্দ শ্রুত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই দুর্গদ্বারের একাংশ উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। কৰ্দ্দমসিংহ বলিল, "নিঃশব্দে প্রবেশ করুন। দুর্গমধ্যে সেই প্রহরীই আপনার পথপ্রদর্শক হইবে।"

যুবক কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিলেন। পরে তাঁহার অনুচরের কাণে কাণে বলিলেন, "তুমি আমার অশ্ব লইয়া ছাউনীতে যাও। সেনাপতিকে বলিও, আমার একশত বাছা সওয়ার চাই। তুমি প্রভাতের পূর্ব্বে এইখানে পৌছিবে। বনের মধ্যে সেনা রাখিও।"

কৰ্দ্দমসিংহ প্রণত হইয়া বলিল,—"যে আজ্ঞা। কিন্তু আর বিলম্ব করিবেন না।"

যুবক, দুর্গে প্রবেশ করিলেন। সহসা মহাশব্দে দুর্গদ্বার বন্ধ হইয়া গেল।

সেই রাত্রে দুর্গাধিপতি গম্ভীরসিংহও ঘটনাবশে, সুরতানসিংহ ও দুর্জ্জয়সিংহকে সঙ্গে লইয়া, অলকার বিবাহের কথা স্থির করিয়া দুর্গে ফিরিতেছিলেন।

পথে সেই বন্য বৃক্ষশাখায় আবদ্ধ অশ্বের হ্রেষারব, তাঁহার কর্ণগোচর হইল। গম্ভীরসিংহ দেখিলেন, নিকটে এক সুসজ্জিত অশ্ব বাঁধা রহিয়াছে। তাঁহার মনে সন্দেহ হইল। এ রাত্রে এখানে কে অশ্ব বাঁধিল? তাঁহার শত্রুর অভাব নাই। তিনি সুরতানসিংহকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"এ অশ্ব কাহার?"

সহসা সেই নির্জ্জন বনপ্রদেশে কোমল কণ্ঠধ্বনি হইল। কে বলিল, "আমি বলিয়া দিব।"

কণ্ঠস্বরের অনুসরণ করিয়া গম্ভীরসিংহ, সুরতানসিংহ প্রভৃতি দেখিলেন, অন্ধকারে কে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না।

গম্ভীরসিংহ তরবারি কোষমুক্ত করিলেন। অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুই ?"

সে ব্যক্তি উত্তর করিল, "গম্ভীরসিংহ কি স্ত্রীলোকের উপর অসি-চালনা করেন ? আমি আপনার উপকার করিতে আসিয়াছি। অন্য পরিচয়ে প্রয়োজন কি ?"

গম্ভীর সিংহ কহিলেন, "বলিতে পার এ অশ্ব কা'র ?

"মহারাজ! এ অশ্ব, কুমার জ্যোতিঃসিংহের !"

"জ্যোতিঃসিংহ—কোন্ জ্যোতিঃসিংহ ?"

"স্বর্গীয় দুর্গাধিপতি প্রদ্যোৎসিংহের একমাত্র পুত্র জ্যোতিঃসিংহ। আকবর সাহের নববিজিত রাজবারার বর্ত্তমান প্রধান সেনাপতি জ্যোতিঃসিংহ। আপনি যাহার দুর্গ দখল করিয়া আজ মহারাজ গম্ভীর-সিংহ হইয়াছেন, সেই দুর্গের ন্যায্যাধিকারী জ্যোতিঃসিংহ।"

গম্ভীরসিংহের সেই ব্যাঘ্রবৎ ভীষণ চক্ষু অন্ধকারে জ্বলিয়া উঠিল। এই স্ত্রীলোক ভিতরের কথা জানিল কিরূপে ? তিনি ত্বরিতপদে সেই রমণীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "পাপীয়সি! প্রয়োজন হইলে গম্ভীরসিংহ এই নির্জ্জন বনে, স্ত্রী-রক্তে অসি কলঙ্কিত করিতে পারে।"

"তা অসম্ভব নয়। মহারাজ গম্ভীরসিংহ দুষ্কর্ম্মে ভয় পান না, তা এ অভাগিনী জানে। কিন্তু আমায় বধ করা অপেক্ষা দুই দণ্ড বাঁচিতে দিলে যে মহারাজের উপকার।"

গম্ভীরসিংহ মনে মনে ভাবিলেন, সত্যই ত, কি করিতেছিলাম! মিষ্টস্বরে বলিলেন, "রমণি! কিছু মনে করিও না। আমাকে রাজধর্ম্ম-পালনানুরোধে বড় সাবধানে চলিতে হয়। এখন জ্যোতিঃসিংহের দুর্গে প্রবেশের কারণ বলিতে পার? তিনি কি একক?"

"হাঁ, তিনি একক। সিংহশাবক কাহাকেও ভয় করে না।"

"তাঁহার দুর্গ-প্রবেশের কারণ কি?"

রমণী বলিল,—"মহারাজ! তাহাও বলিতেছি। কিন্তু তাহা শুনিবার পূর্ব্বে আপনাকে একটী প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। আপনি দেবতায় ভক্তি রাখেন? আপনার ইষ্টদেবী কল্যাণীর নামে শপথ করুন।"

"কি শপথ করিব?"

"বলুন, জ্যোতিঃসিংহের কোন অনিষ্ট করিবেন না।"

"তাহার দুর্গ-প্রবেশের কারণ না শুনিলে, বলিতে প্রতিশ্রুত হইতে পারিতেছি না।"

"তিনি শত্রুভাবে আপনার দুর্গে প্রবেশ করেন নাই। আপনার কন্যা অলকাকে তিনি ভালবাসেন। তাহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছেন। আপনিও ত কন্যার বিবাহের আয়োজন করিয়া আসিয়াছেন। জ্যোতিঃসিংহকে নিরাপদে দুর্গ হইতে বাহির হইতে দিন্। দুর্জ্জয়সিংহের সহিত আপনার কন্যার বিবাহ দিন্।"

"জ্যোতিঃসিংহ তোমার কে?"

"আমার বাল্যসখা। আপনার কন্যাকে না পাইলে এখনও তিনি আমাকে বিবাহ করিবেন।"

"আচ্ছা, প্রতিজ্ঞা করিলাম,—তাহার জীবনের অনিষ্ট করিব না। কিন্তু তোমাকেও সত্য বলিতে হইবে,—তুমি কে?"

"আমি অনীতা—"

"অ—নী—তা—অনীতা! পাপীয়সী! দূর হ!"

গম্ভীরসিংহের মনে সমস্ত কথা জাগিয়া উঠিল। সেই প্রদ্যোৎসিংহের সেনাপতিত্ব, সেই নূতন রাজ্ঞী, সেই অতীত-জীবনের কাহিনী। অনীতা তাঁহার কলঙ্কের জীবন্ত ইতিহাস। গম্ভীরসিংহ জানিতেন, অনীতা চিত্রার সলিলে বাল্যেই ডুবিয়াছে। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অনীতার অন্বেষণে আরও অগ্রসর হইলেন, কিন্তু তাহাকে আর দেখিতে পাইলেন না।

গম্ভীরসিংহ দুর্গ-প্রবেশ করিয়াই গুপ্ত প্রবেশ-পথে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, লৌহদ্বার শৃঙ্খলবদ্ধ, প্রহরী বসিয়া ঢুলিতেছে। দুর্গাধিপতি তাহাকে পদাঘাত করিয়া বলিলেন,—"নিমকহারাম! বল্, আজ কাহাকে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে দিয়াছিস্? কাল তোকে গাছে লট্‌কাইয়া পুরস্কার দিব।"

প্রহরী ভীত হইয়া বলিল, "মহারাজ! আমার দোষ নাই। এক প্রহরী তাহার আত্মীয়কে ভিতরে লইয়া গিয়াছে।"

"আচ্ছা, তারও তোর দশা হইবে।" গম্ভীরসিংহ, জ্যোতিঃসিংহের অনুসন্ধানে দুর্গমধ্যে লোক পাঠাইলেন।

জ্যোতিঃসিংহ রাজকুমারীর মহলে পৌঁছিতে পারেন নাই। পথিমধ্যেই বন্দী হইয়াছেন। তাঁহাকে গণেশমহলের কক্ষে স্থান দেওয়া হইয়াছে।

সেনাপতির মুখে এই সংবাদ পাইয়া, গম্ভীরসিংহ অনেকটা নিঃশঙ্ক হইলেন। বলিয়া দিলেন, "দেখিও,—আতিথ্য-সৎকারের যেন কোনরূপ ত্রুটী না হয়।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অতি প্রভাতে দুর্গাধিপতি গম্ভীরসিংহ ও তাঁহার ভাবী বৈবাহিক সুরতানসিংহ, নির্জ্জনকক্ষে বসিয়া গভীর মন্ত্রণায় নিযুক্ত। দুর্গাধিপতি বলিতেছেন,—"ব্যাপারটা আমি সহজ বুঝি না। প্রকাশ্যভাবে জ্যোতিঃ-

সিংহের কোন অনিষ্ট করা অসম্ভব! বাদসাহ তাঁহার রক্ষক। তাহা হইলে মহাবিপত্তি ঘটিবে। উহাকে এ অবস্থায় পাইয়াও আবার ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না।”

সুরতানসিংহ বনিয়াদী নহেন, নূতন সম্পত্তিশালী। তাঁহার এক-মাত্র পুত্র দুর্জ্জয়সিংহ। ধন তাঁহার যথেষ্ট,—এখন তিনি মানের প্রত্যাশী। আবার অন্যপক্ষে গম্ভীরসিংহ ধনের প্রত্যাশী। তাঁহার বিস্তর দায় দেনা। সুরতানসিংহ দেখিলেন, কোন উপায়ে জ্যোতিঃ-সিংহকে বিনাশ করিতে পারিলে, তাঁহার পথ প্রশস্ত হইবে।

তিনি কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন,—“আমার মতে একটা কাজ করিলে হয় না? জ্যোতিঃসিংহকে ডাকাইয়া দুই চারিটী কথা জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক। তাহাকে সহজে নিরস্ত করিতে পারিলে, অধিক কিছু করিতে হইবে না।”

দুর্গাধিপতি স্মরণ করিয়াছেন শুনিয়া, জ্যোতিঃসিংহ তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন।

জ্যোতিঃসিংহকে দেখিয়া দুর্গাধিপতি বলিলেন,—

“কুমার! কালরাত্রে কোন কষ্ট হয় নাইত?”

জ্যোতিঃসিংহ অভিবাদন করিয়া বলিলেন,—“আজ্ঞা না,—আপনার আতিথ্যে অতিশয় প্রীত হইয়াছি।”

দুর্গাধিপতি জ্যোতিঃসিংহকে আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন না। জ্যোতিঃসিংহ দেখিলেন, গম্ভীরসিংহের দক্ষিণে সুরতানসিংহ, বামে দুর্জ্জয়সিংহ। আর একখানি আসন শূন্য পড়িয়া আছে, তবুও তাহাতে তাঁহাকে বসিবার জন্য আহ্বান করা হইল না। তিনি কোন অংশেই পদমর্য্যাদায় দুর্গাধিপতির ন্যূন নহেন। এ অপমান ইচ্ছাকৃত, সুতরাং তিনি ইহা লক্ষ্য করিলেন।

দুর্গাধিপতি গম্ভীরস্বরে কহিলেন,—“তুমি উচ্চবংশীয় রাজপুত,

বাদসাহের সেনাপতি। চোরের ন্যায় আমার দুর্গে আসিয়াছিলে কেন? বাদসাহ তাঁহার নবীন সেনাপতিকে কি এরূপ কার্য্যের জন্য পুরস্কৃত করিবেন?"

বর্দ্ধিতরোষ সম্বরণ করিয়া জ্যোতিঃসিংহ বলিলেন,—"আপনার সহিত সমানভাবে উত্তর করিতে আমি নানা কারণে অনিচ্ছুক। আমি চোরের ন্যায় আপনার দুর্গে প্রবেশ করি নাই। আপনার কন্যার অনুমতি অনুসারে আসিয়াছি। তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবার নিমিত্ত আপনার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করি।"

"চোরের মত আমার গৃহে প্রবেশ করিলে, সে অনুমতি পাইবে না।"

"ধর্ম্ম-সমক্ষে আপনার কন্যা আমার পরিণীতা স্ত্রী, আমি ধর্ম্মতঃ তাঁহার পতি।"

গম্ভীরসিংহ, সুরতানসিংহের সহিত চুপি চুপি পরামর্শ করিয়া, জ্যোতিঃসিংহকে বলিলেন,—"কুমার—তুমি রাজপুত। আমাদের বংশে একটী প্রথা আছে, যদি অলকাকে বিবাহ করিতে চাও, সেটী পালন করিতে হইবে। দুর্গের উত্তরদিকে ঐ যে পাহাড়ের উপর ক্ষুদ্র গৃহ দেখিতে পাইতেছ, উহাকে "প্রমোদবাসর" বলে। ঐ গৃহে পাত্রপাত্রীর শুভ বিবাহ হয়। আজ ভাল দিন আছে। সমস্ত দিন উপবাসী থাক। অপরাহ্নে তুমি অলকাকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া পর্ব্বত বাহিয়া ঐ প্রমোদ-গৃহে উপস্থিত হইবে। তারপর আমি কন্যা সম্প্রদান করিব।"

জ্যোতিঃসিংহ তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিতে-ছিলেন যে, এই পরীক্ষায় কোন দুরভিসন্ধি আছে। কিন্তু নির্ভীক রাজপুত, মুহূর্ত্তের জন্য মনে শঙ্কার স্থান দিলেন না।

দিনমানে জ্যোতিঃসিংহ উপবাসী রহিলেন। বস্তুতঃই এইরূপ একটী প্রথা দুর্গাধিপতির পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কিন্তু কালধর্ম্মে

তাহা বড় একটা অনুষ্ঠিত হইত না। সুরতানসিংহের মনের ইচ্ছা,—"সমস্ত দিনের উপবাসের পর এক পূর্ণবয়স্কা যুবতীকে তুলিয়া লইয়া উচ্চ-পর্ব্বতে উঠা—বিশেষ কষ্টসাধ্য, এমন কি, অসম্ভব।" গম্ভীরসিংহের মনের ভাব আর একরূপ। জ্যোতিঃসিংহের প্রতি তাঁহার বৈরভাব আর ছিল না। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কুমার যদি অলকাকে প্রাপ্ত হন, তবে তাহাতে গম্ভীরসিংহের মনে বিশেষ আপত্তি ছিল না। যদি জ্যোতিঃসিংহ পরীক্ষায় অক্ষম হয়, তাহা হইলে তাঁহার অদৃষ্ট।

গণেশমহলের এক সুসজ্জিত কক্ষে, জ্যোতিঃসিংহ সুখময় পর্য্যঙ্কে সুষুপ্ত। কি এক সুখস্বপ্নে তাঁহার মুখ হর্ষোৎফুল্ল। এমন সময়ে অলকা গৃহে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জ্যোতিঃসিংহ জাগরিত হইলেন। দেখিলেন, শিয়রে বসিয়া—অলকা। তিনি আনন্দোৎফুল্ল-হৃদয়ে বলিলেন,—"অলকা! তোমার পিতা কি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুমতি দিয়াছেন?"

বস্তুতঃই গম্ভীরসিংহ—প্রত্যক্ষভাবেই, অতিথির পরিচর্য্যার জন্য অলকাকে আসিতে দিয়াছিলেন।

অলকা রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন,—"স্বামিন্!"—এই কথা বলিতে তাঁহার চক্ষে অশ্রু দেখা দিল।

জ্যোতিঃসিংহ শয্যা হইতে উঠিয়া, নিজ উত্তরীয়ে তাঁহার চক্ষের জল মুছাইয়া দিলেন। স্নেহপূর্ণচক্ষে বলিলেন,—"ছি! অলকা! এ শুভদিনে চক্ষের জল ফেলিতে আছে?"

জ্যোতিঃসিংহ অলকার পাশে বসিয়া গদ্‌গদস্বরে বলিলেন,—"অলকা! কেন অত চঞ্চল হইতেছ?"

অলকা বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন,—"আমাদের সমূহ বিপদ্। পাহাড়ে উঠিবার দুইটী পথ। একটী সোজা, অপরটী দীর্ঘ ও বক্র। সোজা পথটী সুরতানসিংহ রুদ্ধ করাইয়াছেন। আমায় লইয়া তোমায় বক্র-

পথেই উঠিতে হইবে। পথে বিশ্রামেরও নিয়ম নাই। জানি না, এমন কে বীর আছে?"

"কেন অলকা! তোমাকে তুলিয়া লইয়া যাইতে কি আমি ভার অনুভব করিব? ইহাতে ভাবনার কারণ কি?"

অলকা উত্তর করিল না, ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে উঠিয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

"এখনও ক্ষান্ত হও!"

"কেন অলকা, ভয় কিসের! এই দেখ, অর্দ্ধেক পথ অতিবাহিত করিলাম।"

"ভীষণ শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। অর্দ্ধেক পথ এখনও রহিয়াছে। এ পথ আরও দুর্গম। শ্রান্তিতে তোমার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। আমায় এই স্থানে নামাইয়া দাও।"

জ্যোতিসিংহ কথা কহিলেন না। কহিবার অবসরও নাই—তত সামর্থ্যও নাই।

নীচে দাঁড়াইয়া, দুর্গাধিপতি গম্ভীরসিংহ, সুরতানসিংহ, তাঁহার পুত্র দুর্জ্জয়সিংহ আর দুর্গাধিপতির অনুচরবর্গ। জ্যোতিঃসিংহ তাঁহাদের দিকে দৃষ্টি করিবামাত্র আবার নূতন উৎসাহ পাইলেন। অলকাকে লইয়া তিনি উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলেন। প্রায় সমস্ত পথ অতিবাহিত করিলেন। প্রমোদবাসরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার বাহুবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িল। অলকা বন্ধনমুক্ত হইয়া দাঁড়াইল। জ্যোতিঃসিংহ মূর্চ্ছিত হইয়া সেই স্থানে পতিত হইলেন।

অলকা অত্যন্ত ভীত হইয়া জ্যোতিঃসিংহের পার্শ্বে বসিয়া চৈতন্যোৎপাদনের জন্য যত্ন করিতে লাগিল। দেখিল, জ্যোতিঃসিংহের মুখ দিয়া

শোণিতধারা নির্গত হইতেছে। তাঁহার আর চেতনা হইল না। বক্ষের ভিতর শোণিতস্থালী বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

অলকা যখন বুঝিতে পারিল যে, জ্যোতিঃসিংহ জীবিত নাই—তখন সে উন্মাদিনীর মত হইয়া উঠিল। ধূলিলুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। সে করুণ ক্ষীণ ক্রন্দন-শব্দ শ্রবণ করিয়া গম্ভীরসিংহ, সুরতানসিংহ, দুর্জ্জয়সিংহ প্রভৃতি উপরে উঠিয়া আসিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া অলকার আশঙ্কা হইল যে, দুর্জ্জয়সিংহের সহিত বলপূর্ব্বক এইবার তাহার বিবাহ হইবে। ইহারা ষড়যন্ত্র করিয়া জ্যোতিঃসিংহকে প্রকারান্তরে হত্যা করিয়াছেন। পথ এখন সম্পূর্ণ মুক্ত। এইবার নিষ্ঠুর পিতা তাহাকে দুর্জ্জয়সিংহের হস্তে সমর্পণ করিবেন। এই বিশ্বাস ক্রমে দৃঢ়মূল হইল। অলকা মনে মনে ভাবিল "এখন উপায় ?"

উপায় কিছুই নাই। জগতে যাহার কেহই নাই, উপরে তাহার ভগবান্ আছেন। অলকা আশাপূর্ণমুখে, সজলনেত্রে, উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল—মেঘের উপর মেঘ! তাহার উপরে সুনীল অম্বর যেন তরঙ্গবিহীন—চাঞ্চল্যবিহীন সমুদ্রের ন্যায় স্থির। সেই নিথর নীলাকাশের এক উজ্জ্বল স্থানে—মণিময় সিংহাসনে বসিয়া জ্যোতিঃসিংহ। সেই জ্যোতির্ম্ময় মেঘরাজ্যে গিয়া—জ্যোতিঃসিংহের জ্যোতিঃ যেন আরও উজ্জ্বল হইয়াছে। সে মুখে যেন কলঙ্ক নাই—বিষাদ নাই, ক্লান্তি নাই, শোণিতধারা নাই। সে নেত্রে যেন আশা—সে দৃষ্টিতে যেন প্রেম, সে ওষ্ঠাধরে যেন সরল হাসি—সে হৃদয়ে যেন অনন্ত ভালবাসা। সেই অজ্ঞানিত রাজ্যে উজ্জ্বল সিংহাসনে বসিয়া, যেন জ্যোতিঃসিংহ হাস্যমুখে অঙ্গুলি হেলাইয়া আশ্বাস করিতেছে—"এস অলকা! ভয় কি ? আমি তোমার জন্য সিংহাসনের একাংশ শূন্য রাখিয়াছি। এখানে জ্বালা নাই, বিপদ নাই, আক্ষেপ নাই, নিরাশা

নাই, উৎপীড়ন নাই, কেবল চিরশান্তি,—কেবল অনন্ত প্রেম, কেবল ক্ষীরধারায় উৎসারিত—ভালবাসা। এখানে আসিতে পারিবে না কি ?"

অলকার মুখে—অত কষ্টেও ঈষৎ হাসি আসিল। নিরাশার ঘোর অন্ধকারে আলো দেখিলে যেমন হাসি ফুটিয়া উঠে—এ হাসি যেন তাহারই মত। হৃদয়েশ্বরের সে কাতর আহ্বান, আশ্বাসবাণী, অলকার মুখের বিষণ্ণতা একটু যেন মুছিয়া দিল। সহসা বক্ষমধ্যস্থ—শাণিত ছুরিকা, হৃদয়ের আমূল প্রোথিত করিয়া দিয়া অলকাসুন্দরী—হাসিমাখা মুখে স্বর্গে গিয়া স্বামীর পাশে বসিল। জ্যোতিঃসিংহের হৃদয়ের শোণিত-রাশির সহিত অলকার হৃদয়ের পবিত্র শোণিত মিশিল।

দুর্গাধিপতি—হায়! হায়! করিয়া উঠিলেন। কাজটা এত শীঘ্র হইয়া গেল যে, তিনি কোন কিছু করিবার অবসর পাইলেন না। তাঁহার পাপ-হৃদয়ে এখন ঘোর অনুশোচনা উপস্থিত হইল।

সংসারে অলকার মত তাঁর কেহই প্রিয় ছিল না। অলকাকে হারাইয়া দুর্গাধিপতি গম্ভীরসিংহ উন্মাদবৎ হইলেন। নিকটস্থ দুইজন শরীর-রক্ষীকে কঠোরস্বরে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"তোরা এই পাপিষ্ঠ সুলতানসিংহ ও তাহার হতভাগ্য পুত্র দুর্জ্জয়সিংহকে খণ্ড খণ্ড কর। ইহাদের প্রলোভনে ভুলিয়া আমার যথাসর্ব্বস্ব গেল।"

প্রহরীরা সেই দুই পাপিষ্ঠকে বন্দী করিল। দুর্গাধিপতি—নির্নিমেষ-নেত্রে, সেই শব্দমাত্রহীন, উপত্যকাবক্ষশায়িত রুধিরাক্ত-দেহ, জ্যোতিঃ-সিংহ ও তাহার পার্শ্বে শোণিতাপ্লুত—অলকার মৃতদেহ দেখিতে লাগিলেন। সহসা—গম্ভীরস্বরে পশ্চাৎ হইতে কে যেন ডাকিল—"গম্ভীরসিংহ"।

কে যেন আরও পরুষস্বরে সেই উপত্যকা মথিত করিয়া, তাহার প্রতিধ্বনি করিল—"গম্ভীরসিংহ"!

হতভাগ্য দুর্গাধিপতি পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন, এক দীর্ঘকায়

সন্ন্যাসী,—আর তাহার পার্শ্বে—এক সৌম্যমূর্ত্তি বীরপুরুষ। সেই বীরপুরুষ—গম্ভীরসিংহের প্রতি কোপকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া রুষ্টস্বরে বলিলেন,—"পাপিষ্ঠ! আমার জ্যোতিঃসিংহ কই?"

দুর্গাধিপতি—নিশ্চল, নির্ব্বাক্, সম্পূর্ণ শক্তিহীন। তাহার শরীর থর থর কাঁপিতেছে—দৃষ্টি উদাস, প্রাণ শূন্য—হৃদয় বাত্যাতাড়িত সমুদ্রবৎ—চক্ষু অশ্রুহীন!

হতভাগ্য গম্ভীরসিংহ সহসা সেই সৌম্যমূর্ত্তি বীরপুরুষের পদতলে নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িল। কম্পিতস্বরে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল,—"জাঁহাপনা! এই দেখুন, আপনার চিরপ্রিয় সেনাপতি জ্যোতিঃসিংহ—আর এই আমার অলকা। হায়! আপনি যদি আর একটু আগে আসিতেন!"

সেই সৌম্যমূর্ত্তি পুরুষ আর কেহই নহেন, স্বয়ং আক্‌বরসাহ! অনীতা, সন্ন্যাসীকে জ্যোতিঃসিংহের বিপদবার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়াছিল। তিনিই অন্য উপায় না দেখিয়া, বাদসাহকে সংবাদ দিয়া সঙ্গে আনিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! তাঁহাদের আসিবার পূর্ব্বে সব ফুরাইল।

আক্‌বরসাহ সেই পাপিষ্ঠ গম্ভীরসিংহের মুখে সব কথাই শুনিলেন। নিকটে কয়েকজন মোগল শরীররক্ষী অবস্থান করিতেছিল। বাদসাহ রুষ্টস্বরে আদেশ করিলেন,—"ইহাদের সকলকে বন্দী কর। আমার সেনাপতিকে যে হত্যা করিয়াছে—নিজের কন্যাকে যে নিষ্ঠুরভাবে নষ্ট করিয়াছে—তাহার শাস্তির পরিমাণ এখন করিতে পারি না। বন্দীদের আমার শিবিরে প্রেরণ কর। কাল ইহার বিচার করিব।"

সেনাপতি আসফ খাঁ, বাদসাহের আদেশ পালন করিতে বিলম্ব করিল না। বাদসাহ, পুনরায় তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "আসফ খাঁ! তোমার উপর আরও একটী আদেশ আছে। কাল সূর্য্যাস্তের মধ্যে এই দুরাচার গম্ভীরসিংহের দুর্গ সমভূমি হইবে। দুর্গের

সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া যে লভ্য হইবে, তাহাতে এই পর্ব্বত-শিখরে একটী মহাল নির্ম্মাণ করিতে হইবে। সেই মহালের নাম রাখিব "পান্না-মহাল।" পান্না-মহালের রত্নময় কক্ষে এই প্রেমিক-যুগলের প্রস্তরমূর্ত্তি রক্ষিত হইবে।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। আকাশে গোধূলির রেখা মুছিয়াছে। সূর্য্য সে দিনের মত নীলাকাশের প্রান্তে ডুবিয়াছেন। বাদসাহ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীকে বলিলেন,—"চলুন! আর এখানে থাকিয়া এ বিষাদ-দৃশ্য দেখিয়া কি হইবে! জ্যোতিঃসিংহকে আমি বড় স্নেহ করিতাম। তাহার সুকুমার দেহে, যুদ্ধ-বিপ্লবে সামান্য আঘাত লাগিলে আমি ব্যথিত হইতাম। সে দেহ চিতাভস্মে পরিণত হইবে, ইহা দেখিতে পারিব না।"

ক্ষণকালমধ্যে সেই নির্ম্মল উপত্যকা মহাশ্মশানে পরিণত হইল। চিতা-বহ্নি সতেজে জ্বলিয়া উঠিল। দিক্‌বলয় ঘোর লোহিতবর্ণে রঞ্জিত হইল। লেলিহান অগ্নিশিখা মহাগর্জ্জনে সেই দুই সুন্দর নর নারীর দেহ শ্মশান-ভস্মে পরিণত করিয়া দিল।

তখনও চিতা নির্ব্বাপিত হয় নাই। তখনও অঙ্গাররাশি ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে। তখনও স্বল্পধূম কুণ্ডলাকারে উঠিয়া, নীলাকাশের দিকে ছুটিতেছে। এই ভীষণ সময়ে এক স্বর্ণকলস হস্তে লইয়া, এক গৈরিক-পরিহিতা ভৈরবীমূর্ত্তি তথায় উপস্থিত হইল। একদৃষ্টে সেই অর্দ্ধ-নির্ব্বাপিত চিতার দিকে সে উন্মাদের মত চাহিয়া রহিল। সহসা,—সেই দুগ্ধভরা কলস হইতে পবিত্র ক্ষীরধারায় সেই পবিত্র চিতার শেষস্ফুলিঙ্গ নির্ব্বাপিত করিয়া দিল।

তাহার মূর্ত্তি,—স্থির, মুখে বাক্য নাই।—অঙ্গে চাঞ্চল্য নাই। হৃদয়ে কাতরতা নাই। সে ধীরে ধীরে বলিল,—"সাধ্বি! অলকা! তুমিই রমণীকুলে ধন্যা! তুমি এখন বৈজয়ন্তে,—স্বামীর পার্শ্বে সোণার সিংহাসনে। তুমি জ্বলিয়া জ্বলিয়া চিরশান্তি লাভ করিলে। আমি,—এখনও জীবন্তে জ্বলিতেছি। যাও সাধ্বি, সেই অমরধামে,—চিরপ্রেম-রাজ্যে! তোমাদের আর যেন কখনও বিচ্ছেদ না হয়।"

উন্মাদিনী, অশ্রুশূন্যনেত্রে আবার বলিতে লাগিল, "হৃদয়েশ্বর!

জ্যোতিঃসিংহ! প্রাণ খুলিয়া কখনও তোমায় "হৃদয়েশ্বর" বলিয়া এত উচ্চস্বরে ডাকি নাই। আজ ডাকিলাম। জীবন্তে তোমায় পাই নাই।—না মরিলে পাইব না,—তাহাও বুঝিতেছি। অলকা মরিতে সাহস করিয়াছিল,—তাই সে তোমায় পাইয়াছে। আমিও মরিব।"

সেই উপত্যকার সর্ব্বোচ্চ-শিখরে দাঁড়াইয়া, ভৈরবী অনীতা শ্যামল শান্ত প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিল। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। দারুণ নরকদৃশ্য তাহার চোখে ফুটিয়া উঠিল। সে ভয়ে আবার উপরে দৃষ্টিপাত করিল। এবার দেখিল, যেন অলকা ও জ্যোতিঃসিংহ সেই নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়া যুগলমূর্ত্তিতে, মেঘগুলি পদদলিত করিয়া, ধীরগতিতে ভ্রমণ করিতেছেন। রাঙ্গা, কাল, ধূম্র, হরিত, পাটল,—কত মেঘ তাহাদের চরণ চুম্বন করিতেছে। কত উজ্জ্বল তারকা তাহাদের আশে পাশে ফুটিয়াছে। অলকা যেন মেঘের মধ্য হইতে তাহাকে বলিতেছে,—দেখ, জ্যোতিঃসিংহ আমার জন্মজন্মান্তরের জন্য,—অনন্তকালের জন্য,—আমার। তুই এখানে আসিতে পারিলি না। চিরদিনই তোকে জ্বলিতে হইবে। আর কতদিন এমন করিয়া জ্বলিবি?"

নীচে স্বল্পতরঙ্গময়ী, কৃষ্ণসলিলা চিত্রার মৃদুমন্দ করুণগীতি। অনীতা অন্ধকারের মধ্য দিয়া দেখিল, চঞ্চল চিত্রা যেন—ফেনময় অঙ্গুলিসঙ্কেতে ডাকিতেছে, আর বলিতেছে, "আর কতদিন জ্বলিবি অনীতা?"

এত সহানুভূতিপূর্ণ আহ্বান অনীতা উপেক্ষা করিতে পারিল না। তাহার প্রাণের ভিতর তখন নিরাশার কালাগ্নি জ্বলিতেছে। বুক যেন ফাটিয়া যাইবার মত হইয়াছে। বড় জ্বালা! সে জ্বালা জুড়াইবার নয়। উন্মাদিনী অনীতা সেই উচ্চ-শিখর হইতে নীচে সুকৃষ্ণ সলিলরাশিপূর্ণ হ্রদগর্ত্তে পতিত হইল।

পরদিন এক দরিদ্র কৃষক—অনীতার মৃতদেহ হ্রদের উপর ভাসিতেছে দেখিতে পাইল। অভাগিনী মরিল বটে,—কিন্তু মরণেও জ্যোতিঃসিংহকে পাইল না। তাহার পক্ষে বৈজয়ন্তের দ্বার রুদ্ধ।

এই "পান্না-মহলের" করুণ-কাহিনী লোকে অনেক দিন ধরিয়া মনে রাখিয়াছিল।

হীরক-বলয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রলয়ের কল্লোলিত উচ্ছ্বাস বুকে লইয়া, বিশালকায় দামোদর, ঘনান্ধকারের মধ্য দিয়া—উন্মাদের মত কে জানে কোথায় ছুটিয়া চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ফেন-বিমণ্ডিত আকাশপ্রমাণ তরঙ্গরাজির ভীষণ গর্জ্জন। সেই ভীষণ গর্জ্জন শুনিয়া, দামোদরের সেই রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া—যেন সমস্ত জড়-প্রকৃতি ভয়ে নিস্তব্ধ।

বারি-প্রবাহ-পরিধৌত—সৈকত-ভূমি চুম্বন করিয়া, এক ঘন পল্লব-ময় আম্র-কানন। রাজ্যের অন্ধকার সেই ঘনসন্নিবেশিত বিটপীরাজির পাতার নীচে, শাখার অন্তরালে, বৃক্ষাবলম্বী দুর্ভেদ্য গুল্মরাজির আশে পাশে, খদ্যোৎখচিত হইয়া জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। এই আম্র-কাননের উপান্তে এক শুভ্র অট্টালিকা।

বিরাট্ প্রকৃতি শব্দশূন্য। সব যেন গভীর নিদ্রার ঘোর মায়ায় সমাচ্ছন্ন। জাগিয়া আছে.—কেবল মৃদু-প্রবাহিত নৈশসমীরণ—বিটপী-শীর্ষে পুঞ্জীকৃত খদ্যোতের রাশি—অন্ধকারে আধ-ফুটন্ত ফুলকলিকা—আর সেই জগতের আদি হইতে চিরনিদ্রাহীন—বিচিত্র নীলাকাশের দীপ্তিময় তারকার রাশি।

নদীবক্ষে নৌকা নাই। অত রাত্রে কে পার হইবে? মুসাফেরখানার বিস্তৃত দ্বার অর্গলাবদ্ধ। গৃহস্থের বাটীর ক্ষুদ্র কক্ষের দীপালোক নির্ব্বাপিত। রাজপথ পান্থ-পরিশূন্য। কেবল আশ্রয়হীন দুই চারিটা কুক্কুর, সেই অন্ধকারে মাঝে মাঝে চীৎকার করিতেছিল।

এই গভীর নিশীথে পূর্ব্বকথিত আম্রকাননান্তরালবর্ত্তী বিস্তৃত সৌধের

এক ক্ষুদ্র কক্ষে দীপ জ্বলিতেছে। এক পরিচারিকা, সেই স্তিমিত দীপালোকে বসিয়া, নিজের মনের মত জিনিস-পত্রে পরিপূর্ণ করিয়া, কতকগুলি গাঁঠরি বাঁধিয়া সাজাইয়া রাখিতেছে। আর এক এক বার দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে।

এক দীর্ঘাঙ্গী, মলিনমুখী—গৌরবর্ণা সুন্দরী, সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। চারিদিকে সকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়া, একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—

"মরজানা"—

"কেন বিবিসাহেবা ?"

"তোর কাজ শেষ হইল কি ? রাত্রি অনেক হইয়াছে,—বৃথা দেরী কেন—ও সব কি ?"

"কতকগুলি গাঁঠরি।"

সেই অনিন্দ্যসুন্দরী সেগুলির দিকে ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"এ সব কেন ?"

মরজানা বলিল, "যাহা লওয়া আবশ্যক বুঝিয়াছি, সব লইয়াছি।"

"এতে আছে কি ?"

"মণি, মুক্তা, জহরতের গহনা, সেই কয়খানা জড়োয়া কাজ-করা পেশোয়াজ—সেই মতি-বসান আঙ্গরাখা—খানকত রূপার বাসন"—

"তোর মাথা আর মুণ্ড ! দূর করিয়া এগুলা দামোদরের জলে ফেলিয়া দে। একদিন সাধ করিয়া এ সব জিনিস করিয়াছিলাম,—এখন সখ্ ফুরাইয়াছে। পোড়ারমুখি ! আমি কি বাঙ্গালির মেয়ের মত শ্বশুরঘর করিতে যাইতেছি যে, যত রাজ্যের জিনিস সঙ্গে লইয়াছিস্ ?"

বাঁদী তাড়া খাইয়া একটু আশ্চর্য্য হইল। বলিল,—

"এ জিনিসগুলা আগ্রায় অনেক কাজে লাগিবে। আবশ্যক না বুঝিয়া কি বাঁধিয়াছি ?"

"কে তোকে বলিল,—আমি আগরায় যাইব ? আগরায় যাইব ত গোপনে যাইব কেন ?"

"নৌকা রাখিতে বলিলেন কেন ?"

"দামোদর পার হইব বলিয়া—"

"পার হইয়া কোথায় যাইবেন ?"

"যে দিকে দুই চক্ষু যায়—" কর্ত্রী আর বলিতে পারিলেন না,—চক্ষে জল আসিল।

মরজানা অনেক দিনের পুরাণ বাঁদী। একটু মাথায় চড়িয়া কথা কওয়াটা তার কেমন স্বভাবের দোষ ছিল। সে রাগতভাবে বলিল,—"আগরায়ও যাইবেন না, এখানেও থাকিবেন না,—এ জগতে আপনার স্থান কোথায় ? মহল ছাড়িলেই নিরাশ্রয় হইলেন। পথে পেট চলা ত চাই।

কর্ত্রী বিষাদমাখাস্বরে বলিলেন,—"যাঁহার বিশালরাজ্যে একটা পিপীলিকাও উপবাস করে না,—তিনিই আহার দিবেন মরজানা ! কিছু না জোটে—ভিক্ষা করিতে না পারি—পথে অনাহারে মরিয়া পড়িয়া থাকিব।"

বাঁদী এবার আরও রাগিল,—বলিল, "আপনার সব বিপরীত। এই দুনিয়ায় আমাদের মত লোকের স্থান যথেষ্ট—আপনার হিসাবে নয়। আগরায় সোণা-বসান, মতি-বাঁধান সিংহাসনে বসিয়া পা দোলাইবার কল্পনা অপেক্ষা, পথে অনাহারে মরা বেশ সুখের কথা !"

কর্ত্রী বলিলেন,—"তোর মন না সরে, এই সব ঐশ্বর্য্য তোকে দিয়া গেলাম, ভোগ করিস্। আমি যাইব।"

বাঁদী বরাবর আদরে কাটাইয়াছে। এই তিরস্কারে তাহার চোখে দুই ফোঁটা জল আসিয়া হাজির হইল। মরজানা রুদ্ধস্বরে বলিল,—"নিতান্ত না শুনেন, চলুন। কিন্তু দেখিবেন, শেষে ফিরিতে হইবে"—

কক্ষের দীপ নিভাইয়া, দুইজনে সেই অন্ধকারবেষ্টিত প্রকাণ্ড পুরীর দরদালান অতিক্রম করিয়া, সোপানশ্রেণী অবলম্বনে বাহিরে আসিলেন।

উপরে উন্মুক্ত—সুনীল আকাশ। সেই আকাশে অসংখ্য উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের ন্যায় জলন্ত নক্ষত্র। আশে পাশে পুষ্পকাননের আধফুটন্ত কলিকাগুলির স্বল্প-সুগন্ধ-মিশ্রিত মুক্ত বাতাস। বামে, দক্ষিণে, উর্দ্ধে; অধেঃ ঘোর অন্ধকার। সেই অন্ধকারশ্রেণী মথিত করিয়া, দুইজনে একবস্ত্রে পুরীত্যাগ করিলেন। এক মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস—সেই আকুল হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে উঠিয়া শূন্যে মিশিয়া গেল। হায়! ভাগ্য!

কর্ত্রী অগ্রে—সঙ্গিনী পশ্চাতে। উভয়েই নির্ব্বাক্। বাগান ঘুরিয়া তিন চা'র রশি পথ গেলে নদীতীর। কর্ত্রী দেখিলেন, তাহার বস্ত্রাঞ্চলে টান পড়িয়াছে। বুঝিলেন, সেই অন্ধকারে পোড়ারমুখী মরজানা ভয় পাইয়াছে। বলিলেন,—"মরজানা! আমার পার্শ্বে আয়। আর কত দূর?"

মরজানা অস্ফুটস্বরে বলিল,—"এই বাঁকটা ঘুরিলেই নদীতীর। বড় ভয় হইতেছে—বিবিসাহেব! শুষ্ক পত্রের উপর এইমাত্র যেন পদশব্দ শুনিলাম।"

"তোর মাথা—শিয়াল কুকুর তোর জন্য কি রাত্রে পথ চলিবে না? শীঘ্র চলিয়া আয়।"

উভয়ে আসিয়া সেই অন্ধকারে নদীসৈকতে দাঁড়াইলেন। অদূরে এক নৌকায় আলো জ্বলিতেছিল। মরজানা বলিল,—"এখনও ভাবিবার অবসর আছে। দুই জনেই স্ত্রীলোক, রক্ষীমাত্র সঙ্গে লইলাম না। পথের মধ্যে আপনার রূপই যে শত্রু হইবে বিবি?"

"তার উপায় করিয়াছি মরজানা! দিনে পথ চলিব না, রাত্রে চলিব। তাহাতেও বিপদ্ ঘটে—বিষ লইয়াছি ভয় কি?"

চিরজন্মের জন্য অশ্রুপূর্ণচোখে—একবার সেই চিরপ্রিয় বাসগৃহের

দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া—এক হৃদয়ভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, কর্ত্রী ঠাকুরাণী বলিলেন,—"আয় মরজানা! জল ভাঙ্গিয়াই নৌকায় উঠি।"

কিন্তু নৌকায় আর উঠা হইল না। এক অলৌকিক প্রতিবন্ধকে উভয়েরই গতিরোধ হইল। সুন্দরীর সেই রক্তোৎফুল্ল সুন্দর চরণতল, দামোদর-তট-ভূমির কর্দ্দমমাখা হইয়া গতিশূন্য হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দুইজন সশস্ত্র সৈনিকপুরুষ, মশালহস্তে, ক্ষিপ্রগতিতে নৌকা হইতে নামিয়া আসিয়া, তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল। দুইজনেই যুগপৎ বলিয়া উঠিল—"বাদসাহ দীর্ঘজীবি হউন। বেগম সাহেবের জয় হউক।"

বাদসাহ! বেগম! এ সব কি কথা! সেই কর্দ্দমবিলিপ্ত—রক্তরাগময়—গতিশূন্য পা দুখানি সরাইয়া, একটু দূরে দাঁড়াইয়া কর্ত্রী মেহেরউন্নিসা একবার সেই সৈনিকদের প্রতি কঠোর দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। পদতলে সহসা ভীমকায় কৃষ্ণসর্প দেখিলে পান্থ যেমন চমকিত হয়, মেহেরউন্নিসা সেইরূপ চমকিয়া উঠিলেন। তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে সবই বুঝিলেন। বাদসাহ তাঁহাকে আগরায় লইয়া যাইবার জন্য ফৌজ পাঠাইয়াছেন,—শীঘ্র তাহারা বর্দ্ধমান পৌছিবে, এ সংবাদ পূর্ব্বে পাইয়াই মেহের পলায়নের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার সে চেষ্টা এখন ব্যর্থ হইল।

সেই দুইজন সৈনিক-পুরুষের মধ্যে একজন পক্ককেশ বৃদ্ধ—অপর জন যুবক। মেহের পুরুষকণ্ঠে সেই বৃদ্ধকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"কে তোমরা—আমার নৌকায় কেন?"

মশালের তীব্র আলোক, সেই অনিন্দ্যসুন্দরীর মুখের উপর পড়িয়াছে। সেই উন্নত গ্রীবাভঙ্গী ও তেজোময় বাক্য-বিন্যাস শুনিয়া, যুবকসেনাপতির বুক কাঁপিয়া উঠিল।

বৃদ্ধ কিন্তু হটিল না। বলিল,—"আমরা দিল্লীশ্বরের সেনাপতি, আম-

রাই আপনার নৌকা দখল করিয়াছি। গোস্তাখি মাপ করিবেন, আমরা আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র।

"কার হুকুমে আমার নৌকা দখল করিলে ?"

"দিল্লীশ্বরের।"

"তোমাদের দিল্লীশ্বর ত বেশ! নিঃসহায় ভদ্রপরিবারের অন্দরমহলে তাহাদের নৌকা দখল করিতে পাঠাইয়া অতি উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছেন।"

তীরস্কারটা বড় তীব্র। রহমৎ—বৃদ্ধ, সব বুঝিয়া চুপ করিয়া রহিল। মেহের, রহমৎকে লক্ষ্য করিয়া পুনরায় বলিলেন,—"পোষাক দেখিয়া, হাতিয়ার দেখিয়া, আপনাকে একজন উচ্চপদবীর সেনাপতি বোধ হইতেছে। আপনি চোরের মত আমার অন্তঃপুরে আসিলেন কেন ?"

"দিল্লীশ্বরের হুকুম।"

"বদ্‌বখত—বে-আদব্! এই কুৎসিত আদেশ পালন করিতে, সেনাপতি হইয়া তোমার লজ্জা বোধ হইল না ? ধিক্ তোমায়!"

বৃদ্ধ সেনানী রহমৎ স্থিরভাবে উত্তর করিল,—"যাহা বলিবেন, বিবিসাহেবা, সবই সহ্য করিব! কিন্তু আমার অপরাধ কি ?"

মেহের পরুষভাবে বলিলেন,—"আদেশপালনে কি একটা বিধি নাই—ন্যায় অন্যায় বিবেচনা নাই ? বাদসাহ কি তোমায় চোরের ন্যায় আমার অন্দর-মহলে আসিতে বলিয়া দিয়াছেন ? খাঁ-সাহেবের শতাধিক প্রহরী এখনও এই পুরীর মধ্যে নিদ্রিত। আদেশ পাইলে তাহারা তোমাদের খণ্ড খণ্ড করিবে।"

রহমৎ বলিল,—"মরিবার জন্য আমরা ভয় করি না। এই আম্র-কাননের মধ্যেও চারিশত সৈনিক নীরবে শুইয়া আছে। আমরা মরিলে, নূতন সেনাপতি লইয়া তাহারা সের-সাহেবের প্রহরীদের বাধা দিবে।"

মেহেরউন্নিসা একবারে বুকভাঙ্গা হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহার ন্যায় সাহসী রমণীর পক্ষে এরূপ বিপদ্ অতি সামান্য। তিনি নিজের অবস্থা তৎক্ষণাৎ বুঝিয়া লইলেন। স্থিরস্বরে বলিলেন,—"তোমার নাম কি?"

"এ অধানের নাম রহমৎ খাঁ—আমিই প্রধান সেনাপতি!"

মেহের, অপেক্ষাকৃত কোমলকণ্ঠে বলিলেন,—"রহমৎ! দিল্লীশ্বর কি আমায় বন্দিনী করিয়া লইয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন?"

"অসম্ভব! তিনি আপনাকে সম্রাজ্ঞীর ন্যায় লইয়া যাইতে বলিয়াছেন।"

"তবে তোমরা আমার পুরী বেষ্টন করিলে কেন?"

"আমরা পৌঁছিবামাত্রই, গোয়েন্দার মুখে সংবাদ পাইলাম, আপনি আজই বর্দ্ধমান ত্যাগ করিবেন। দৈবকারণে আমাদের একটু বিলম্ব হইয়াছে। কিন্তু আপনি চলিয়া গেলে আমাদের মাথা যাইত।"

মেহেরউন্নিসা স্থিরচিত্তে কি ভাবিলেন। বলিলেন, "রহমৎ! দূরে চল,—একটা কথা বলিব।"

তিনি অগ্রে অগ্রে চলিলেন,—রহমৎ তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। কিছু দূরে আসিয়া, সেই তরঙ্গায়িত নদীকূলে দুইজনেই স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। মেহেরউন্নিসা গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"সেনাপতি!"

"আজ্ঞা করুন।"

"আমি যদি না যাই—"

"আমরা পুরী বেষ্টন করিয়া থাকিব। বাদসাহকে সওয়ার ডাকে খপর দিব। যেরূপ আদেশ আসে, তাহাই করিব।"

মেহেরউন্নিসা হটিলেন না। বলিলেন,—"তুমি ত প্রধান সেনাপতি, কয় হাজারী?"

"হাজারওয়ালা।"

"বেতন পাঁচশত দিনার, কেমন ?"

"অনুমতি করুন।"

"আমি তোমায় দশহাজার আস্‌রফি দিব। আমার মণি-মুক্তা যা আছে,—সব দিব। তোমায় আমীর করিয়া দিব। আমায় ছাড়িয়া দাও।"

এ করুণ প্রার্থনায় রহমতের হৃদয় ব্যথিত হইল। সে সেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি-শালিনী রমণীর মনের অভিপ্রায় বুঝিল। বৃদ্ধ, অবশেষে কহিল,—"বাদশাহকে কি বলিব ?"

"বলিবে,—তাহাকে ধরিয়াছিলাম। পথে সে বিষ খাইয়াছে। তাঞ্জাম শুদ্ধ শবদেহ দামোদরের জলে বিসর্জ্জন করিয়াছি।"

রহমৎ বলিল,—"মা ! আপনি দিল্লীশ্বরকে জানেন না। তিনি এ কথা বিশ্বাস করিবেন না। আমার জানবাচ্চা কুত্তার মুখে যাইবে। আর এক কথা,—দিল্লীশ্বরের সেনাপতিরা এখনও বিশ্বাসঘাতক হইতে শিখে নাই। যদি আপনাকে ছাড়িতেই হয়—বীরের ন্যায়—সেনাপতির ন্যায় ছাড়িয়া দিব। আপনার জন্য নিজে মরিব ; কিন্তু বাদসাহকে একবার না জানাইয়া ছাড়িতে পারিব না।"

মেহের প্রমাদ গণিলেন। দারুণ উত্তেজনায় তাঁহার কণ্ঠ শুকাইয়া আসিতেছিল। নূতন সংকল্প আঁটিয়া বলিলেন,—"বাদসা তোমার কথা বিশ্বাস না করিতে পারেন,—কিন্তু,—আমার কথা ত বিশ্বাস করিবেন। আমি গিয়া বলিব,—জাঁহাপনা ! আপনার বিশ্বস্ত সেনাপতিরা পথে আমার ইজ্জত নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।"

রহমতের মুখ শুকাইল। কিন্তু সে সেনাপতিত্ব করিয়া চুল পাকাই-য়াছে। হটিল না,—বলিল,—"না হয় আমি মরিব। আপনি যদি অত বড় একটা মিথ্যা কথা—অত বড় একটা কলঙ্ক—আমার এই পক্ক-কেশের উপর চাপাইয়া দেন,—না হয় আপনার সন্তোষের জন্য মরি-

লাম। কিন্তু—এ দুনিয়ার বাদসারও বাদসা আছেন। বিচার তাঁহার কাছে। জাহান্নমে ত যাইতে হইবে না।"

মৈত্রী, ভয়, করুণা,—সবই ভাসিয়া গেল। বৃদ্ধ রহমৎ খাঁর কাছে বুদ্ধিমতী মেহেরউন্নিসা পরাস্ত হইলেন। হায়! আর ত উপায় নাই, কি হইবে!

অনেক ভাবিয়া,—মেহের প্রভুত্বসূচক-কণ্ঠে বলিলেন,—"সেনাপতি! সামান্য দীন প্রজা,—বিনা পরোয়ানায় হাজির হয় না। আমি সম্রাজ্ঞী হইতে যাইতেছি, আমার পরোয়ানা কই?"

রহমতের মুখমণ্ডল চিন্তারেখান্বিত হইল। জাঁহাগীর বাদসা, মেহেরের নামে পরোয়ানা দিতে সাহসী হন নাই। ব্যাপারটা বড় রূঢ়, অপ্রেমিকের মত হইয়া পড়ে। পরোয়ানা ছিল সেনাপতির উপর। তাহাতে লেখা ছিল,—"সম্মানের সহিত সের আফগানের বিধবাকে আগরায় আনিবে।" রহমৎ তাই ভাবিতেছিল।

রহমৎ পাগড়ীর ভিতর হইতে একখণ্ড বাদসাহী পাঞ্জাচিহ্নিত লাল কাগজ বাহির করিয়া মেহেরের হস্তে দিল। মেহের, পাঠান্তে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। চঞ্চল বাতাসের মধ্য দিয়া সেখানা দামোদরের কর্দ্দমাক্ত তটের উপর পড়িল। তিনি গম্ভীরভাবে রহমৎকে বলিলেন,—"এ ত তোমার নামে পরোয়ানা। যতদিন না আমার আহ্বানপত্র আসিতেছে, ততদিন আমি রাজধানীতে যাইতেছি না।"

রহমৎ বুঝিলেন, কেবল প্রকারান্তরে বেগম সাহেব সময় লইতেছেন। এ যুক্তির উপর কথা নাই। এবার রহমৎ, এই তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী রমণীর নিকট পরাজিত হইলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন,—"যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, তাহাই হইবে। এই রাত্রেই সওয়ার ডাক করিব। আদেশ আসিলে আপনাকে লইয়া যাইব। আপনি অন্তঃপুরে যান। এ অধমের,—দাসানুদাসের গোস্তাখি মাপ করিবেন।" পুরী-প্রবেশ করিয়া

যাহা দেখিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবেন না। আপনার মহল,—স্ত্রী-প্রহরী দ্বারা সুরক্ষিত করিয়াছি।”

মেহের অগত্যা পুরীমধ্যে ফিরিলেন। মনে ভাবিলেন,—বৃদ্ধ বড় হুঁসিয়ার। বাঁদীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—“মরজানা! তোর কথাই ফলিল।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পুরী-প্রবেশ করিয়া, মেহেরউন্নিসা অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন। দেখিলেন, সেই রাত্রে জলন্ত বর্ত্তিকা লইয়া, প্রহরিণীগণ তাঁহার পুরীর চারিদিক রক্ষা করিতেছে। তাহারা রমণী হইয়াও হাতিয়ার খুলিয়া পুরুষের মত বেড়াইতেছে। মেহের বুঝিলেন, দিল্লীর বাদসা অপেক্ষা এই বৃদ্ধ সেনাপতি দেখিতেছি,—খুব হুঁসিয়ার। বাদসাহ তাঁহার মন অধিকার করিবার আগে, সেনাপতি শরীর দখল করিয়াছেন।

রাত্রি তখন শেষ যাম। আকাশের তারাগুলা অনেকটা ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল। শীতল প্রভাত-বায়ুতে, দামোদরের চঞ্চল-বক্ষ শান্তভাব ধারণ করিতেছিল। বাগানের মধ্যে রজনীগন্ধ, যূথী, নাগকেশর, বেলা প্রভৃতি ফুলগুলা, সেই অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত অবস্থাতেও শীতল বাতাসকে সুগন্ধে ভরপুর করিয়া দিতেছিল। দুই একটা পাখী জাগিয়া উঠিয়া, মিষ্টরবে প্রভাতী আরম্ভ করিয়াছিল। মেহের শয্যা আশ্রয় করিলেন বটে, কিন্তু নিদ্রার পরিবর্ত্তে স্বপ্নময় তন্দ্রাই তাঁহার মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল।

প্রভাতে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, মেহের সর্ব্বাগ্রে মরজানাকে ডাকাইলেন। মরজানা আসিয়া ম্লানমুখে সম্মুখে দাঁড়াইল। গত রাত্রের ঘটনাটা তাহার স্বপ্নবৎ বোধ হইয়াছিল। তারপর পুরীর মধ্যে তাতারণীদের ভীমমূর্ত্তি, উন্মুক্ত কৃপাণ দেখিয়া, তাহার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল। সে তখন ভাবিতেছিল,—পলায়নই এর অপেক্ষা ভাল

ছিল। একটু আগে গেলেই এ গ্রহ ঘটিত না। সে মলিন মুখে বলিল, "কি হুকুম বিবিসাহেবা ?"

"একটা কাজ করিতে হইবে। একবার পাল্কী লইয়া কাটোয়ায় যা।"

"মতিবিবির কাছে ? কিন্তু তিনি এ পাহারার কঠোরতার মধ্যে আসিবেন কেন ?"

"সে ভার আমার। এই নে দশ আস্‌রফি। তোর পাথেয় ও পুরস্কার।"

সে চলিয়া গেল। মতি—রাজা গজপতিসিংহের মহিষী। রাজা সাহেব কাটোয়ার প্রধান কিল্লাদার। মোগলের নিমকভোগী। মতিয়া, মেহেরের প্রিয়সখী। এ বিপদে তাহার সহিত মন্ত্রণার বিশেষ আবশ্যক।

মেহের একটা ক্ষুদ্র ঘণ্টা বাজাইলেন। ঘণ্টার শব্দ শেষ হইতে না হইতে, এক প্রহরিণী আসিয়া সেলাম জানাইল। বলিল,—"হুকুম কি বেগমসাহেবা ?"

এ রঙ্গ দেখিয়া মেহেরের মলিনমুখে একটু হাসি আসিল। মনে মনে ভাবিলেন, এ এক মন্দ তামাসা নয়। মেহের, প্রভুত্বসূচকস্বরে বলিলেন,—"বুঝিতে পারিতেছিস্ বাঁদি! একদিন দিল্লিতে আমার খবরদারীর ভিতর থাকিতে হইবে।"

"যো হুকুম,—আপনার সেবার জন্যই ত আমরা নিযুক্ত—"

"বস্,—বহুৎ আচ্ছা। একবার সর্দ্দার ফৌজদার, রহমৎ খাঁকে সেলাম দাও।"

তাতারণী বলিল,—"জনাব! তিনি কার্য্যান্তরে গিয়াছেন। তাঁহার নিম্নপদস্থ রোস্তম খাঁ এখন তাঁহার কাজ করিতেছেন। দুই তিন দিন তিনি ফিরিবেন না।"

"রোস্তমকে আমার হুকুম জানাও।"

হুকুমপ্রাপ্তিমাত্রেই রোস্তম আসিল। রোস্তম সবে মাত্র যৌবনের

সীমায় পদার্পণ করিয়াছে। সে সুপুরুষ—ভরা-যৌবনের উদ্দাম প্রবৃত্তিতে পরিপূর্ণ।

মেহের ভাবিয়াছিলেন,—রোস্তমও বুঝি রহমতের মত এক বৃদ্ধ সৈনিক। এই যুবকের সম্মুখীন হইতে তাঁহার প্রথমে বড় একটা ইচ্ছা হইল না। কিন্তু দায়ে পড়িলে সবই করিতে হয়, তাই মেহের সে সুন্দর মুখে একটু ঘোমটা টানিয়া বলিলেন—

"রোস্তম আলি!"

যেন সপ্তস্বরা-বীণার স্বরবাঁধা সঙ্গীতপূর্ণ তারে, কে মৃদু অঙ্গুলি আঘাত করিল। সেই স্বর যেন রোস্তমের কাণের ভিতর দিয়া প্রাণের চারি ধার ঘিরিয়া, বড়ই মিঠা বাজিতে লাগিল। সেই সুন্দর ঘোমটার অন্তরালে, সেই কৃষ্ণ তারকাময় টানাটানা চোক দুটী—আর চাঁদপানা মুখখানি, রোস্তমের মাথা ঘুরাইয়া দিল। সেদিন রাত্রে, মশালের আলোকে নদীকূলে পরিদৃষ্ট, সেই অতুলনীয় সৌন্দর্য্য, তখন যেন দিবালোকে পূর্ণজ্যোতিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আ মরি! মরি! রমণী এত সুন্দরও হয়! রোস্তম কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "কেন ডাকিয়াছেন?"

"তুমিই কি সেদিন রহমতের সঙ্গে নদীসৈকতে ছিলে?"

"আজ্ঞা হাঁ—"

তোমাদের বন্দোবস্তে আমি বন্দিনী হইয়াছি। তোমাদের পাহারার বন্দোবস্তে আমায় বন্ধুবান্ধবের যাতায়াতের পথ বন্ধ। ভদ্র-মহিলারা কেমন করিয়া আসিবেন? আমি ত দিল্লী যাইতেছি। যাইবার পূর্ব্বে ত সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা চাই?"

তখন রোস্তমের প্রাণে, হৃদয়ের নিভৃতকন্দরে, আশে পাশে, অন্তর্জ্জগতের সেই লুক্কায়িত অংশে, মেহেরের মোহিনীরূপ ঘুরিতেছিল।

সমগ্র বিশ্বের কেন্দ্রে কেন্দ্রে, তাহার হৃদয়ের আশে পাশে, সে সুন্দর রূপ যেন শতগুণে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কি মধুর সম্বোধন! "রোস্তম

আলি" ! রোস্তম—মজিল, ডুবিল, মরিল। কেবল তাহার কাণে বাজিতেছে—"রোস্তম আলি !"

সে বিজড়িত বিকম্পিত স্বরে বলিল,—"কি করিতে হইবে বলুন ?"

"বন্দোবস্ত করিয়া দাও—যেন কোন প্রহরিণী শিবিকা পরীক্ষা না করে।"

"অসম্ভব।"

মেহের, মুখের ঘোমটা খুলিলেন। পূর্ণিমার চাঁদ যেন মেঘান্তরাল ত্যাগ করিল। ক্রোধে তাঁহার মুখমণ্ডল উদ্দীপ্ত। লজ্জা সরম ভাসিয়া গেল। মেহের সরোষে বলিলেন,—"অসম্ভব ! ! কেন, দিল্লীর বাদসা এরূপ হুকুমও দিয়াছেন না কি ?"

"না, বাদসা কিছু বলেন নাই। এটা আমাদের কার্য্যক্ষেত্রানুসারী ব্যবস্থা।" রোস্তম আর বলিতে পারিল না। তাহার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ছুটিতেছিল। সে বিরাটবিশ্বের সর্ব্বত্রই সেই মনোমোহিনীর সৌন্দর্য্য পরিপূর্ণ দেখিতেছিল।

মেহের, তাহার মনের ভাব বুঝিলেন। আবার লজ্জায় অবগুণ্ঠন টানিলেন। বলিলেন,—"রোস্তম ! কাটোয়া হইতে আমার প্রিয়সখি নতিরাণী আসিতেছেন। হুকুম দাও, তাঁহার শিবিকা কেহ যেন, পরীক্ষা না করে।"

রোস্তম কি ভাবিয়া বলিল,—"আমার মার্জ্জনা করুন বিবি ! এখন এ উত্তর দিতে পারিব না। রাণীজী তো কাল আসিবেন। আজ সন্ধ্যার মধ্যে আপনাকে উত্তর পাঠাইব। আর একবার খবর দিবেন।"

রোস্তম সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। সে দেখিল—চারিদিকে সেই মোহিনীমূর্ত্তি ! সম্মুখে উদ্যান-বাটিকার প্রস্ফুটিত মল্লিকাগুলি যেন সে মুখের কোমলতা চুরী করিয়াছে। মেঘের কোলের পাপিয়া, যেন তাহার কণ্ঠস্বর চুরী করিয়াছে। নীল গগনের বিচিত্র বর্ণ, যেন তাহার ওড়নার

রংটুকু নিজগাত্রে প্রতিফলিত করিয়াছে। কি সুন্দর চক্ষু! কি সুমিষ্ট স্বর! কি উন্নত গ্রীবাভঙ্গী! কি সুন্দর রং! হায়! এত সুন্দর যে—তাহাকে কেন সে দেখিল? দিল্লীশ্বরের নবীন সেনাপতি এই রূপে মোহে পড়িল। বিশ্বাস ও কর্ত্তব্য হারাইল, জাহান্নমে ডুবিল—শয়তানের ক্রীতদাস হইল।

রোস্তম সন্ধ্যার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সময় যেন অতি দীর্ঘ। ঘণ্টাগুলা যেন যুগের মত হইয়া পড়িতেছে। তাহার মনে এক অসম্ভব কল্পনার উদয় হইয়াছে। আকাশের সূর্য্যটা কেন সহসা কক্ষচ্যুত হয় না? সে দুরাশায় উন্মাদ হইয়াছে,—কেমন করিয়া কি সাহসে মুখ ফুটিবে। না—মনের কথা বলা হইবে না। হায়! হায়! উপায় কি? না বলিলে বুকের ভিতর জ্বলন্ত অগ্নি। তাহাতে হতভাগ্য রোস্তম-আলি পলে পলে ভস্মীভূত হইবে।

সন্ধ্যার সময়, আহ্বানক্রমে রোস্তম আবার অন্দরে গেল। দেখিল, এক নির্জ্জন কক্ষে, পালঙ্কের উপর বসিয়া মেহের উন্নিসা চিন্তায় নিমগ্না। সেই অলক্তক-রাগ-রঞ্জিত, সুন্দর চরণ দুখানি—স্থিরভাবে একখণ্ড বিচিত্র গালিচার উপর বিন্যস্ত। মুখ অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত। অবগুণ্ঠনের অন্তরালে মন্মথের সেই তীব্র বিষময় শর। ভ্রমরকৃষ্ণ এলায়িত কেশরাশি, সেই সুন্দর মুখের চারিধারে ধীর-সমীরে চঞ্চলভাবে দুলিতেছে। রোস্তম অগ্রসর হইয়া সেলাম করিল।

মেহেরউন্নিসা মৃদু হাস্যের সহিত বলিলেন,—"কি স্থির করিলে রোস্তম-আলি?"

সে পাপিষ্ঠ উত্তর দিল না। কি ভাবিতে লাগিল। একবার কক্ষের চারিদিকে দেখিল। সেখানে আর কেহই নাই। তবুও তাহার সাহস হইল না। মনের কথা যতই জিহ্বাগ্রে আসিতেছিল, সে যেন ততই শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছিল।

মেহেরউন্নিসা তিরস্কারপূর্ণস্বরে বলিলেন,—"তুমি অত বড় দিল্লী-শ্বরের সেনাপতি—একটা ছোট কথার মীমাংসায় এত সময় কাটাইলে!"

রোস্তম বলিল,—"শেষ মীমাংসা করিয়াছি,—বিবিসাহেব! আপনাকে মুক্তি দিব। কাল রাত্রে নদীতীরে রহমতের সহিত আপনার সব কথাই শুনিয়াছিলাম। কাল সে যাহা পারে নাই, আজ আমি তাহা করিব।"

মেহেরউন্নিসা সহসা এ আশ্বাস-বাক্যে বিশ্বাস করিলেন না। ব্যাপারটা বড় দায়িত্বপূর্ণ, তাঁহার বিশ্বাস হইল না। বলিলেন,—"কার হুকুমে আমায় ছাড়িবে?"

রোস্তম ধীরে ধীরে বলিল,—"আমার নিজের ইচ্ছায়।"

"তোমার নিজের ইচ্ছায়? কি পণ চাও?"

রোস্তম মনে মনে বলিল, যা চাই—সমগ্র বিশ্ব প্রদান করিলে, তাহার তুল্য হইবে না।

প্রকাশ্যে বলিল,—"এর আবার পণ কি? জীবন পণ।"

মেহের বলিল,—"আমার জন্য কেন তুমি মরিবে?"

রোস্তম কম্পিত আবেগপূর্ণকণ্ঠে উত্তর করিল—

"আমি আর ফিরিব না। আপনার সমভিব্যাহারী হইব। আপনার অনুগ্রহের উপর এখন আমার জীবনের সুখ নির্ভর করিতেছে। আপনি আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। আপনাকে না দেখিলে আমি বোধ হয় বাঁচিতে পারিতাম।"

মেহের এতক্ষণে সব বুঝিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল ক্রোধে জলিয়া উঠিল। ব্যাঘ্রিণীর ন্যায় ভীমমূর্ত্তি ধারণ করিয়া গর্জ্জিয়া বলিলেন,—পাপিষ্ঠ! সয়তান! এত বড় স্পর্দ্ধা? কে আছিস্?" মেহের, ঘণ্টার রজ্জু ধরিলেন।

রোস্তম বিপদ্ গণিল। অবরোধ, কারাগার—মৃত্যু—তাঁহার

সম্মুখে। পাপিষ্ঠ মরিতে ভয় পাইল! মেহেরের পায়ে ধরিয়া বলিল,—"ক্ষমা করুন। এ পাপ-কথা প্রকাশ করিবেন না। দুই জনেরই তাহাতে কলঙ্ক। আমি জন্মের মত বিদায় লইতেছি—জানিবেন,—মৃত্যুকে ভয় করি না। আমি উন্মাদ—না হইলে এই দুরূহ সংকল্প করিব কেন? আমার ন্যায় হতভাগ্যকে মারিয়া কি লাভ?"

মেহের কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন,—"পিশাচ—দূর হও।"

রোস্তম সেলাম করিল না। ভয়ে নহে—কি করিতে হইবে, সে সব ভুলিয়া গিয়াছিল। প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া, দ্রুতপদে সে শিবিরের পথ ধরিল। তখন অন্ধকার একটু ঘন হইয়াছে। রোস্তম, শবের ন্যায় মলিন বিশীর্ণ মুখে শিবিরে পৌছিল। দেখিল, বৃদ্ধ সেনাপতি রহমৎ, গম্ভীরমুখে কি ভাবিতেছেন।

রহমৎ পুরুষকণ্ঠে বলিলেন, "রোস্তম কোথায় গিয়াছিলে?" রোস্তমের পাপ-হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। বলিল,—"বেগমসাহেবা স্মরণ করিয়াছিলেন।"

"কেন?"

"তিনি বলেন'—অন্তঃপুরের যাত্রীদের কোন শিবিকাই পরীক্ষা করা হইবে না।"

"কি উত্তর দিলে?"

"কিছুই দিই নাই।"

রহমৎ গর্জ্জিয়া উঠিলেন। ক্রোধে সেই বৃদ্ধের মূর্ত্তি, যুবকের উদ্ধতভাব ধারণ করিল। তিনি সরোষে বলিলেন,—"বিশ্বাসঘাতক! নিমক্‌হারাম, তুমি না দিল্লীশ্বরের সেনাপতি! সবই আমি শুনিয়াছি। আজ হইতে তুমি পদচ্যুত ও বন্দী।"

রোস্তম স্থির—নিশ্চল—নির্ব্বাক্! তাহার নিরুত্তর অবস্থাই তাহার অপরাধের স্পষ্ট প্রমাণ।

প্রধান সেনাপতির আদেশে রোস্তম সেখ, তৎক্ষণাৎ শৃঙ্খলিত হইল। পাপ-কল্পনায় তাহার পতন হইল। তাহার অন্ত মহাশব্দে নরক-দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উন্মুক্ত বাতায়নপার্শ্বে দাঁড়াইয়া মেহেরউন্নিসা সান্ধ্যগগনের সৌন্দর্য্য দেখিতেছেন। গাছের পাতার উপর, অস্তগামী সূর্য্যের চঞ্চল লোহিত আভা কিরূপে ক্রমে জ্যোতিঃহীন হইতেছে,—পাখীগুলা নীলাকাশের নীচে কত দ্রুতভাবে ছুটিতেছে,—অত উচ্চ আকাশ স্পর্শ করিতে পারিতেছে না, যেন তাহারা অতি ক্ষুদ্র, তাই চীৎকার করিতেছে—মেঘের সমুদ্রে ডুবিয়া ডুবিয়া আবার ভাসিয়া উঠিতেছে,—মেহের নিবিষ্টমনে ইহাই দেখিতেছিলেন। এমন সময়ে পিছন হইতে কে যেন ডাকিল,—"মেহেরজান!"

মেহেরজান!! এ যে সের-সাহেবের আদরের সম্বোধন! মরা মানুষ কি কবর হইতে উঠিয়া, আবার এত আদর করিয়া ডাকিতে পারে? পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন—"মতিরাণী।"

মতি দেখিলেন, মেহেরের কামমোহিনী সৌন্দর্য্যে কালি পড়িয়াছে। চূর্ণ-কুন্তল অনাদৃতভাবে মুখের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেই সদা-প্রফুল্ল, হাস্য-রস-সিক্ত ওষ্ঠাধর—নীরস ও শুষ্ক, ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত।

মেহের শয্যায় বসিয়া, মতিয়ার কণ্ঠলগ্ন হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বর্ষার নদীর রুদ্ধস্রোত কে যেন খুলিয়া দিল। সে স্রোত যেন বেগ মানিতে চায় না, রুদ্ধ হইতে চায় না—ফিরিতে চায় না। মতিয়া বাষ্প-রুদ্ধস্বরে বলিল, "এতদূর হইয়াছে বহিন্! খবর দাও নাই কেন?"

এ কথার উত্তর নাই। আবার অশ্রুপ্রবাহ সেই কোমল গণ্ডস্থলের

পথ আশ্রয় করিল। বর্ষাবারিনিষিক্ত গোলাপের ন্যায় সেই মুখের সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিল।

মতিয়া আশ্বস্তস্বরে বলিল,—"যা হইবার তা হইয়াছে,—যাহা ফিরাইবার উপায় নাই,—তার জন্য বৃথা কাঁদ কেন সখি ?"

মেহেরউন্নিসা চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া বলিলেন,—"মতি! মতি! প্রিয়সখি! আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। আগরায় লইয়া যাইবার জন্য বাদসার ফৌজ আমায় ঘিরিয়া রহিয়াছে।"

মতিয়া ততদূর আশ্চর্য্যান্বিত হইল না। সব কথাই সে রাজা গজপতিসিংহের নিকট ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিল। বলিল,—"যখন উপায় আর নাই, তখন আগরায় না গেলে চলিবে কেন ?"

মেহেরউন্নিসা বলিলেন,—"প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, পথে পড়িয়া অনশনে মরিব, তবু সেই পাষাণ-হৃদয়ের বিলাস-দাসী হইব না।"

"বিলাস-দাসী কেন সখি! দিল্লীর মণিময় সিংহাসনের তুমি পাটরাণী হইবে। একদিন এই হিন্দুস্থান তোমার কটাক্ষে কম্পিত হইবে।"

"না সখি তুমি ওকথা বলিও না। তুমিও অত নিষ্ঠুর হইও না। পরামর্শের জন্য তোমায় ডাকিয়াছি; সখির ন্যায়—ভগ্নীর ন্যায়—পরামর্শ দাও। সিংহাসনে কি প্রাণের দাগ মুছিবে ?"

মতিয়া বলিল,—"মেহের। আমরা হিন্দুর ঘরে জন্মিয়াছি—অদৃষ্টটা বড় বিশ্বাস করি। এই যে সব কষ্ট ঘটিল, এ সব কেবল অদৃষ্টের কার্য্য। আর এক কথা কেবল অদৃষ্ট বলি কেন ? সেই বৃদ্ধ আকবর বাদসাহের সব দোষ। প্রথমে তিনি যদি প্রতিযোগী না হইতেন,—তখনই ত তুমি কুমার সেলিমের অঙ্কলক্ষ্মী হইতে। তুমি দিল্লীর সিংহাসনে বসিবে,—অদৃষ্টের লিপি এই খণ্ডাইবে কে ?"

মেহের সদর্পে উত্তর করিলেন,—"আমি নিজে অদৃষ্টের কার্য্যের

প্রতিবন্ধক হইব। স্বামী স্বর্গে,—কিন্তু তাঁহার স্মৃতি আমার হৃদয় হইতে মুছিবে না।"

"এ প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারিবে কি?"

"ইচ্ছা আমার—প্রতিজ্ঞা ইচ্ছার অধীন। যে পথে ইচ্ছাকে চালিত করিব, সেই পথে চলিবে। তবে স্ত্রীলোকের হৃদয় অতি দুর্ব্বল।"

মতিয়া একটু নীরস হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"যিনি তোমার জন্য এতটা করিলেন, তাঁহাকে একবার দেখা দিবে না? বাদসাহী ফৌজ যখন আসিয়াছে, তখন তোমায় যাইতেই হইবে। তুমি মতিমহলে পৌছিলে, তিনি যখন তোমায় আদর করিয়া লইতে আসিবেন, তখন কি করিবে? দিল্লীশ্বরের আদর কি তুমি উপেক্ষা করিবে?"

"সম্ভব হইলে তাঁর বক্ষে পদাঘাত করিব। বলিব,—তুমি দুনিয়ার বাদসা হইয়াও অতি ঘৃণ্য! তুমি একটা মোহের কুহকে পড়িয়া,—নিজের সুখের জন্য—এক নিরীহ অবলার সর্ব্বনাশ করিলে কেন?"

পদাঘাতের কথাটা মতিয়ার কর্ণে বড় তীব্র লাগিল। সে মেহেরের মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—"সখি! ওকথা আর মুখে আনিও না। এই দেয়ালগুলারও কাণ আছে, চারিদিকে বাদসাহের লোক। কে কোথায় শুনিয়া ফেলিবে,—তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ!"

সহসা কে যেন দ্বারের পশ্চাৎ হইতে বলিয়া উঠিল,—"পদাঘাতে ভয়ের কারণ কিছুই নাই। জাঁহাগীর বাদসা অনেক দিন হইতেই ওই চরণতলে বিক্রীত।"

এ কথায় মেহের ও মতিয়া উভয়েই চমকিয়া উঠিলেন। এক অপরিচিতা স্ত্রীলোক সেই গৃহে প্রবেশ করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যে গৃহে প্রবেশ করিল, সে—পূর্ণযুবতী—অতি সুন্দরী। পোষাক দেখিলে বাঁদীর মত বোধ হয়, কিন্তু রূপ দেখিলে রাজরাণীরও আসন টলিয়া উঠে। মতিয়া বিস্ময়পূর্ণচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কে তুমি ?"

"আমি বাঁদী।"

"কার বাঁদী ?"

"পিয়ারি বেগমের।"

"দিল্লীর পিয়ারী বেগম—যিনি ইরাণ হইতে নূতন আসিয়াছেন ?"

"আজ্ঞা—হাঁ।"

"এখানে আসিয়াছ কেন ?"

"বেগম তাড়াইয়া দিয়াছে। আমার এক খুড়া বাঙ্গালা দেশে থাকেন; তাঁর কাছে আসিয়াছিলাম। সের-সাহেবের পত্নী দিল্লী যাইবেন। যদি চাকরী জুটে, তাই আসিয়াছি।"

অপরিচিতার কথায় মতির সন্দেহ ও বিস্ময় কমিয়া আসিল। মতি-রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার চাকরী গেল কেন ?"

"বেগম-মহলের চাকরী। পান হইতে চুণ খসিলেই সর্ব্বনাশ !"

মতি ও মেহের উভয়েই কথাটা বিশ্বাস করিলেন। মতি কম্পিত-কণ্ঠে বলিলেন,—"একটু আগে আমাদের যে কথাবার্ত্তা হইয়াছে, তাহা তুমি নিশ্চয়ই শুনিয়াছ। খপর না করিয়া তুমি এখানে আসিলে কেন ? বাদসাহের রঙ্গমহলে থাক—আদবকায়দা শিখ নাই ?"

বাঁদী বলিল, "আমায় মার্জ্জনা করুন। মনে ভাবিয়াছিলাম, নূতন বেগম একাকিনী আছেন। সব কথা আমরা পেটে রাখি, নচেৎ রঙ্গ-মহলে টিকিতে পারিব কেন ? আমাদের ত জানের ভয় আছে !"

মতিয়া এ কথায় একটু আশ্বস্ত হইল। নিজের বক্ষ-মধ্যস্থ এক ক্ষুদ্র থলিয়া হইতে আস্‌রফী বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল, "সাবধান! বেগমের—ভাবী সুলতানার সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করিলে তোমারই মৃত্যু! এখন আগরা যাইবার কথা কিছু স্থির নাই। সপ্তাহান্তে আসিও। তোমায় বাহাল করা যাইবে।"

বাঁদী সেলাম করিয়া বলিল,—"বেগমসাহেবার জয় হউক।" সে চলিয়া গেল। মতিয়া ও মেহের দুই জনেই এই পাপীয়সীর ছলনায় ভুলিলেন। যদি কেহ বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত,—তাহার মুখমণ্ডলে একটু হাসির রেখা দেখা দিয়াছে।

সেই বাঁদী, পুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গ্রামের পথ ধরিল। এক দীর্ঘিকার নিকট এক ক্ষুদ্র শিবিকা ছিল,—তাহাতে আরোহণ করিয়া চলিয়া গেল। আস্‌রফী কয়টা এক দরিদ্রকে দান করিল।

বাঁদী চলিয়া গেলে, মতিয়া, মেহেরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"কি স্থির করিলে সখি?"

"আগরা পৌঁছিব না। পথে বিষ খাইব। আমার মৃতদেহ আগরায় পৌঁছিবে। জাঁহাগীর বাদসা নিজের কীর্ত্তি দেখিবেন।"

মতিয়া প্রবুদ্ধস্বরে বলিল,—"তুমি মরিলে জাঁহাগীর বাদসার কি হইবে? ছি!—বার বার ওকথা বলিও না। আমার পরামর্শ এই, দিল্লী যাও। সেখানে যদি আদর দেখ, সিংহাসনে বসিও,—অনাদর দেখ, বিষ খাইও। আমি ও রাজা শীঘ্রই সেখানে পৌঁছিব। আমি নিজ-হস্তে তোমার মুখের উপর বিষপাত্র ধরিব,—তখন আর বাধা দিব না।"

মেহের বুঝিলেন, মতিয়া যা বলিতেছেন, তাহা ঠিক। মতিয়া আরও বলিলেন,—"সখি! আমাদের শাস্ত্রে বলে, মানুষ হইয়া জন্মান অনেক তপস্যার কথা। মানুষ হইয়া যারা মানুষের মত কাজ করিতে পারে, তারাই ধন্য। মরিলেই ত তোমার সব ফুরাইল। মরুভূমির

শুষ্ক ফুলটী কবরে মিশান বেশী আশ্চর্য্য নয়। কত ফুল আপনি শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে। এই হিন্দুস্থানের সম্রাজ্ঞী হইলে, তুমি লোকহিতব্রতে নিযুক্ত হইতে পারিবে। তোমাদের শাস্ত্রে ত পুনরায় বিবাহ আছে।"

কথা এইখানেই মীমাংসা হইল। মতির যুক্তিতে মেহেরউন্নিসা কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। মেহের মনে মনে বলিলেন,—"উপায় ত নিজের হাতে। না হয়, মতির কথা শুনিয়া আগরায় গিয়া, ব্যাপারটা কি দেখা যাউক।"

তখন বিদায়ের পালা আরম্ভ হইল। অনেক দিন পরে দেখা, আবার কবে সাক্ষাৎ হইবে কে জানে? অশ্রুপ্রবাহ, বর্ষার স্রোতের ন্যায় মেহেরের গণ্ডস্থল প্লাবিত করিল। মতি, মেহেরকে অশ্রুপূর্ণ-লোচনে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন,—"সখি! যতবার আসিয়াছি, হাসিতে হাসিতে বিদায় দিয়াছ। আজ তোমার অবস্থা দেখিয়া বুক ফাটিতেছে! আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরসুখিনী হও—"আর বলা হইল না। শোকোচ্ছ্বাসে কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।

মতিয়া গিয়া পাল্কীতে উঠিল। মেহেরউন্নিসা সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া, মেহের, মোগলসেনাপতি বৃদ্ধ রহমৎ খাঁকে বলিয়া পাঠাইলেন,—"বাদসাহের দ্বিতীয় আদেশের প্রয়োজন নাই। পরশ্ব প্রাতে আগরায় যাইবার বন্দোবস্ত কর।"

বৃদ্ধ রহমৎ এ সংবাদে অধিকতর আশ্চর্য্য হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আগরার রঙ্গমহালের ঐশ্বর্য্যটা বর্ণনা করিবই বা কি করিয়া? আমার ক্ষীণ লেখনী, ক্ষুদ্র ক্ষমতা—স্বল্প সীমাবদ্ধ অস্ফুট কল্পনা—শক্তিই বা আমার কই? রঙ্গমহাল কত বড়—রঙ্গমহালে কত কুবেরের

ঐশ্বর্য্য—কত হীরামাণিক—কত ষোড়শী রূপসী। রঙ্গমহাল চিত্রিত করিতে,—নির্ম্মাণ করিতে, কত শিল্পীর জীবন কালস্রোতে ভাসিয়াছে।

রঙ্গমহাল রূপসীর মেলা। এ রূপসীদের মুখ সূর্য্য দেখিতে পান না, নীল আকাশ দেখিতে পায় না, মুক্ত-প্রকৃতি দেখিতে পায় না, চাঁদ দেখিতে পায় না। কেবল উন্মুক্ত বাতায়নে প্রবিষ্ট—পুষ্পবাসিত মলয়-বায়ু, গোপনে এক আধবার আসিয়া সুন্দরীদের অলকা লইয়া খেলা করে, একটু সুগন্ধি নিশ্বাস চুরি করিয়া লইয়া, বাহিরের উদ্যানের ফুলের গন্ধের মধ্যে ছাড়িয়া দেয়। কখনও বহুমূল্য গোলাপ ইত্রাম্বুলের ভরপুর গন্ধের একাংশ চুরী করিয়া পলায়।

ঝাড়ের পাশে ঝাড়। দর্পণের পাশে দর্পণ। ফুলের মালার ঝালরের মধ্যে মধ্যে মতি খচিত লাল, নীল, সবুজ, ফিরোজা, গোলাপী, বাদামী রঙ্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতাকা। তাহার কোন কোনটীতে বা হাফেজের প্রেম-ময় কবিতাংশ, ফর্দ্দুসীর তেজোময় কবিতা—আমীর খসরুর প্রেমময় গাথা—শুলেস্তার বহুমূল্য উপদেশের অর্দ্ধোদ্ধৃত অংশ। কোথাও স্বর্ণ-পাত্রে নাগকেশরগুচ্ছ—কোথাও রূপার উপর সোণার কাজ করা ফুল-দানীতে গন্ধরাজ ও গোলাপের রাশি, কোথাও কার্ণিসের উপর স্তম্ভ হইতে স্তম্ভান্তরে দোলায়িত—বেলা ও বনমল্লিকার হার। কোথাও স্বর্ণখচিত ফোয়ারার বাঘের মুখ হইতে শীতল গোলাপের উৎস বহিতেছে। কোথাও মৃদঙ্গ, ভীমরাজ, পাপিয়া, ময়না, সারী, কাকাতুয়া, সোণার দাঁড়ে বসিয়া মনের সুখে বুলি ছাড়িতেছে।

গৃহমধ্যে এক নাতিদীর্ঘ, নাতিপ্রশস্ত, ক্ষুদ্র মর্ম্মর-চৌবাচ্চা। কাশ্মীর উপত্যকার অভ্রভেদী মহীধরের বক্ষচ্যুত—গলিত তুষারজলে সেই চৌবাচ্চা পরিপূর্ণ। সেই গ্রীষ্মের দিনে, চৌবাচ্চার ধারে কয়েকজন সুন্দরী আলাপ করিতেছিলেন। কেহ বা চৌবাচ্চার শীতল মর্ম্মর কার্ণিসের উপর অর্দ্ধ-হেলায়িত দেহযষ্টির ভার সংন্যস্ত করিয়া,—কুণ্ডলিত

ফণিনীর ন্যায় ঘনকৃষ্ণ কবরী হইতে গোলাপের পাপড়ি খুলিয়া, সেই তুষার-জলে ভাসাইয়া দিতেছিলেন। কেহ বা গল্প করিতেছিলেন—কেহ বা মন দিয়া তাহা শুনিতেছিলেন। কেহ বা একটী কাকাতুয়াকে লইয়া রঙ্গ করিতেছিলেন।

বাস্তবিকই সেদিন রঙ্গমহালে একটা সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বাসন্তী পূর্ণিমা। শুভ্র মর্ম্মরের উপর উন্মুক্ত বাতায়ন পথপ্রবিষ্ট চূর্ণীকৃত চাঁদের আলো, আর তার মধ্যে সেই স্বপ্নময় রাজ্যের উপান্তস্থিত সুন্দরী-দের সেই সুন্দর মুখ। মরি! মরি! কি সুন্দরই দেখাইতেছিল। তাহারা সত্য সত্যই যেন এ কলঙ্কিত পৃথিবীর নহে। বাসন্তী-প্রভাতের মৃদুমলয়ে প্রস্ফুটিত, অর্দ্ধ-উন্মেষিত পুষ্পকলিকাগুলি যেমন এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়ে,—আপনাআপনি হাসির রাশি লইয়া ফুটিয়া উঠে,—ইহারাও সেইরূপ আনন্দে আত্মহারা হইতেছিল।

তাহারা দিল্লীশ্বর জাঁহাগীর সাহের আদরের আদরিণী—প্রেমের ভিখারিণী—অনুগ্রহের আশাপ্রতীক্ষায় সেদিন আমোদিনী। কিন্তু সেদিন তাহাদের আশা পূর্ণ হইল না। বাদসাহ সেদিন রঙ্গমহালে দেখা দিলেন না।

রাত্রি অধিক হইয়াছে—বাতায়ন-পথ-প্রবিষ্ট চন্দ্রের বিমল কিরণ-মালা কি জানি, কি ভাবিয়া চৌবাচ্চায় ডুবিতেছিল। ফুলের মালার সরস গন্ধ ক্রমে বিরস হইতেছিল। স্বর্ণ-পিঞ্জরের পাখী বুলি বন্ধ করিয়া, নিদ্রিত হইয়া পড়িতেছিল। কার্ণিসের উপর হইতে ফুলের মালার ফুল ঝরিয়া পড়িতেছিল। রাত্রি অধিক দেখিয়া বেগমেরা—সকলে স্ব স্ব কক্ষে নিরাশ হৃদয়ে ফিরিলেন। রহিলেন কেবল দুইজন—সোফিয়া ও ইরাণের নূতন সুন্দরী বেগম পিয়ারি।

পিয়ারি বড়ই ক্লান্ত হইয়াছিল। বলিল,—"সোফি! বহিন্ আমার, একটা পিয়ালা সিরাজী দে।"

অন্য সময় হইলে সোফি উঠিতে আপত্তি করিত, কিন্তু তখন পিয়ারির নিকট তাহার কিছু কাজ ছিল। স্বর্ণপাত্র ভরিয়া সিরাজী ঢালিয়া, সোফি তাহাতে গুলাব মিশাইল—একটু বরফ দিল। পিয়ারি এক নিশ্বাসে শেষ করিলেন। সোফি কোন আপত্তি করিল না।

পিয়ারির প্রাণ ক্রমে ক্রমে খুলিয়া গেল। বক্ষের উপর যে একটা পাষাণের ভার ছিল, সেটা সরিয়া গেল। প্রাণে স্ফূর্ত্তি দেখা দিল। পিয়ারি, দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া আপনাআপনি বলিল,—"আজ আর আসিবেন না। বলিয়াছিলেন,—গান শুনিবেন, বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন।"

কথাটা সোফিয়ার কাণে গেল। সোফি মনে মনে বলিল, "এতদূর গড়াইয়াছে।" প্রকাশ্যে বলিল,—"পিয়ারি—"

"কেন সই—"

"এ চাঁদিমার রাত্রি কি অমনি কাটিবে?"

"কেন ভাই— এস্‌রাজটা আনিয়া দে। গান গাহিয়া কাটাইয়া দিই।"

"আর গান ভাল লাগে না। জাঁহাপনা ত লুকাইয়া মেহেরের কাছে যান নাই?"

"সে পথ বন্ধ,—তাহার সর্ব্বনাশ ত আমিই করিয়াছি।"

"তুমিই করিয়াছ,—একি কথা সখি? সে তোমার কাছে কি অপরাধ করিয়াছে?"

সিরাজি তখন পিয়ারির মস্তিষ্কে পূর্ণশক্তি প্রকাশ করিয়াছিল। তাহার দিল্ খুলিয়া গিয়াছে। সে সগর্ব্বে বলিল,—"সে অপরাধী নয়, তার সৌন্দর্য্য অপরাধী। সে অপরাধী নয়,—জাঁহাপনার চক্ষু অপরাধী। আমি নূতন আসিয়া যে আদর পাইতেছি—সে তাহার কণ্টক হইবে, কেন তাহাকে নষ্ট করিব না?"

"তুমি মুক্তের গিয়াছিলে কেন?"

"পাহাড়ের হাওয়া খেতে,—জান না, আমার কঠিন পীড়া হইয়াছিল।"

সোফিয়া হাসিয়া বলিল,—তা'ত বটে, কিন্তু মুঙ্গের হইতে বর্দ্ধমানে বাঁদী সাজিয়া গিয়াছিলে কেন?"

পিয়ারি শিহরিয়া উঠিল। বলিল,—"তুমি কেমন করিয়া জানিলে?"

সোফিয়া—কপট-রুষ্টভাবে বলিল,—"ছি! সখি। অবিশ্বাস করিতেছ? তুমিই ত এক'দিন বলিয়াছিলে।"

পিয়ারি হাসিয়া উঠিল, বলিল,—"ক্ষমা কর ভাই! সব কথা মনে থাকে না। বর্দ্ধমানে না গেলে কি এত শীঘ্র কার্য্যসিদ্ধি হইত?"

"কি কার্য্য সিদ্ধি?—"

"মেহেরের সর্ব্বনাশ!"

"কিসে?"

"পদাঘাতের কথায় জাঁহাপনা একেবারে জলিয়া উঠিলেন।"

"তাহাতে বিশ্বাস কি? বাদসাহের মন সমুদ্রের বায়ু—কখন শান্ত, কখনও চঞ্চল।"

"তা নয় সখি! ঝড় বহিয়াছে। মেহের আসিয়া অবধি যে অবস্থায় কাটাইতেছে,—শুনিলে আমারও দয়া হয়। একটা বাঁদী যে মসহরা পায়, সে তাও পায় না।"

সোফিয়া ভাবিল,—পিয়ারী মানবীবেশে সয়তানী। এমন করিয়াও লোকের সর্ব্বনাশ করিতে হয়! সোফি, পিয়ারির কাণে কাণে বলিল, "জাঁহাপনা না কি মেহের আসিবার পরদিন গোপনে দেখা করিতে গিয়াছিলেন?"

পিয়ারি বলিল,—হাঁ, মেহের দর্পভরে ভাল করিয়া কথা কহে নাই, উঠিয়া দাঁড়ায় নাই। পদাঘাত খাইয়াও তিনি সাধিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু মেহেরের সে অহঙ্কার সহ্য করিতে পারিলেন না। আর দেখা দিলেন না। দেখিতে দেখিতে এক বৎসর ত কাটিল।"

আগরার ঘণ্টাঘর হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর ঘোষণা হইল। পিয়ারি সেইখানে ঢলিয়া পড়িল। সোফি, একটা বাঁদীকে ডাকিয়া দিয়া, উদ্যানের দিকে চলিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভবিতব্য মানুষের অদৃষ্টে লুকাইয়া অলক্ষ্য হস্তে, অস্পষ্ট অক্ষরে, কি কোথায় লিখিয়া রাখে, তাহা যদি তাহারা জানিতে পারিত, তাহা হইলে কাহারও দুঃখভোগ হইত না। মানুষের কল্পনার সুখের উদ্যান, নিরাশার উষ্ণনিশ্বাসে দগ্ধ হইয়া যাইত না; মেহেরউন্নিসা যাহা ভাবিয়া মতিয়ার কথা শুনিয়া আগরায় আসিলেন, ভবিতব্য সেগুলি ওলট্‌পালট্ করিয়া দিয়াছে। এখন যেন, কি একটা প্রজ্ঞাবলে মেহের নিজের অদৃষ্টের সেই অস্পষ্ট অক্ষরগুলি অল্প অল্প পড়িতে পারিতেছে।

পড়িতে পারিয়া, নিজের ভবিষ্যৎ বুঝিতে পারিয়া,—মেহের আরও শীর্ণ হইয়াছে। পুরীর একপ্রান্তে, নির্জ্জন কক্ষে পড়িয়া, সেই অনাদরে গরবিণী; মর্ম্মবেদনায় চিন্তাকুল হইয়া পড়িতেছে। সেই সরস, প্রফুল্ল গণ্ডে কে যেন কালিমা-রেখা আঁকিয়া দিয়াছে।

দিন এক রকমে কাটে; রাত্রি কাটে না। মর্ম্মর-কক্ষের পার্শ্ব-প্রবাহিত যমুনার উন্মাদ কলসঙ্গীত শুনিতে শুনিতে, উন্মুক্ত বাতায়ন-কক্ষ-প্রবিষ্ট, শীতল নৈশ-বায়ুতে শরীরের উষ্ণতা একটু কমিলেই, সে তন্দ্রার কোলে লুটিয়া পড়ে। কিন্তু নিদ্রাতেও নিস্তার নাই। জাগ্রতে চিন্তা—নিদ্রায় স্বপ্ন!

মেহের উন্নিসা স্বপ্নে দেখে,—যেন দামোদরের খরস্রোত-চুম্বিত তট-ভূমির উপর সেই শুভ্র অট্টালিকার অন্ধকারময় কক্ষে, সে একাকিনী পড়িয়া আছে। দামোদরের গর্ভ হইতে পুঞ্জীকৃত ঘনান্ধকার যেন তাল পাকাইতে পাকাইতে, তাহার সেই আলোকহীন নির্জ্জন কক্ষের ভিতর

জমাট বাঁধিয়া প্রবেশ করিতেছে। যেন প্রলয়ের কাল কাল মেঘগুলা, ক্ষণকাল বিশ্রাম করিবার জন্য, তাহার কক্ষে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। সেই অন্ধকাররাশি যেন তাহার শয্যার আশে পাশে, শুভ্র উপাধানের উপর, লোহিত মখমলের শয্যাস্তরণের উপর, খট্টার নিম্নে, উর্দ্ধে, অধঃ চারিদিকে—ফুৎকার করিয়া এক দ্রুতপ্রবাহী বায়ুতরঙ্গের সহিত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কখনও বা তাহাকে গ্রাস করিবার চেষ্টা করিতেছে। ভয়ে আতঙ্কে অভাগিনী শিহরিয়া উঠে—চীৎকার করিয়া উঠে, ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। আবার শয্যা ত্যাগ করিয়া বাতায়নে বসিলে দেখে, কৃষ্ণ-সলিলা যমুনার উপর জ্যোৎস্নার রাশি—বাসন্তী-সমীরে দূরশ্রুত অস্ফুট বংশীনিনাদ। জ্যোৎস্নায় কোলে বিরাট্ নিস্তব্ধতা। আর অদূরস্থিত রঙ্গমহালের অস্ফুট আমোদ-কোলাহল।

মেহের, আগরা আসিবার পর, এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। জাঁহাগীর বাদসাহ একবার দেখাও দেন নাই। দেখা দেওয়া দূরে থাক্, একবার সংবাদও লন নাই। সরকার হইতে জীবনোপায়ের যাহা বৃত্তিস্বরূপ ধার্য্য হইয়াছে, তাহাতে বড় কষ্টে দিন কাটে। দুই-চারিটী বাঁদী রাখিতে হইয়াছে, নিজের পেটও আছে, তাহাতে আর চলে না। ঘৃণায়, অভিমানে, অভিমানিনী কাহাকেও মনের কথা প্রকাশ করিয়াও বলেন না।

অনেকে বলিয়াছিল,—"বাদসাকে একবার জানাও।" মেহের তাহার জবাব দেয় নাই। মনে মনে খালি বলিয়াছিল,—"ছি! মরিয়া যাই তাও স্বীকার, তবু অত ছোট হইয়া দিন-গুজরাণের জন্য ভিক্ষা করিতে পারিব না।" শেষ মেহেরউন্নিসা মনে মনে স্থির করিল, আর কাহারও মুখের দিকে চাহিব না। যাহা অদৃষ্টে আছে হইবে। নিজের হাত আছে, শিল্পকলা শিখিয়াছি; যেরূপে হয় দিন কাটিবে। দিল্লীর বাদসার বৃত্তিভোগী হওয়া অপেক্ষা স্বোপার্জ্জিত অন্ন আরও সুখকর।

যথা প্রতিজ্ঞা তথা কার্য্য। মেহের তাহাই করিল। বাঁদী রাখিয়া, লোক রাখিয়া—শিল্পকার্য্য আরম্ভ করিল। সলমার কাজ, জড়োয়ার কাজ, বিচিত্র শিল্পের চরমোৎকর্ষের নিদর্শন, সেই দক্ষিণ ও বাম হস্তের চম্পকবৎ অঙ্গুলিগুলি সৃষ্টি করিতে লাগিল। বাঁদী, সেগুলি আগরার চকে বিক্রয় করিয়া আসে। প্রথম শিল্পের মূল্য, মেহের যাহা আশা করিল, তাহার শতগুণ পাইল। দশ আসরফির স্থানে হাজার আসরফি পাইল। কে এই মহাপুরুষ—কে সেই শিল্পের সৌন্দর্য্যভোগী, পুরস্কারদাতা—মেহের কিছুই জানিতে পারিল না। মেহের আসরফি গণিয়া বাক্সে রাখিল। বাঁদীগুলার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিল, পোষাক বদ্‌লাইয়া দিল। মীর মুন্সীকে ডাকিয়া বলিল,—"আজ হইতে রসদ বন্ধ করিয়া দাও। আর তোমাদের ভিক্ষায় উদর চালাইতে চাহি না।" মীর মুন্সী আশ্চর্য্য হইয়া চলিয়া গেল।

আগরার অন্দরমহলে—মেহেরের সকল স্থানেই অবারিত দ্বার ছিল। কিন্তু সে কখনও নিজের কক্ষদ্বার অতিক্রম করিত না। সেই পুরীর মধ্যে দুইজন তাহাকে স্নেহচক্ষে দেখিত। একজন আকবরের গর্ভ-ধারিণী বৃদ্ধা, পককেশা, মহাপুণ্যবতী, বীরপত্নী, বীরমাতা, হামিদাবানু বেগম সাহেবা—দ্বিতীয়া, যোধপুররাজকুমারী—জাঁহাগীর পত্নী যোধাবাই। হামিদাবানু লাহোরে গ্রীষ্মাতিশয্য জন্য চলিয়া গিয়াছেন। এখন এই বৃহৎ পুরীর মধ্যে মেহেরের একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষিণী—রাজ্ঞী যোধাবাই। যোধাবাই আজ কয়েক দিন—মেহেরের কাছে আসেন নাই। বাতায়ন-পথে বসিয়া তাঁহার কথাই মেহের একান্তমনে ভাবিতেছিল।

বাঁদীরা আহারে গিয়াছে। মধ্যাহ্নকাল—মেহের একাকিনী বসিয়া সেই বঙ্কিম মরাল গ্রীবাবনত করিয়া, আপনার কাজ করিতেছেন। শিল্পের দিকে মন নিবিষ্ট, অপর দিকে দৃষ্টি নাই। সহসা সম্মুখের দ্বার খুলিয়া, একজন নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিল। সে রাগরঞ্জিত

চরণ-যুগল এত কোমল, তাহার গতি এত সতর্ক যে, কঠিন মেঝের উপর কোন শব্দমাত্রও হইল না। সে গতি এত চাঞ্চল্যবর্জ্জিত যে, কেহ তাঁহার আগমন জানিতে পারিল না।

সেই মরালগামিনী গৃহমধ্যে প্রবিষ্টা হইয়া, ধীরে ধীরে মেহেরের চক্ষু দুইটী হস্ত দ্বারা পশ্চাৎ দিক্ হইতে আবরণ করিলেন। মেহের ইতিপূর্ব্বে মতিয়ার কথা ভাবিতেছিলেন,—মনে করিলেন, মতিয়া আসিয়াছে। আগ্রহে বলিয়া উঠিলেন,—"মতি! মতি! এতদিন পরে কি মনে পড়িল সখি!"

সে মতি নয়, উত্তর দিবে কেন? রহস্যকারিণী স্বর পরিবর্ত্তিত করিয়া বলিল,—

"আমি কে বল দেখি?"

সে স্বর লুকাইবার যো নাই—মেহের তাহা চিনিতে পারিল। বলিল,—"আপনি আসিয়াছেন! ভালই হইয়াছে। এতদিন দেখা দেন নাই কেন? আপনার মহলে যাইতে সাহস হয় না। কিন্তু আর যে একা থাকিতে পারি না।"

আর রহস্য করা হইল না। সুন্দরী হাত খুলিয়া লইয়া, সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সে উচ্ছ্বসিত রূপের তরঙ্গ, সে উন্মুক্ত কেশকলাপ, সেই বড় বড়—ভাসা ভাসা—মদিরাময় দুইটী আঁখি, সেই সরস সদা-প্রফুল্ল, নলিনীবৎ মুখকান্তি, শত মাধুরী লইয়া মেহেরের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল।

অধরে ক্ষীণ হাসির রেখা লইয়া মেহের বলিল,—"বন্দেগি! বাদসা-বেগম! আমার এ ক্ষুদ্র কক্ষ আজ পবিত্র হইল! সৌভাগ্যের কথা—না জানি আজ কার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম। আপনি যোধপুরের পবিত্র-কুলোদ্ভূতা দিল্লীশ্বরের পাটরাণী—এ দীনার প্রতি আপনার অশেষ করুণা। সকলে ত্যাগ করিয়াছে, মতিয়াও ভুলিয়াছে, আপনি ভুলেন নাই।"

রাজ্ঞী যোধাবাই নিজ প্রশংসায় অতিশয় লজ্জিতা হইলেন। তিনি মতিরাণীর বাল্যসখী। মতিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিয়া অনুরোধ করিয়াছিল,—"মেহেরজান আমার 'জান'—আমার কলিজা, তুমি যেমন আমায় ভালবাস, মেহেরকে তার চেয়ে ভালবাসো। মেহেরকে যত্ন করিও।" রাজপুতকন্যা নীচ হইতে পারে না। সরলপ্রাণা যোধাবাই প্রায়ই মেহেরকে দেখিতে আসিতেন।

রাজরাজেশ্বরী—কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন,—"কেমন আছ সখি! সেদিন রাত্রে রঙ্গমহালে আমায় খুঁজিতে গিয়াছিলে কেন? আমি নিজের মহলেই থাকি। রঙ্গমহাল পাটরাণীর জন্য নয়।"

"ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আপনার মহালে যাইতে সাহস হয় না। মতিয়াও আসিল না,—আপনাকেও সপ্তাহাবধি দেখি নাই।"

যোধাবাই মেহেরের কাছে বসিলেন। একখণ্ড মখমলের উপর মেহের অতি সুন্দর হীরা-মতির শিল্পকাজ করিয়াছিলেন। পেটিকার মধ্য হইতে তাহা বাহির করিয়া আনিয়া, দিল্লীশ্বরীর সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন,—"দীনার এই সামান্য উপহার কি রাজরাণীর যোগ্য? দয়া করিয়া স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ রাখিবেন কি?"

মহারাণী যোধাবাই, সে সুন্দর শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়া মোহিত হইলেন। মেহের নিজে সুন্দরী, তার শিল্পও অতি সুন্দর। তার অভিমান, তার চেয়েও সুন্দর।

শিল্প-কলায় দেখা যাইতেছে,—এক মরাল, মৃণালকে উৎপাটন করিয়া দূরে ফেলিয়া দিতেছে। যোধাবাই এ কবিত্বময় শিল্পের মর্ম্ম বুঝিলেন। তাঁহার হৃদয় করুণায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। রমণী হইয়া রমণীর কষ্ট অতি সহজে বুঝিলেন। ভালবাসিতে জানিতেন বলিয়া, ভালবাসার অভিমান কি বুঝিলেন। সেই ভাসা ভাসা চক্ষে, দুইটী পবিত্র মুক্তাফল দেখা দিল।

মেহেরউন্নিসা মুখ নত করিয়া বিনম্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মতিয়ার কোন সংবাদ পাইয়াছেন কি?"

"হাঁ—পাইয়াছি।"

"কবে আসিবে?"

"অতি শীঘ্র—চারিদিন পরে বাদসাহের জন্মোৎসব আরম্ভ হইবে। রাজা গজপতি—বাঙ্গালায় একটি বিদ্রোহদমনে বড় ব্যস্ত—কিন্তু সেদিনে তাঁহাকে আসিতেই হইবে। রাজা না আসিলে ত রাণীজি আসিবেন না।"

এই রহস্যে মেহেরের মলিনমুখে একটু হাসি আসিল। বলিলেন,—"মাঝে মাঝে আপনি আসিয়া দেখা দিবেন। এতবড় মহালের এক কোণে বন্দিনীর মত একা আর থাকিতে পারি না। না হয় আমায় ছাড়িয়া দিন্,—যে দিকে ইচ্ছা চলিয়া যাই।"

বাদসাবেগম যোধাবাই, মেহেরের চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া বলিলেন, "ওকি কথা সখি! আমি ত আসিব—আবার মতি আসিলে, দুই জনেই আসিব। আজ তবে বিদায় হই।"

যোধাবাই কক্ষ হইতে ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। মেহেরউন্নিসা তাঁহার দিকে চাহিয়া, এক মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "রাজপুতকুললক্ষ্মী! তোমার দয়া মেহেরজান ভুলিবে না। তোমার মিষ্ট কথা—এ অভাগিনী ভুলিবে না। এ জীবনে নয়—মরিলেও নয়। আমার সব গিয়াছে। কল্যাণী, তুমিই খালি আছ। পাটরাণী হইবার উপযুক্তই তুমি।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

লোহিত প্রস্তরময় বিচিত্র কারুকার্য্য-খোদিত, এক নিভৃত কক্ষে, রত্নখচিত সুকোমল শয্যায় অঙ্গ হেলাইয়া, মহারাণী যোধাবাই সন্ধ্যার পর বিশ্রাম করিতেছিলেন। গৃহের কোন স্থানে গণেশের মূর্ত্তি—কোথাও

বা কালিকার দৈত্যসংহারিণী মূর্ত্তি—কোথাও বা হিমাদ্রিশিখরে মদন-ভস্ম, কোথাও বা রতি-বিলাপ, কোথাও বা গভীর অরণ্যানীমধ্যে উচ্ছ্বসিত চন্দ্রালোকে মহাশ্বেতার বিষাদমাখা নৈশসঙ্গীত-চিত্র।

ভিত্তিগাত্রস্থ, বীণাবাদিনী মহাশ্বেতার চিত্রখানার প্রতি, মহারাণী মাঝে মাঝে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। তাঁহার প্রাণে একটা মৃদু অথচ গুপ্ত সঙ্গীতোচ্ছ্বাস বহিতেছিল। এক একবার উন্মুক্ত বাতায়নপথে, সান্ধ্য-গগনের দুই একটা ফুটন্ত উজ্জ্বল তারকার প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছিলেন। কখনও বা নিকটস্থ স্বর্ণময় তাম্বূলাধার হইতে এক আধটী সোণালী-রঞ্জিত, মৃগনাভিবাসিত, তাম্বুল লইয়া সেই রক্তোৎফুল্ল ওষ্ঠাধরকে আরও রঞ্জিত করিয়া, রজত-পিকদানিতে তাহার লোহিত-রস পরিত্যাগ করিতেছিলেন।

বাদসাহের সন্ধ্যার পর আসিবার কথা আছে। কাল তাঁর জন্মোৎসব। সমস্ত আগরা কাল উৎসবানন্দে ভাসিবে। বিলম্ব দেখিয়া মহারাণী অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন। ভিত্তিগাত্রাবলম্বিত একটী বীণা লইয়া, ধীরে ধীরে সেই সুকোমল চম্পকবৎ রক্তাভ অঙ্গুলির আঘাতে, তাহাতে মধুর ঝঙ্কার তুলিলেন।

সুরটা সহজেই মিলিল। পরদায় পরদায় সেই সুন্দর অঙ্গুলিগুলি ষড়্জ, গান্ধার, রেখাব, ধৈবত ও পঞ্চম লইয়া আলাপ করিতে লাগিল। রাণী তাহার সহিত নিজের কোকিল কণ্ঠ মিশাইলেন। তিনি গাহিতে লাগিলেন,—

"পিয়ারে! সইয়াঁ দিনওয়া বহুত গৈল বীত্,
যব্ সে গ'য়ে মেরি, সুধহু সো পিয়ারী,
কৌন্ গাঁওকে রীত্?
তন্ মন্ ধন্ মোরা, তোঁহিকে সোপঁহু,
ইহ কৈসে অনরীত।

সুর ক্রমে ক্রমে পঞ্চমে উঠিল। বীণা বড় মিঠে বলিতে লাগিল। বাতাস সেই পঞ্চমের মাধুরীমাখা সুর লইয়া, পাষাণময় চিত্রিত কক্ষ-মধ্যে ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল। সেই দর্পণখণ্ডিত ভিত্তি-গাত্রে মূর্চ্ছনা-মাখা সুরগুলি আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

অর্দ্ধোন্মুক্ত দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইয়া, একজন গান শুনিতেছিলেন। মহারাণী বিরক্ত হইয়া বীণ্ রাখিয়া দিলেন দেখিয়া, তিনি গৃহে প্রবেশ করিলেন। মহারাণী পিছন ফিরিয়াছিলেন, দেখিতে পান নাই। কিন্তু সম্মুখের দর্পণে মনুষ্যের প্রতিবিম্ব দেখিয়া চিনিতে পারিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রবেশকারী আর কেহই নহে,—স্বয়ং দিল্লীশ্বর।

দিল্লীশ্বর প্রেমপূর্ণকণ্ঠে বলিলেন,—"হৃদয়েশ্বরি! এত দিনের পর এ বয়সে, বসন্তের বিরহ জাগাইয়া তুলিলে কেন?"

মহারাণী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"এ বিরহ আমার নয় জাঁহাপনা! ধার করিয়া আনিয়াছি।"

জাঁহাগীর সাহ হাসিয়া বলিলেন,—"মন্দ ব্যবসা নয়, কিন্তু তোমার ঐ মারবারী গানটা আমার বড় ভাল লাগে।"

যোধাবাইয়ের অলকগুলি, তখন উন্মুক্ত বাতায়ন-প্রবিষ্ট, মৃদু বায়ু স্রোতে ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছিল। সহস্র দীপাধারের উজ্জ্বল আলোক, সেই অবগুণ্ঠনচ্যুত সুন্দর মুখে পড়িয়া অতি সুন্দর দেখাইতে-ছিল। জাঁহাগীর সাহ, সেই মৃদু মলয়োৎক্ষিপ্ত অলকগুলি ধীরে ধীরে গুছাইয়া দিতে লাগিলেন। সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অসময়ে কেন ডাকিয়াছ মহারাণি?"

"কাল আপনার জন্মোৎসব। দেশের দীন দরিদ্র আশানুরূপ ভিক্ষা পাইবে। আমি হিন্দুস্থানের মহারাজ্ঞী, আপনার পাটরাণী হইয়া এই উৎসব উপলক্ষে, আপনার কাছে কিছু ভিক্ষা করিব।"

"কি ভিক্ষা! দিল্লীশ্বরী কিসের ভিখারিণী? কি চাও মহারাণি?"

"ক্ষমা।"

"কার জন্য?"

"আমার প্রিয়সখীর জন্য।"

"তোমার প্রিয়সখী—মতিরাণীর। কেন, সে তো কোন অপরাধ করে নাই? যুগান্তর ত তাহাকে দেখি নাই।"

"মতি নয়, আর একজন। সে মতিয়ার অপেক্ষাও আমার প্রিয়। আর কতদিন তাহাকে এরূপভাবে রাখিবেন? এত কষ্ট করিয়া গাছ হইতে ফুলটী ছিঁড়িয়া, তাহাকে আবার অনাদরে পদতলে ফেলিলেন কেন?"

জাঁহাগীর বুঝিলেন, মেহেরের কথা হইতেছে। প্রসঙ্গটা তাঁহার ভাল লাগিল না। বলিলেন,—"এই জন্যই কি ডাকিয়াছিলে?"

"হাঁ—জাঁহাপনা! দাসীর প্রার্থনা কি পূর্ণ করিবেন না?"

"করিব,—যেদিন সেই পদাঘাতের কষ্ট ভুলিব।"

"কে বলিল,—মেহের এ কথা বলিয়াছে?"

"পিয়ারী বেগম—সে নিজে ছদ্মবেশে বর্দ্ধমান গিয়াছিল। স্বকর্ণে শুনিয়াছে।"

"তার এত মাথাব্যথা কেন?"

"সে নিজের কাজে রাজমহলে গিয়াছিল। আমায় কোন খপর পাঠাইবে বলিয়া, মীর মুন্সীর সহিত বর্দ্ধমানে দেখা করিতে যায়। মেহেরউন্নিসার রূপটা কেমন,—তাই সে দেখিতে গিয়াছিল।"

"পিয়ারী বেগম মিথ্যাবাদিনী,—সে মেহেরের শত্রু।"

"হইতে পারে,—কিন্তু পদাঘাতের কথাটা সত্য। আমি বিশ্বাস করি নাই—কিন্তু গোপনে যেদিন মেহেরের সহিত দেখা করি—"

যোধাবাই উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন,—জাঁহাপনা! মার্জ্জনা

করিবেন। রমণী, রমণীর হৃদয় যতদূর বুঝে,—আর কেহ তত পারে না। মেহের স্বভাবতঃই অভিমানিনী। অভিমানে—একটু উপেক্ষা আনে। কিন্তু সেটা আন্তরিক নয়। যেরূপ অবস্থায় মেহের পুরী-প্রবেশ করিয়াছিল, সে অবস্থায় আপনার দেখা করা উচিত হয় নাই। প্রেমালাপ করিতে যাওয়া ভাল হয় নাই।"

জাঁহাগীর সাহ কি ভাবিতে লাগিলেন। বলিলেন,—"এখন কি করিতে হইবে?"

"কাল আপনার জন্মোৎসব। সকল বেগমেরা আনন্দোৎসবে মাতিবে। আমীর ওম্‌রাহের স্ত্রী, কন্যা ও ভগিনীতে রঙ্গমহাল পূর্ণ হইবে। এ বিশাল পুরীতে মেহের একা কেন বিষাদিনী থাকিবে? হৃদয়েশ্বর! তাহাকে আহ্বান করিয়া সকলের চেয়ে বেশী আদর করুন।"

"তোমার চেয়েও বেশী আদর করিব,—তোমার প্রাণে ব্যথা লাগিবে না?"

"না জাঁহাপনা! আমি আপনার পাটরাণী—আমি তার জন্য সিংহাসনের আধখানা ছাড়িয়া দিব।"

জাঁহাগীর সাহ মনে মনে ভাবিলেন,—রাজপুত-মেয়ের উপযুক্ত কথাই বটে। ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন,—"যাই বল, তোমার এ প্রার্থনা এখন পূর্ণ করিতে পারিব না মহারাণি! আমায় মার্জ্জনা করিও।"

যোধাবাই, অভিমানপূর্ণ-স্বরে বলিলেন,—"ছি—ছি—জাঁহাপনা! আপনি না এত বড় হিন্দুস্থানের সম্রাট্। আপনি অত নিষ্ঠুর হইলে লোকে বলিবে কি? মেহের—রমণীরত্ন। তাহার মর্ম্ম আপনি বুঝিলেন না। এই বড় কষ্ট! আজ এক বৎসর—সে ঘৃণায় আপনার অন্ন স্পর্শ করে নাই—নিজের শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ে দিন গুজরাণ্ করিতেছে। তার দাসী বাঁদীকে যে পোষাক দিয়াছে, ধন-রত্ন দিয়াছে, আপনার

বেগমদের অনেকের তা নাই। দিল্লীশ্বরের পাটরাণী হইবার সেই ত উপযুক্ত।"

জাঁহাগীর সাহ, মেহেরের এ দুরবস্থার কথা শোনেন নাই,—কেহ তাঁহাকে শোনায় নাই। তিনি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। আবার সেই পুরাতন অনুরাগ-স্ফুলিঙ্গ একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কোমল-স্বরে বাদসাহ বলিলেন,—"তুমি কি তার মহলে যাও?"

"প্রায়ই,—অভিমানে সে এখানে আসে না। আমি তাকে ভালবাসি, তাই যাই,—না দেখিলে থাকিতে পারি না।"

বাদসাহ একটু কোমল-স্বরে বলিলেন,—

"কাল মীর মুন্সীকে শাসন করিয়া দিব। আমি তাহাকে রাজরাণীর মত বন্দোবস্তে রাখিতে বলিয়াছি।"

"মীর মুন্সীর দোষ নাই। মেহের নিজে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। আমি একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'তোমার বাঁদীদের এত সুখে রাখিয়াছ—নিজে কেন এত কষ্ট পাও?' মেহের বলিল,—এরা আমার বাঁদী, আমার নিজের ইচ্ছামত ইহাদের সুখী করিয়াছি। আমি যাঁর বাঁদী, তিনি যেমন রাখিয়াছেন, তেমনি আছি।"

কথাটা শুনিয়া জাঁহাগীর সাহেবের প্রাণে একটা তীব্র আঘাত লাগিল, সেই পদাঘাতের কল্পিত-আঘাতটা যেন একটু সরিয়া গেল। মেহেরের সেই শরতের পূর্ণশশীর ন্যায় যৌবনের পরিস্ফুট সৌন্দর্য্য—কালবৈশাখীর মেঘের ন্যায় তাহার হৃদয়ের এক কোণে দেখা দিল। সেই মেঘমালা ফুলিয়া ফুলিয়া বড় হইল। তিনি মনে মনে বলিলেন,—"এত গুণ তার! আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।" প্রকাশ্যে বলিলেন,—"মহারাণি! কাল তোমার অনুরোধ পালন করিতে পারিব না। দুই একদিন পরে বিবেচনা করিয়া দেখিব।"

"জাঁহাপনা—হৃদয়েশ্বর! এ অপমানে তাহার বুক ভাঙ্গিয়া যাইবে।

সকলে আমন্ত্রিত হইয়া আনন্দে ভাসিবে, সে যখন শুনিবে, এই উৎসব-ক্ষেত্রে কেহ তাঁহাকে খোঁজে নাই, সে অভিমানে বিষ খাইবে।”

জাঁহাগীর এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহার হৃদয়ে বৃশ্চিক-দংশনবৎ একটা জ্বালা উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি সে জ্বালায় বড় অস্থির হইয়া পড়িলেন। তখন দিল্লীশ্বরীর সাহায্য, যেন তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি সহসা গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন,—“পরশ্ব প্রাতে ইহার উত্তর দিব। আজ অনেক কাজ।”

দ্রুতপদে জাঁহাগীর সাহ কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। যোধা-বাই, বাদসাহের অবস্থা দেখিয়া বুঝিলেন, ঔষধ ধরিয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ

আগরার অনতিদূরে এক গুল্মাচ্ছাদিত ভগ্ন মস্‌জিদে অনেক দিন হইতেই সেলিম সা নামক এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বাস করিতেছিলেন। লোকে জানিত, সেলিম সা সর্ব্বজ্ঞ,—কিন্তু সেই স্থানটা ভীষণ জঙ্গল-বেষ্টিত বলিয়া—আর ভূতপ্রেত-ঘটিত একটা অপবাদ তাহার নামের সহিত লিপ্ত থাকায়, কেহ সেখানে দিবাভাগেও যাইতে সাহস করিত না।

সেলিম সা, আক্‌বর সাহের সভায় মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিতেন। তাঁর মৃত্যুর পর আর কেহ তাঁহাকে রাজপুরীতে প্রবেশ করিতে দেখে নাই। মুসলমান-ফকির হইলেও হিন্দু-জ্যোতিষে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল।

এক স্তিমিত দীপালোকে বসিয়া, বৃদ্ধ ফকির খড়ি দ্বারা নিবিষ্টমনে অঙ্কপাত করিতেছেন। আর তাঁহার নিকটে বসিয়া এক ক্ষুদ্রাঙ্গী পরমা রূপসী সেইদিকে চাহিয়া রহিয়াছে। সেই স্তিমিত দীপের আলোক

তাহার সুন্দর মুখের উপর পড়ায়, অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। বোধ হইতেছিল, আলোটা যেন তাহার রূপের আভায় মলিন হইতেছে।

সন্ন্যাসী মুখ তুলিলেন। রমণী, কোকিল-কণ্ঠ-বিনিন্দিত-স্বরে প্রশ্ন করিলেন,—"কি দেখিলেন প্রভু?"

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"মা! তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না।"

"দিল্লীর সিংহাসন তবে আমার নয়?"

"না—"

"কেন নয়?"

"আর এক সৌভাগ্যবতী তোমার অদৃষ্টকে অন্তরাল করিয়া আছে। তাহার তিরোভাব না হইলে—"

"তাহাকে উন্মূলিত করিব।"

"অসম্ভব—তা করিও না। নারীহত্যা মহাপাপ। তোমার সাধ্য কি মা—যে অদৃষ্টলিপি খণ্ডন কর।"

"তবে কি হইবে প্রভু! আমার পরিণাম কি? বড় জ্বালায় জ্বলিতেছি।"

"পরিণামের কথা শুনিও না,—ভয় পাইবে।"

"ভয় পাইলে, এত রাত্রে দিল্লীশ্বরের প্রিয়তমা হইয়া, আপনার নিকট আসিতাম না। কি দেখিলেন, খুলিয়া বলুন।"

"তোমার অদৃষ্টে অপঘাত দেখিতেছি। বিষ, না হয় শাণিত-ছুরিকায় তোমার জীবন নষ্ট হইবে।"

রমণী শিহরিয়া উঠিল। তাহার শরীরে বিদ্যুৎস্রোত বহিল, এক অব্যক্ত যাতনায় তাহার প্রাণ, ভূগর্ভস্থ মহোষ্ণ ধাতুস্রাবের ন্যায় জ্বালাময় হইল। ক্ষিপ্রগতিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—"চরণ-বন্দনা করিতেছি, বিদায় দিউন।"

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"একাকী যাইবে মা! রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হয়।"

"কিছুই ভয় নাই। অদূরে শিবিকা আছে।"

"আমি না হয় সঙ্গে যাই।"

"কোন প্রয়োজন নাই।"

রমণী একাই চলিয়া গেল। সম্মুখে আঁকাবাঁকা জনসমাগম-শূন্য অন্ধকার-বেষ্টিত প্রশস্ত রাজপথ। এমন সময়ে কে যেন পশ্চাৎ হইতে তাহার বস্ত্রাঞ্চল স্পর্শ করিল। মৃদুস্বরে ডাকিল,—"পিয়ারি বেগম!"

রমণী ফিরিয়া দাঁড়াইল—দেখিল, সম্মুখে আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত মনুষ্যমূর্ত্তি। কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"কে তুমি? কেন আমার পথরোধ করিলে?"

"পিয়ারী বেগম—আমি তোমার শত্রু নই। মিত্র ভাবিও—এ রাত্রে কোথায় গিয়াছিলে?"

"সে খপরে তোমার প্রয়োজন কি?"

"আছে,—না হইলে জিজ্ঞাসা করিতাম না। সেলিম সা ফকির যে উপকার করিতে না পারিয়াছে, আমি তাহা করিব। তোমার কণ্টক উদ্ধার করিব।"

পিয়ারি আশ্চর্য্য হইল। এমন বিপদে সে কখনও পড়ে নাই। সাহস অবলম্বনে বলিল,—"অজানিত পান্থকে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। রাজপথ, সকল কথার উপযুক্ত নহে। আমার সঙ্গে এস।"

"আর তুমি আমায় ধরাইয়া দাও। না—পিয়ারি, তা হইবে না। ঐ দেখ, উপরে অনন্ত নীলিমাময় আকাশ। আর তার উপর একজন অন্তর্য্যামী—তাঁহার নামে দুইজনে শপথ করি এস,—কেহ কাহারও অনিষ্ট করিব না।"

পিয়ারি ভাবিল,—এরূপ শপথে দোষ কি, বলিল,—"আচ্ছা, তাহাই করিলাম। এখন তুমি কি চাও?"

"মনে পড়ে পিয়ারি! তুমি যখন বর্দ্ধমানে মেহের উন্নিসাকে দেখিতে যাও, কে তোমায় বৃদ্ধ-সেনাপতি রহমতের হুকুমে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত অগ্রসর করিয়া দেখিয়াছিল?"

"মনে আছে—সে রোস্তম-আলি সেনাপতি। কিন্তু সে ত মরিয়াছে শুনিয়াছি।"

"রোস্তম-আলি মরে নাই—বেগমসাহেব! সে তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া।"

পিয়ারি শিহরিয়া উঠিল। ভগ্ন মস্‌জিদের ভূতের কথাটা এতক্ষণের পর তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। সে মনে মনে নবীগণের পবিত্র নাম স্মরণ করিতে লাগিল।

রোস্তম বলিল,—"পিয়ারি! আমি মরি নাই। যাহার হৃদয়ে প্রেম আছে,—সে মরে না। রহমৎ আমায় কারাগারে দিয়াছিল। আমি পলাইয়া ছদ্মবেশে ঘুরিতেছি। মৃত্যু-সংবাদ নিজেই রটাইয়াছি। যাহার আশা আছে, সে মরিবে কেন পিয়ারি?"

"তুমি কি চাও রোস্তম! এখন তোমায় বিশ্বাস করিতে পারি।"

"কি চাই—যার জন্য পলে পলে দগ্ধ হইতেছি, যার জন্য মানসম্ভ্রম সব গেল,—চোরের ন্যায় পথে পথে ফিরিতেছি,—দিবালোকে লোকালয়ে বাহির হই না,—তাহাকে চাই। যে শত্রু, তাহাকে চাই।"

"কে সে—?"

"মেহেরউন্নিসা।"

সর্ব্বনাশ! রোস্তম নিশ্চয় উন্মাদ! বলে কি! পিয়ারি এ কথার মর্ম্ম বুঝিল না। বলিল,—"তা আমার দ্বারা কি হইবে, আমি কি করিব?"

"তুমি সহায় হও পিয়ারি! তুমি এখনও কাহাকে ভালবাস নাই—

ভালবাসার মর্ম্ম বুঝিবে কি? তুমি ধনরত্ন ভালবাস, তাই আজ এই গভীর-রাত্রে এই দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছ। আমি এই রমণী-রত্নকে ভালবাসি, তাঁর জন্য আজ এক দুঃসাহসিক কাজ করিব। তুমি আমায় দুর্গমধ্যে লইয়া যাও। তাহার মহল দেখাইয়া দাও। আমি তোমার জন্য জীবন সমর্পণ করিব।"

পিয়ারি মনে মনে এক নূতন সঙ্কল্প আঁটিল। সে সঙ্কল্প সিদ্ধকল্পে এই দুরাচার রোস্তমকেই সহায় ভাবিল। কাল প্রাতে জগতের চক্ষে যদি মেহেরউন্নিসা কলঙ্কিনী হয়,—তাহা হইলে তাঁহার পথ অতি পরিষ্কার। ভাবিয়া বলিল,—"না হয় তোমায় দুর্গমধ্যে প্রবেশ করাইলাম, তারপর তুমি কি করিবে?"

"আমি তাহাকে একবার দেখিব। এই দেখ, আমি স্বহস্ত-রোপিত এক গোলাপের কোরক সংগ্রহ করিয়া, তাহাকে প্রেমোপহার দিতে যাইতেছি। একবার দেখিয়া আবার ফিরিব, তারপর যে দিকে চোখ চায়, সেই দিকে যাইব।"

পিয়ারি বলিল,—"আমার সঙ্গে এস। কিন্তু এই ফকিরবেশেই যাইবে?"

রোস্তম বলিল,—"হাঁ,—আমি সেলিম সার শিষ্য—এই বলিয়া পরিচিত। যদি ধরা পড়ি—এই বেশের সহায়তায় অপরাধটা লঘু করিয়া লইব।"

পিয়ারি ভাবিল,—যুক্তি মন্দ নহে। দুইজনে সেই অন্ধকার-রাশি মথিত করিয়া নিঃশব্দে অগ্রসর হইল।

নিকটেই একজন আমীর মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন। কতকগুলা স্তূপীকৃত প্রস্তরখণ্ড রাস্তার উপর পড়িয়াছিল। চতুষ্কোণ, ত্রিকোণ, সমতল আকারবিশিষ্ট প্রস্তরগুলা বড় ভারি। পিয়ারি বলিল,—"রোস্তম, একবার দাঁড়াও। তোমার বাহুতে শক্তি কত?"

রোস্তম আশ্চর্য্য হইল। কথাটার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বলিল,—"অনেক দিন সৈনিকব্রত ত্যাগ করিয়াছি। কার্য্যক্ষেত্রে না হইলে বলিতে পারি না।"

"এই বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সরাইয়া রাখ।"

রোস্তম অবলীলাক্রমে তাহাই করিল।

পিয়ারি বলিল,—"দুর্গে প্রবেশের পূর্ব্বে একটা প্রতিজ্ঞা কর। আমি তোমার প্রত্যাবর্ত্তন-পথ পরিষ্কার করিয়া দিব। তুমি মেহের-উন্নিসাকে লইয়া এই রাত্রেই বাহিরে আসিবে। একটা রমণীর ভার অবশ্যই এই সুবৃহৎ প্রস্তরখানার অপেক্ষা অধিক নয়। বিশেষতঃ তুমি তাহাকে ভালবাস।"

রোস্তম বলিল,—"তোমার উদ্দেশ্য বুঝিয়াছি। তুমি তাহাকে কলঙ্কিনী করিয়া, নিজের পথ পরিষ্কার করিতে চাও। কিন্তু পিয়ারি, আমি তাহাকে ভালবাসি। তাহার সর্ব্বনাশ করিতে পারিব না।"

পিয়ারি ক্রোধের সহিত বলিল,—"তবে এইখানে থাক। দুর্গে প্রবেশ করিতে পারিবে না।"

সম্মুখে রক্তপ্রস্তরময় প্রকাণ্ড দুর্গ-তোরণ। আর বিবেচনার অবসর নাই। রোস্তম মনে মনে ভাবিল,—একদিকে বিরহ, অপরদিকে মিলন; একদিকে বেহেস্ত, অপরদিকে জাহান্নম্; একদিকে পবিত্র নবীগণ, অপরদিকে দুরাচার শয়তান। সে শয়তানের দাসত্ব স্বীকার করিল। পিয়ারির কলঙ্কিত প্রস্তাবেই দুরাচার স্বীকৃত হইল।

দুর্গ-প্রবেশের আর কোন বাধা ঘটিল না।

দশম পরিচ্ছেদ

রাত্রি পোহাইলেই আগরা উৎসবে মাতিবে। বেগমমহলে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। কোন্ পেশোয়াজটী পরিলে কাহাকে ভাল

দেখাইবে, কোন্ অলঙ্কারখানি কোথায় পরিলে সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিবে, রূপটা কি করিয়া মাজিয়া ঘষিয়া ভাল করিতে হইবে, এই সব চিন্তায় রঙ্গমহালের রূপসীরা উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত। দরিদ্রেরা ইচ্ছামত ধন প্রাপ্তির আশায়, আমীর ওমরাহেরা পদগৌরববৃদ্ধির ও খেলাৎপ্রাপ্তির আশায় উৎফুল্লচিত্ত। সে সুখের রজনী অনেকেই সুখে কাটাইতেছে।

আদর নাই, আমন্ত্রণ নাই, আহ্বান নাই, অনাদরে অভিমানিনী মেহের, নিজের সুখ-শয্যায় সুষুপ্ত। গৃহমধ্যে স্তিমিত দীপ জ্বলিতেছে। সেই দীপালোকে সেই সুন্দর অথচ চিন্তা-বিশীর্ণ মুখ কি সুন্দরই দেখাইতেছে।

পাপিষ্ঠ রোস্তম, গৃহের দ্বার খোলা পাইয়া ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। যাহা দেখিল,—তাহাতে ভুলিল, মজিল, মরিল। সে একবার অগ্রসর হয়, দশবার পিছাইয়া আসে। দেখিয়াও আশা মেটে না, চোখেও পলক পড়ে না, প্রাণের তৃপ্তি হয় না। অত সুন্দর সে! আজন্ম দেখিলেও তৃপ্তি হয় না।

হস্তে সেই অফুটন্ত গোলাপগুচ্ছ—উন্মাদের দুর্দ্দম-হৃদয়ের দুরাকাঙ্ক্ষা-ময় প্রেমোপহার। রোস্তমের ইচ্ছা হইল, সে দুটা কথা কয়—কিন্তু কেহ যেন কণ্ঠ চাপিয়া ধরে। বলে—ছিঃ! নিদ্রা ভাঙ্গিও না। ইচ্ছা হয়, সেই কোমল অঙ্গ স্পর্শ করিয়া সুখী হয়,—কে যেন তাহার হস্তখানি বৈদ্যুতিক-শক্তিতে ধরিয়া রাখে। সেই সদা-প্রফুল্ল আজন্ম-সুন্দর, বিশীর্ণ গণ্ডে একটী আকাঙ্ক্ষিত চুম্বন-রেখা রাখিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছে—কে যেন তাহার কাণে কাণে বলে,—ছি! পাপিষ্ঠ, অতদূর অগ্রসর হইও না।

সেই গোলাপগুচ্ছ লইয়া ধীরে ধীরে রোস্তম, মেহেরের শয্যাপার্শ্বে রাখিল। আবার একদৃষ্টে সেই ভুবনমোহিনী উন্মাদিনী সৌন্দর্য্য প্রাণ ভরিয়া দেখিল। পলকে পলকে তাহার কলঙ্কিত হৃদিকক্ষ, বাসনার

তড়িৎস্রোতে আন্দোলিত হইতে লাগিল। পিয়ারি যাহা বলিয়াছে, সে তাহা করিতে পারিল না। সেই নিদ্রিত-দেহ বহন করিয়া লইয়া যাওয়া দূরে থাক্, সে তাহা স্পর্শ করিতে পারিল না। তাহার চোখের সম্মুখে কে যেন নরকের যবনিকা খুলিয়া দিল। সে বীভৎস দৃশ্যে—পাপিষ্ঠ যেন শিহরিয়া উঠিল।

সময় নাই—আর বিলম্ব করিলে সে নিজে মরিবে। পিয়ারি বেশীক্ষণ ত অপেক্ষা করিবে না। রোস্তম—আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ—অতৃপ্ত-হৃদয়ে ফিরিল। তাঁহার বুকের ভিতর পাঁজার আগুন জ্বলিতে লাগিল। পিয়ারির কলঙ্কিত অনুরোধে পদাঘাত করিল। অস্ফুটস্বরে বলিল,—"পিয়ারি! সর্ব্বনাশি! তোর অনুরোধে পদাঘাত করি। মেহেরজান, তুমি অত সুন্দর, অত পবিত্র, তোমায় কত ভালবাসি—তোমার সর্ব্বনাশ করিতে চাহি না। না হয় নিজে আজীবন দগ্ধ হইব,—পলে পলে পুড়িয়া মরিব,—তবু পিয়ারি সয়তানীর কথা শুনিব না।

রোস্তম, উন্মাদের মত গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

*　　*　　*　　*　　*

সম্মুখেই দেখিল,—সেই পুরীর প্রবেশ-দ্বারে কে দাঁড়াইয়া আছে। সে মনে করিল, পিয়ারি। বলিল, "পিয়ারি! বিলম্ব হইয়াছে, মার্জ্জনা কর—আমি তোমার সহায়তা করিতে পারিব না।"

পিয়ারিকে সম্বোধন করিয়া রোস্তম যাহা বলিল, তাহার জবাব পাইল না। তখন সেই অন্ধকারে রোস্তম ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিল,—এ পিয়ারি নয়। পিয়ারি খর্ব্বাঙ্গী—এ যে দীর্ঘকায়। সে রমণী,—এ পুরুষ। রোস্তম ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল।

গম্ভীরস্বরে সেই কক্ষদ্বারস্থ পুরুষ প্রশ্ন করিলেন,—"কে তুমি?"

রোস্তম বলিল,—"আপনি কে?"

সেই অপরিচিত মূর্ত্তি উত্তর না করিয়া অগ্রসর হইলেন। দৃঢ়মুষ্টিতে

রোস্তমের হাত ধরিলেন। বলিলেন,—"পাপিষ্ঠ! সয়তান! এ রাত্রে মেহের উন্নিসার কক্ষে কি করিতে গিয়াছিলে?"

হা—সর্ব্বনাশ! সে স্বর—সে মূর্ত্তি যে হতভাগ্য রোস্তমের পরিচিত। হতভাগ্য দেখিল, মৃত্যু—শিয়রে। কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল,—"জাঁহাপনা! জগতের সম্রাট্! সাহান সা! আমায় বধ করুন। আমি অতি পাপিষ্ঠ—বিশ্বাসঘাতক।"

সেই ছদ্মবেশী পুরুষ আর কেহই নহেন—স্বয়ং দিল্লীশ্বর। দিল্লীশ্বর সেই গভীর রাত্রে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, মেহেরকে নিজে নিমন্ত্রণ করিতে গোপনে আসিতেছিলেন। গৃহদ্বার উন্মুক্ত—ফকির-বেশী অপরিচিত ব্যক্তিকে মেহের উন্নিসার শয্যাপার্শ্বে দেখিয়া, তিনি স্তম্ভিত হইয়া, সেই দুঃসাহসিকের ক্রিয়াকাণ্ড দেখিতেছিলেন। সে লোক যখন কক্ষ হইতে বাহির হইল, তখন তিনি পুরীর দ্বারে দাঁড়াইলেন। এই পথ ভিন্ন পুরী হইতে বাহির হইবার অন্য উপায় ছিল না।

জাঁহাগীর গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"রোস্তম! তুমি পাপিষ্ঠ! সয়তান অপেক্ষাও অধম। যে পুরীতে মক্ষিকার প্রবেশপথ নাই, তাহাতে তুমি কাহার সহায়তায় প্রবেশ করিলে? পিয়ারি বেগমের নাম করিতেছিলে কেন?"

রোস্তম উত্তর করিল না। কাঁপিতে লাগিল। বাদসাহ তাহার হস্ত পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"রোস্তম! আমি তোমায় উপযুক্ত ভাবিয়া, তোমার মৃত-পিতার গুণাবলীর স্মরণার্থে অতি অল্পবয়সেই উচ্চপদ দিয়াছিলাম। তুমি তাহার যথেষ্ট অপব্যবহার করিয়াছ। যে আমার আকাঙ্ক্ষিত ধন,—যাহার সহিত দেখা করিতে আমি সাহসী হই না,—সেই মেহেরউন্নিসার পবিত্র কক্ষ তোমার দ্বারা কলঙ্কিত হইয়াছে। তাহার পবিত্র দেহ, তোমার জঘন্য হস্ত-স্পর্শে—"

রোস্তম উত্তেজিতকণ্ঠে বলিল,—"প্রভু!—দিল্লীশ্বর! আমার কথা

বিশ্বাস করিবেন কি? মেহেরের পবিত্র দেহ স্পর্শ করা আমার ন্যায় কুক্কুরের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু চোখের দেখায় পাপ আছে কি?"

"বল, কে তোমায় পুরী-প্রবেশের সহায়তা করিয়াছে?"

রোস্তম কম্পিতকলেবরে ভূতলে বসিয়া পড়িল। অশ্রুপূর্ণনেত্রে বলিল,—"দুনিয়ার মালিক! যে দণ্ড হয়, আমায় দিন্। সে কথা বলিতে পারিব না। এখনই আপনার কটিস্থ অস্ত্রে আমায় দ্বিধা করুন।"

"মৃত্যু, তোমার পক্ষে অতি লঘুদণ্ড। আমি তোমায় জীবন্ত প্রোথিত করিয়া, কুকুর দিয়া খাওয়াইব, অগ্নিতে তোমার পাপ-দেহ অর্দ্ধ-দগ্ধ করিয়া, রাজপথে নিক্ষেপ করাইব।"

রোস্তম, মৃত্যু সম্মুখে দেখিয়া শুষ্ককণ্ঠে বলিল,—"সেও সহ্য করিব, জাঁহাপনা! কিন্তু বিশ্বাসহন্তা হইব না। একবার করিয়াছি বলিয়া, বারবার বিশ্বাসের অপচয় করিব না।"

জাঁহাগীর সাহ গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিলেন,—"কে আছিস্।"

দুইজন ভীমকায় প্রহরী আসিয়া সেলাম করিল। বাদসাহ আদেশ করিলেন,—"এই হতভাগ্যকে শৃঙ্খলিত করিয়া, হাবুজখানায় রাখিয়া দাও। পরে বিচার করিব।"

রোস্তম কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"প্রভু! আপনার দণ্ড শিরোধার্য্য করিলাম। মৃত্যু শিয়রে—মিথ্যা কথা বলিব না। মাথার উপরে জগতের সম্রাট্—সবই দেখিতেছেন। মেহেরউন্নিসা নিষ্কলঙ্কিনী। তিনিই তাহার সাক্ষী—"

রোস্তম, প্রহরী-বেষ্টিত হইয়া কারাগারে গেল। বাদসাহ আর মেহেরের কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

দিন কাহারও সুখে কাটে, কাহারও দুঃখে কাটে। যাহার সুখে কাটে, সে মনে ভাবে, এমনই বুঝি চিরকাল যাইবে। যাহার দুঃখে কাটে, সেও ভাবে, তাহার সুখের দিন আর আসিবে না। কিন্তু দিন কাহারও বাধ্য নয়।

সেই বাদসাহের জন্মোৎসবের দিন—যে দিনের প্রভাত, আনন্দ লইয়া আগরার প্রাসাদে দেখা দিয়াছিল,—সে দিন কাটিয়াছে। সমগ্র নগরীর বিচিত্র ধ্বজপতাকা-শোভিত বিচিত্রতা তখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই সুখের দিনে, দুইজন কেবল নিরানন্দে কাটাইয়াছেন। যাঁহার জন্মোৎসবে এই আনন্দ, স্বয়ং সেই দিল্লীশ্বর—আর সেই অনাদর-পরিত্যক্তা নিরাশা-জর্জ্জরিতা অভাগিনী মেহেরউন্নিসা।

রাত্রি এক প্রহর উত্তীর্ণ। মেহের নিজ কক্ষে বসিয়া বিষন্নমনে ভাবিতেছেন, "এতদিনে বুঝি সব ফুরাইল। এই আনন্দের দিনে তিনি সকলকে সুখী করিলেন, আর আমি তাঁর কি করিয়াছি। এরূপ ঘৃণিত বন্দিনী-অবস্থায় দিন কাটান বড়ই জ্বালাময়। আর মতি—প্রিয়সখি মতি—কৈ সে ত একবার আসিয়া দেখিল না। হায় অদৃষ্ট!"

"যে জীবন শূন্য—তাহা রাখিবার প্রয়োজন কি? আজীবন অনল-জ্বালা হৃদয়ে পোষণ করিয়া রাখা অপেক্ষা কি তাহা নিভান ভাল নয়? আশা, ভরসা, প্রেম, সোহাগ, আদর সবই গিয়াছে। এ জীবনদীপ আজই নিভাইব। মতিয়া ত বলিয়া দিয়াছিল,—অনাদর দেখিলে মরিও।"

মেহের আকুলকণ্ঠে ঊর্দ্ধনেত্রে উপরের দিকে চাহিল। তাহার বিশীর্ণ গণ্ডে বর্ষার ধারা। হৃদয়ে মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস, প্রাণে অনন্ত যাতনা—জীবনে নিরাশা, আর সম্মুখে বিষপাত্র। মেহের ভাবিল,—"আজ সকলেই শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়াছে। বাঁদীগুলাকে আনন্দ করিবার জন্য

ছাড়িয়া দিয়াছি। এর চেয়ে আর সুযোগ কোথায়? আজ মরিব। হে জগদীশ্বর! হে দয়াময়! হে অগতির গতি! তুমি সাক্ষী। আর এ অবিশ্রান্ত দুঃখ ভাল লাগে না। আর এ ঘৃণিত অবস্থা ভাল লাগে না। কোথায় তুমি হৃদয়েশ্বর! বড় আদরে হৃদয়ে রাখিতে—একদণ্ড কাছ-ছাড়া করিতে না। আজ তোমার কবরের পাশে শুইয়া, সেই সুখের বর্দ্ধমানে মরিতে পারিলাম না—এই বড় দুঃখ! আর তুমি দুনিয়ার বাদসা অসীম ক্ষমতাশালী দিল্লীশ্বর, ধন্য তোমার করুণা! ধন্য তোমার প্রবৃত্তি! ধন্য তোমার মনুষ্যত্ব!"

সম্মুখে বিষপাত্র। একটু গলাধঃকরণ করিলে সকল জ্বালা মিটিয়া যায়। এ প্রলোভন মেহের ছাড়িতে পারিল না। সে ধীরে ধীরে তীব্র গরলাধার মুখে তুলিল। সেই তীব্র বিষকণা জিহ্বাগ্র স্পর্শ করিল। মুহূর্ত্তমধ্যে মাথা ঘুরিয়া উঠিল। এ সময় সহসা কে একজন ছুটিয়া আসিয়া, মেহেরের হাত হইতে সেই পাত্র লইয়া দূরে ফেলিয়া দিল।

মেহেরের তখনও চৈতন্য আছে। দেখিল, তাহার আদরের মতি-রাণী। মতি, মেহেরের গলা জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"কি করিলে সখি! কেন এমন সর্ব্বনাশ করিলে! হায়! আমি অভাগিনী যদি একটু আগে আসিতাম!"

মেহের বলিল,—"সখি! এতদিনে বুঝি সব ফুরাইল। তোমার কোলে মাথা রাখিয়া মরিতে পারিব,—এ আনন্দেও এখন উৎফুল্ল হইতেছি। তোমার কাল আসিবার কথা ছিল। একটু আগে যদি আসিতে—"

মতি বলিল,—"দৈব-দুর্ঘটনায় আসা হয় নাই, রাজা পীড়িত। এখন উপায়,—হাকিম ডাকি।"

মেহেরের বিশুষ্ক ওষ্ঠাধরে নিরাশার হাসি আসিল। বলিল,—"জানি না, কতটা বিষ উদরস্থ হইয়াছে! কিন্তু বড় যাতনা—হাকিম আমার কি করিবে?"

মতিয়া, নিজের দাসীকে মহারাণী যোধবাইয়ের নিকট পাঠাইল। সমস্ত ঘটনা মুখে বলিতে বলিল। দিল্লীশ্বরী সংবাদ পাইয়াই এক বৃদ্ধ হাকিমকে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

হাকিম-সাহেব মেহেরের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—"কিছু ভয় নাই। বিষ বেশী উদরস্থ হয় নাই। ঔষধ দিতেছি, বমন হইয়া গেলে, চেতনা আবার ফিরিবে।"

মতিয়া, মেহেরকে কোলে লইয়া বসিল। স্বয়ং মহারাণী ঔষধ বাটিতে বসিলেন। ঔষধ সেবন করান হইল। বমনের পর রোগিণী অনেক সুস্থা হইল। মতিয়া ও মহারাজ্ঞী যোধাবাই, তুইজনে ধরাধরি করিয়া মেহেরকে শয্যায় শোয়াইলেন।

মেহেরকে নিদ্রিত দেখিয়া মহারাণী চলিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন,—"আবার আসিব,—কিন্তু মধ্যে সংবাদ দিও।"

* * * *

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে। মেহের অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়াছে। তাহার চেতনা ফিরিয়া আসিয়াছে দেখিয়া, মতিয়ার মুখে হাসি ধরে না। মতিয়া, মেহেরের কণ্ঠলগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"মেহেরজান! পিয়ারি! কেমন আছ?"

"অনেকটা ভাল, কিন্তু কেন আমায় বাঁচাইলে সখি! মরিলে যে ভাল হইত।"

"ছি ও কথা আর বলিও না। মরা ত আশ্চর্য্য কথা নয়। আমি মুহূর্ত্ত পরে পৌঁছিলেই ত সব শেষ হইত। তুমি সুস্থ হও,—তারপর এ পাপপুরী পরিত্যাগ করিব। এখন ঘুমাও।"

মেহের চক্ষু মুদিল। মতিয়া ব্যজন করিতে লাগিল। গাঢ় সুষুপ্তির লক্ষণ দেখিয়া, মতিয়া একজন বাঁদীকে ডাকিয়া দিয়া, বাহিরের দালানে বেড়াইতে লাগিল।

অষ্টমীর চন্দ্রের ক্ষীণ-রশ্মি সেই নিভৃত মহলের বিস্তৃত স্তম্ভের উপর মলিন হইয়া পড়িয়াছে। দালানটা অস্ফুট অন্ধকারে ডুবিয়া আসিতেছে। মতি দেখিল, কে একজন দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতেছে,—সে মূর্ত্তি পুরুষের। মতিয়া একটু শিহরিয়া উঠিয়া, দ্বারের নিকট দাঁড়াইল।

সেই মূর্ত্তিও অগ্রসর হইয়া দেখিল,—দ্বারের নিকট একজন স্ত্রীলোক। সে যেন দ্বার আগলাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মতিয়া সেই অস্ফুট জ্যোৎস্নালোকে আগন্তুককে যেন চিনিতে পারিল,—কিন্তু কথা কহিল না।

আগন্তুক, দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইয়া শশব্যস্তে বলিলেন,—"কে তুমি? দ্বার ছাড়িয়া দাও।"

মতি, কঠোর হাস্যের সহিত বলিল,—"আমায় চিনিতে পারিতেছেন না জাঁহাপনা!"

জাঁহাগীর এবার চিনিলেন। আগ্রহের সহিত বলিলেন,—"মতি! মতিবিবি! কখন আসিলে? তুমি এখানে কেন?"

"যাহার দুনিয়ায় কেহ নাই—তাহার সেবার জন্য সেই বিধাতা আমায় এখানে পাঠাইয়াছেন। আপনি এখানে কি চান্?"

"মতি! একটা জনরব শুনিলাম, মেহের অভিমানে বিষ খাইয়াছে,—কথাটা কি সত্য?"

"যা শুনিয়াছেন জাঁহাপনা! তাহ ঠিক—সব ফুরাইয়াছে। আপনার কীর্ত্তি আরও গৌরবান্বিত হইয়াছে।"

বাদসাহ—অশ্রুপ্লাবিতচক্ষে, রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "সব ফুরাইয়াছে,—মতি—রহস্য রাখ।"

"এ দাসী—দিল্লীশ্বরের সহিত রহস্য করিতে পারে না।"

"পথ ছাড়িয়া দাও—একবার তাহাকে দেখিব। এতদিন দেখি নাই—আজ দেখিব। এতদিনের অত্যাচারের প্রায়শ্চিত্ত আজ করিব

বলিয়া আসিয়াছি। জন্মের মত শেষবার সেই সুন্দর মুখ দেখিয়া, আজন্ম মর্ম্মজ্বালায় জলিব বলিয়া আসিয়াছি,—দ্বার ছাড়িয়া দাও মতি!"

মতিয়া কথার উত্তর দিল না। মনে মনে ভাবিল, একবারে এতটা ভাল নয়? এ অনুরাগ-বহ্নি, এ দর্শনাকাঙ্ক্ষা, এতদিন কোথায় ছিল? জীবিতে যাহাকে দেখিতে সাধ হয় নাই, আজ সে মরিয়াছে, তবে দেখিবার সাধ কেন?

বাদসাহ অধৈর্য্য হইয়া পড়িতেছিলেন। তাঁহার আর বিলম্ব সহিতে ছিল না। এক একবার মনে করিতেছিলেন,—জোর করিয়া গৃহে প্রবেশ করেন। কিন্তু সেটা বড় অশিষ্টতা!

কিন্তু তা বলিয়া বিলম্ব সহে না। সে মরিয়াছে—তাহারই জন্য মরিয়াছে—জন্মশোধ একবার দেখা, তাহাতে বাধা কেন—আপত্তি কেন? এ ধৃষ্টতা কেন? বাদসাহ অনুযোগপূর্ণস্বরে বলিলেন,—"মতি-বিবি! পথ ছাড়িয়া দাও।"

মতিয়া আরও একটু রহস্য দেখিবার লোভ সাম্‌লাইতে পারিল না! তখন চাঁদের আলোটা একবারে ডুবে নাই। বিশেষতঃ দালা-নের অনুজ্জল আলোটা ঠিক্ বাদসাহের মুখের উপর পড়িয়াছিল। মতি সবিস্ময়ে দেখিল,—দিল্লীশ্বরের চক্ষু আর্দ্র, ওষ্ঠাধর কম্পিত, মুখ-মণ্ডল উত্তেজনাপূর্ণ। সে মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। বলিল,—"জাঁহা-পনা! আমার প্রিয়সখী মৃত্যুর পূর্ব্বে অনুরোধ করিয়া গিয়াছে,—অপ্রেমিক পুরুষে যেন তাহার মৃত-দেহ স্পর্শ না করে। আপনি রমণীর শেষ অনুরোধের মূল্য বুঝেন না, একথা কেমন করিয়া বলিব?"

জাঁহাগীর সাহ বালকের ন্যায় অধীর হইয়া পড়িতেছিলেন। মতি-বিবির ব্যবহারটা তাঁহার বিসদৃশ বোধ হইল। ক্রমে ক্রোধ আসিয়া তাঁহার আকুল-হৃদয় অধিকার করিল। বলিলেন, "মতিবিবি—এখনও

খার ছাড়, সহজে না যাও, অস্ত্র-সহায়তায় পথ পরিষ্কার করিতে কুণ্ঠিত হইব না।”

মতিয়া, হো—হো—করিয়া হাসিয়া উঠিল। সেটা উপেক্ষার হাসি। বলিল,—“জাঁহাপনা! মরিবার ভয় করিলে, আজ দিল্লীর বাদসার সহিত এরূপ স্পর্দ্ধার সহিত কথা কহিতাম না। স্ত্রীলোকে মরিতে ভয় করে না। এই ত দেখিলেন, একজন কেমন ফাঁকি দিয়া গেল। আমি নিজেই স্কন্ধ পাতিয়া দিতেছি,—শাণিত ছুরিকায় আমার কণ্ঠ বিদ্ধ করিয়া, আপনার পথ পরিষ্কার করুন। কিন্তু আমি জীবিত থাকিতে—”

আর বলিতে হইল না। বাদসাহের কটিমধ্যস্থ এক ক্ষুদ্র অসি, সেই স্তিমিত দীপালোকে কোষমুক্ত হইয়া, ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল। চক্ষুর্দ্বয় জ্বলিয়া উঠিল। তিনি মতিয়ার বক্ষে সেই অসি-ফলক বিদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন।

কিন্তু ঘটনাবৈচিত্র্যে মতিয়া মরিল না। কোথা হইতে এক এলো-কেশী, রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি আসিয়া, ক্ষিপ্রহস্তে সেই অসি কাড়িয়া লইয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন। জাঁহাগীর সাহ পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন,—'মহারাণী'। রুষ্টভাবে বলিলেন,—“রাজ্ঞি, তুমি এখানে কেন?”

রাজ্ঞী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—“জাঁহাপনা! আগে বলুন, আপনি এখানে কেন? যে চলিয়া গিয়াছে, তাহার জন্য এ অনুরাগ কেন? এক দিন যখন হতভাগিনী মেহেরের জন্য আপনার চরণে ধরিয়া সাধিয়াছিলাম, তখন এ অনুরাগ কোথায় ছিল? আজ সেইজন্য একটী নির্দ্দোষী রমণীর প্রাণনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন?”

সে মরিয়াছে! স্তিমিতচন্দ্রের ক্ষীণরশ্মি বলিতেছে, সে মরিয়াছে! নৈশসমীরণ বলিতেছে,—সে মরিয়াছে! নক্ষত্র-কিরীটিনী যামিনী বলিতেছে,—সে মরিয়াছে! সেই প্রস্তরময় কক্ষের স্তিমিত দীপরেখা বলিতেছে,—সে মরিয়াছে! মহারাণী বলিতেছেন,—সে মরিয়াছে!

মতিবিবি বলিতেছে,—সে মরিয়াছে! এত সাক্ষ্য—এত প্রমাণ। বাদসাহ অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

অনেক দিনের লুকান স্মৃতির উপরের কঠিন আবরণটা যেন বাদসাহের—গেল। যৌবনে যে রূপমোহে তাঁহার মনের সুখ গিয়াছিল,—শয়নে স্বপনে তিনি যে রূপ ভুলিতে পারেন নাই,—রাজ্য-সুখ একদিন যাহার জন্য তুচ্ছ বোধ করিয়াছিলেন,—নির্দ্দোষী নরশোণিতে হস্ত রঞ্জিত করিতে যাহার জন্য কুণ্ঠিত হন নাই, যাহাকে ভাল করিবার জন্য এত কষ্ট করিয়াও—শেষ উপেক্ষায় অনাদর করিয়াছিলেন,—যাহার চিন্তাক্লিষ্ট মলিন মুখের দিকে আজ এক বৎসর ফিরিয়া দেখেন নাই, যে রাজরাণী হইবার জন্য আসিয়াছিল—কিন্তু বাঁদী হইয়া জীবনটা কাটাইয়া গেল,—সে আজ তাঁহার জন্যই মরিয়াছে। বড়ই কলঙ্ক, বড়ই অত্যাচার! এ কলঙ্ক যেন তাঁহার জীবনেও মুছিবে না।

সে ত হাসিতে হাসিতে চলিয়া গিয়াছে,—তিনি নিতান্ত নির্লজ্জ, তাই জীবনে তাহাকে না দেখিয়া, মরণে দেখিতে আসিয়াছেন। বাদসাহ দেখিলেন, বিশ্বের সকলেই যেন তাঁহাকে তিরস্কার করিতেছে। সমীরণ বলিতেছে,—দিল্লীর বাদসা প্রেমের মর্ম্ম জানেন না।" অন্ধকারে থাকিয়া ফুলকলি বলিতেছে, "ছি! ছি! বাদসা হইলে কি হয়? তোমার হৃদয়ে প্রেম ছিল না।" সেই মলিন জ্যোৎস্না যেন বিকটহাস্যে বলিতেছে,—"ছি! তুমি অতি নির্লজ্জ! তাই এখনও এখানে দাঁড়াইয়া আছ?" যমুনার দূরশ্রুত কলসঙ্গীত যেন বলিতেছে,—"ছার! তুমি পুরুষ! রমণীর সম্মান কি বুঝিবে? আমার এই কালজলের ঊর্ম্মিরাশির ভালবাসা, আসঙ্গলিপ্সা একবার দেখ দেখি? একদণ্ড ইহারা ছাড়াছাড়ি হইতে চাহে না, আর তুমি তাহাকে পদদলিত করিয়া, এতদিন নিরস্ত ছিলে।"

বাদসাহ বিকলচিত্তে এক প্রস্তরভিত্তিগাত্রে, শরীরভার রক্ষা

করিলেন। আশা ভঙ্গ—তাঁহার দেহ বলহীন। অনুশোচনায় অন্তরে বিষম জ্বালা। যাহা হইয়াছে, তাহা আর ফিরিবে না। এখন উপায়—একবার দেখা! চোখের দেখা দেখিতে ক্ষতি কি?

মহারাণী ও মতিয়া, বাদসাহের এই বিকলভাব লক্ষ্য করিলেন। তাঁহাদের দুইজনের মধ্যে চোখের উপর একটা নীরব পরামর্শ হইয়া গেল। মতিবিবি যোড়হস্তে বলিলেন,—"আসুন! জাঁহাপনা! মৃতদেহ দেখিলেও যদি আপনার তৃপ্তি হয়,—তাহাই করুন। আর আমি বাধা দিব না।"

মতিয়া অগ্রে—বাদসাহ পশ্চাতে। অপরাধীর ন্যায় মলিন-মুখে দিল্লীশ্বর গৃহ-প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। প্রাণের ভিতর কি একটা যাতনা উপস্থিত হইল। দেখিলেন,—এক শুভ্রশয্যায় সেই সুকোমল দেহ বিলুণ্ঠিত হইতেছে,—মতিবিবি শয্যা-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন—"মেহেরজান! পি-য়া-রি।"

বাদসাহ আশ্চর্য্য হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন,—এই মতিবিবি, জানি না, পিশাচী—কি দেবী? যে মরিয়াছে, সে কি কাহারও সম্বোধনে বাঁচিয়া উঠে? বলিলেন,—"মতিবিবি—এ কি রহস্য? মেহের ত জীবিত নাই। কাহাকে ডাকিতেছ?"

মতিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—"জাঁহাপনা! আপনি যদি স্ত্রীলোকের শক্তি বুঝিতে পারিতেন, তাহা হইলে আজ আপনাকে এত ব্যাকুল হইতে হইত না। এ জীবনে একদিন বুঝিবেন! যাহারা বিরহে মরে, তাহারা মিলনে বাঁচিয়া উঠে। তার উপর আমাদের একটা সঞ্জীবনী-মন্ত্র আছে। ফল এখনই প্রত্যক্ষ করুন।"

মতিয়া আবার কোমল-কণ্ঠে ডাকিল,—"পি-য়া-রি!"

সেই মৃতদেহ যেন এই প্রেম-সম্বোধনে জীবন পাইল। কে অতি সুকোমল বীণানিন্দিতস্বরে উত্তর দিল,—"কেন—পি—য়া—রি?"

. মতি বলিল,—"একবার দেখ ! কে আসিয়াছে ?"

মেহের উঠিয়া বসিল। দেখিল,—সম্মুখে বাদসাহ। দীননয়নে মলিন-বদনে শীর্ণমুখে, কম্পিত ওষ্ঠে দাঁড়াইয়া—সেই দিল্লীশ্বর। মেহের এতক্ষণ ক্লান্তিবশে নিদ্রা যাইতেছিল। বাহিরের ঘটনা—কিছুই জানিতে পারে নাই।

জাঁহাগীর সাহ বুঝিলেন, মতিবিবি যাদুমন্ত্র জানে। সকল রহস্যই তিনি বুঝিতে পারিলেন। বুঝিলেন,—মেহের বিষ খাইয়াছিল সত্য, কিন্তু এই মতি তাহাকে বাঁচাইয়াছে। বাদসাহ ফিরিয়া ডাকিলেন,—"মতিবিবি !"

দেখিলেন—মতি সেখানে নাই। অবসর বুঝিয়া সে চলিয়া গিয়াছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

এবার সরম টুটিল।

সেই প্রস্তরময়—নিভৃত কক্ষমধ্যে দাঁড়াইয়া বাদসাহ ডাকিলেন,—"মেহের ! পি—য়া—রি ! কেমন আছ ?"

মেহের উত্তর দিতে পারিল না। ওষ্ঠাধারের উপান্তে যেন উত্তর বাধিয়া যাইতে লাগিল। লজ্জা যেন হৃদয় ছাইয়া ফেলিল। অভিমান যেন মনের মধ্যে ফুৎকার দিয়া একটা ধূমরাশি জাগাইয়া স্থির চিন্তাগুলাকে গোলমাল করিয়া দিল। অভিমানে একবার ক্রোধ আসিল না—আসিল অশ্রু। মেহেরের গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা। সে অশ্রুর মূল্য অনেক। তাহাতে কবিতা অনেক। তাহা ভাবপূর্ণ, প্রেমপূর্ণ—কাতরতাপূর্ণ।

দিল্লীশ্বর বড়ই সাহসে ধীরে ধীরে মেহেরের শয্যাপার্শ্বে বসিলেন। সতৃষ্ণ-নয়নে একবার তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার সে পাষাণ-হৃদয় এখন কুসুম-কোমল হইয়াছে। প্রেম তাঁহাকে নিজের গৌরব বুঝাইয়াছে। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় আর্দ্র—কণ্ঠ রুদ্ধ। দৃষ্টি—

কাতরতাপূর্ণ। মরুভূমিতেও বৃষ্টি হয়। পাষাণের বক্ষেও শীতল বারি-ধারা লুক্কায়িত থাকে।

বাদসাহ দেখিলেন অনাদরে পরিত্যজ্য হইয়াও, মেহেরের রূপজ্যোতিঃ যেন আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে। সেই বিশীর্ণদেহে—যেন রূপের তরঙ্গ খেলিয়া বেড়াইতেছে। সেই আকর্ণবিশ্রান্ত চক্ষু দুইটী নীরবভাষায় কত কথা বলিতেছে। সেই ইন্দীবরতুল্য আয়তলোচন, সেই পৃষ্ঠবিলম্বী অবেণীসম্বদ্ধ কেশজাল, সুডৌল বাহুযুগল, সেই চম্পকবৎ সুগৌর দেহকান্তি—সেই মলিন হাসি। বাদসাহ দেখিলেন,—মেহেরের রূপজ্যোতির কাছে—রঙ্গমহালের রূপসীদের সৌন্দর্য্য যেন মলিন হইয়া পড়িয়াছে।

রূপের কার্য্য রূপ করিয়া গেল। তারপর স্পর্শ। বাদসাহ অতি ভীতচিত্তে অতি কুণ্ঠিতভাবে, মেহেরের দক্ষিণ হস্তখানি সাদরে নিজের হাতে রাখিলেন। তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল। সেই আলোক-সামান্যা সুন্দরীর সুগন্ধি-নিশ্বাসে, পুষ্প-কোমল স্পর্শে যেন কতই কোমলতা! সে সৌন্দর্য্যে যেন কতই মধুরতা! ধূমায়িত আসঙ্গ-লিপ্সা এইবার পূর্ণভাবে আহুতি পাইল।

সেই একদিন আর এই একদিন। প্রথম যৌবনে আঁখির মিলন—সেই একদিন গিয়াছে। ভরা যৌবনে—আগরার প্রাসাদে প্রথম দেখা। তাহাতেও সাধ পুরে নাই। আর—সেইদিন। সেই দিন কত সুখের। শয়নে, স্বপনে, আহারে, বিহারে যে মোহনীয় মূর্ত্তি তিনি গোপনে হৃদয়মধ্যে লুকাইয়া দেখিতেন,—আজ সে তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া। তিনি তাহার হাত ধরিয়া। জাহাঙ্গীর সাহ ভাবিলেন,—তিনি কোন স্বর্গের হুরীর সহিত নির্জ্জনকক্ষে কথা কহিতেছেন।

আবার মুখ ফুটিল। বাদসাহ বলিলেন,—"মেহের, আমি অপরাধী, ক্ষমা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।"

মেহের এবার কথা কহিল। অনেক কষ্টে বলিল,—"জাঁহাপনা!"—

কথা যেন মুখ হইতে বাহির হইতে চাহে না। সেখানে কেহই নাই, তবু যেন কত লজ্জা! কে যেন কণ্ঠ চাপিয়া ধরিতেছে। বাদসাহ, মেহেরের চিবুক ধরিয়া আদরে ডাকিলেন,—"হৃদয়েশ্বরি!"

বাদসাহ আবার বলিলেন,—"হৃদয়েশ্বরি! আমি বাদসা হইলেও মানুষ। মানুষ ভ্রমান্ধ। যে পিয়ারি বেগমের কথায় এত কাণ্ড হইল, সেই পাপিষ্ঠাকে বন্দিনী করিয়াছি। আজ হইতে তুমি দিল্লীশ্বরী হইলে। কিন্তু বল,—তুমি আমায় ক্ষমা করিবে?"

মেহেরউন্নিসা—বিনম্রস্বরে, কাতরকণ্ঠে উত্তর করিলেন,—"জাহা-পনা! দাসী অতি ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রের কাছে মহতের অপরাধ সম্ভাবনা নাই। আপনি যে নিজমুখে দোষ স্বীকার করিলেন,—ইহাই আপনার উদারতা। অদৃষ্ট-দোষে যাহা হইয়াছে, তাহা সহজেই ভুলিতে পারি।"

তারপর কত কথা হইল। তোমার আমার তাহা শুনিয়া কাজ নাই।

জাঁহাগীর সাহ, মেহেরউন্নিসাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন। দুই জনের মুখেই হাসির রাশি ফুটিয়া উঠিল।

মতিয়া ও মহারাণী অন্তরাল হইতে রহস্য দেখিতেছিলেন। মতিয়া, গৃহ-প্রবেশ করিয়া নতজানু হইয়া সসম্ভ্রমে বলিল,—"জাঁহাপনা! আপনাদের ত শুভদৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। তখন অপরাধী হইয়াছিলাম,—আমার ক্ষমার পালাটাও শেষ হ'ক্।"

সম্রাট্, মতিয়াকে দেখিয়া একটু অপ্রস্তুত হইলেন। মতিয়ার জন্যই তিনি মেহেরকে ফিরিয়া পাইয়াছেন। লজ্জিতভাবে বলিলেন,—"মতি-বিবি! আজ ধরা দিয়াছি। আমি তোমার সখির কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছি, তুমিও আমায় মার্জ্জনা কর।"

মতিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিল,—"জাঁহাপনা! দাসীর ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। অনুগ্রহ করেন বলিয়া এতদূর প্রশ্রয় লইয়াছি।"

মহারাণী যোধাবাই, প্রফুল্লমুখে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া, জাঁহাগীর সাহার দক্ষিণপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"প্রিয়সখি মেহের! তোমায় আমার সিংহাসন ছাড়িয়া দিলাম। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরসুখী হও।"

মেহেরউন্নিসা, মহারাণীর পদযুগল বন্দনা করিতে গেলেন। মহারাণী বাধা দিয়া বলিলেন,—"ছি! বহিন্, ও কি?"

মেহেরউন্নিসা অশ্রুপূর্ণনেত্রে বলিলেন,—দেবি! আপনার মহত্ত্ব জীবনে ভুলিব না। সিংহাসন আমার দ্বারা কলঙ্কিত হইবে। আপনি পাটরাণী, ইহা আপনারই যোগ্য।"

এক ক্ষুদ্র পেটিকার মধ্য হইতে সম্রাটপত্নী এক "হীরক-বলয়" বাহির করিয়া, মেহেরের সেই সুন্দর হাতে পরাইয়া দিলেন। সে সুন্দর হাত-দুখানির সৌন্দর্য্য যেন আরও বাড়িয়া উঠিল। যোধাবাই হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"এই হীরক-বলয় দুটী তোমাদের মধুর মিলনের স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ রাখিও।"

মেহের, জীবনে কখনও সেই সুন্দর বলয় দুইগাছির কথা ভুলিতে পারেন নাই।

সেই রাত্রি এইরূপে আনন্দে কাটিল। পরদিন প্রভাতে সূর্য্যের কিরণরেখা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে, বাদসাহ আগরা-সহরে ঘোষণা করিয়া দিলেন,—মেহেরউন্নিসা "নুরজাঁহা উপাধি লইয়া দিল্লীশ্বরী হইলেন।

* * * * *

নুরজাঁহা বেগমের উদারতায়, রোস্তম কারামুক্ত হইয়া পুনরায় পূর্ব্বপদে অধিষ্ঠিত হইল। আর সর্ব্বনাশী পিয়ারি বেগম? সে কারাগারে বিষ খাইয়া সকল জ্বালা এড়াইল। নুরজাঁহা বেগম তার মুক্তির জন্য অনুরোধ করিয়াও, তাহাকে রক্ষা করিবার অবসর পাইলেন না।

রক্তমঞ্জিল

প্রথম পরিচ্ছেদ

"এখন জাঁহাপনার অভিপ্রায় কি ?

"নূতন কিছুই নাই। আর একবার খেলা আরম্ভ হউক।"

"কি আছে আমার জাঁহাপনা! যে, আমি আবার খেলিতে সাহসী হইব? এতদিন আপনার উজীরি করিয়া যাহা সঞ্চয় করিয়াছিলাম, তাহা ত গিয়াছে। এখন আমি পথের ভিখারী। ভিখারীর সহিত বাদসার কি খেলা শোভা পায় ?

"কেন তোমার উজীরি ত যায় নাই,—টাকা গিয়াছে, আবার হইতে কতক্ষণ? এ পর্য্যন্ত বাজে লোকের সহিত খেলিয়া তাহাদের কাঁচা মাথাগুলি কাটিয়া,—মনে বড়ই ঘৃণা হইয়াছে। তার চেয়ে একটা উজীরের সহিত খেলায় অনেক আনন্দ। কেন, তোমার ত কন্যা আছে, শুনিয়াছি, সে পরমা সুন্দরী"—

কথাটা হইতেছিল, গুজরাটের অধীশ্বর সুলতান সেকেন্দার ও তাঁহার উজীর সমসের খাঁর মধ্যে। "বিলাসবাগ" নামক এক সুবিস্তৃত প্রাসাদের বারান্দায় দাঁড়াইয়া উভয়ে কথোপকথনে নিযুক্ত। বাদসাহের মুখে কন্যার নামোল্লেখ শুনিয়া, উজীরের মুখমণ্ডল ক্রোধে লোহিতবর্ণ ধারণ করিল। বাদসা কাছে দাঁড়াইয়া আছেন,—ইহা ভাবিয়া, উজীর সমসের খাঁ, একটু আত্মসংবরণ করিলেন।

সেকেন্দারসাহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সমসের! ভাবিতেছ কি? তোমার কন্যাকে কি সেকেন্দার সাহ নিজের অন্তঃপুরে আশ্রয় দিতে পারেন না ?"

"নিশ্চয়ই পারেন। তার অপেক্ষাও শতশত সুন্দরী আপনার পদপ্রান্তে গড়াগড়ি যাইতেছে। কিন্তু এ দরিদ্রের কন্যা হয়ত, সে সৌভাগ্য পছন্দ করিবে না। কিম্বা এ গোলাম হয়ত"—

"বুঝিয়াছি। তোমার কন্যাকে পণ রাখিয়া খেলিতে তুমি সম্মত নও। সমসের, তুমি জান, কাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তুমি কথা কহিতেছ?"

"বেশ জানি,—দীনদুনিয়ার মালিক, বিস্তৃত গুজরাটের বাদসাহ, এই বিশাল সাম্রাজ্যের অসংখ্য প্রজার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা,—তাঁহার সহিতই তাঁহার দাস কথোপকথন করিতেছে।"

আমার প্রবৃত্তি ত জান। আমি যে ইচ্ছা প্রকাশ করি, তাহা অসম্পূর্ণ থাকে না। তোমায় আবার খেলিতে হইবে।"

"এ দাসের প্রতি নিগ্রহ কেন,—প্রভু? এক নিশ্বাসে,—উজীরির স্বপ্ন ত শেষ করিয়াছি। প্রাণাধিকা কন্যা,—এ হতভাগ্যের জীবনের একমাত্র ধ্রুবতারা, আদরের ধন আমিনাকে একটা সামান্য ক্রীড়ার পণের উপযুক্ত বিবেচনা করি না। জাঁহাপনা! গোস্তাখি মাপ করিবেন। আপনি অনেক বড়। আমি আপনার উজীর,—নীচতায় প্রবৃত্তি হইবে কেন প্রভু?"

"আচ্ছা,—তবে বড়র মতই চাল আরম্ভ কর। আমি আমিনাকে চাই। শুনিয়াছি, সে পরমা সুন্দরী।"

"খেলার পণে তাহাকে লাভ না করিয়া, অন্য উপায়ে ত পারেন। লোকে কি বলিবে?"

"কতকগুলা অপদার্থ কাপুরুষকে সুলতান সেকেন্দার ভয় করেন না। আমি এখনই বলপূর্ব্বক আমিনাকে আনিতে পারি। কিন্তু তাহা করিতে চাই না। ক্রীড়ার পণরূপে আমিনাকে পাইলে, যে আনন্দটুকু হইবে,—তাহা পূর্ণরূপে উপভোগ করিতে চাই।"

"তাহাই হউক। জাঁহাপনার অভিলাষই পূর্ণ হউক। কোন

দিকেই যখন আমার পরিত্রাণ নাই, তখন আর একবার অদৃষ্টের সঙ্গে যুঝিয়া দেখিব।”

তখন অপরাহ্ন হইয়াছে। বিলাসবাগের সুসজ্জিত কক্ষগুলি, ক্রমশঃ সুগন্ধি দীপে উজ্জ্বলিত হইতেছে। গবাক্ষ-পথ দিয়া সেই চঞ্চল আলোক নিঃসারিত হইয়া,—উদ্যানের আশে পাশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সমসের খাঁ বলিলেন,—“তবে চলুন।”

উভয়ে গৃহপ্রবেশ করিলেন। তাহার পূর্ব্বেই দশ বার জন ওমরাহ সেই খেলার আসর জাঁকাইয়া আছেন। তাঁহাদের শিরোদেশস্থ উজ্জ্বল পাগড়িগুলির মতিদার শেরপাচের উপর,—গৃহমধ্যস্থ লাল নীল বাতির আভা পড়িয়াছে। বাদসাহকে দেখিয়া তাঁহারা সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বসোরার সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্পেটের উপর—হীরামতির কাজ-করা নীল মখমল-মোড়া এক সুন্দর বিছানা। তাহার উপর সেকেন্দার সাহ উপবিষ্ট হইলেন। দর্শকরূপী ওমরাহগণ আশে পাশে ঘিরিয়া বসিলেন। সম্মুখে এক হস্তিদন্তনির্ম্মিত উচ্চ আসনের উপর—শ্বেত-কৃষ্ণ-মর্ম্মর-নির্ম্মিত দাবার ঘর। তাহার উপর পালিস করা হস্তীদন্তের সুন্দর ঘুঁটিগুলি। পরিশেষে খেলা আরম্ভ হইল।

সকলেরই সোৎসুক-দৃষ্টি সেই ঘুঁটীর ‘চালে’র উপর। কয়েক ‘চালে’র পর উজীরের ‘চাল’ বিগ্‌ড়াইল। উজীর হারিলেন। পার্শ্বচরেরা চীৎকার করিয়া উঠিল,—“সাহান্‌সাহের জয়।”

“জয়শব্দটা” কক্ষ-মধ্যে ভীষণ প্রতিধ্বনি লইয়া ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল। উজীর সমসের খাঁর কর্ণে তাহা বজ্রধ্বনিবৎ প্রবেশ করিল। তাঁহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। সর্ব্বনাশের যাহা বাকি ছিল,—নিয়তির হস্ত, শেষ তাহাই করিয়া দিয়াছে। প্রাণাধিকা কন্যা, রূপসী-শ্রেষ্ঠা আমিনা,—আজ তাঁহারই দুর্ভাগ্য ও নির্ব্বুদ্ধিতাবশে, এক খামখেয়ালি বাদসাহের

উপভোগ্যারূপে পরিগণিত হইল। হায়! হায়! আমিনাকে রক্ষা করিবার কি কোন উপায় নাই?

কে যেন প্রতিধ্বনি করিল,—"উপায় আছে।" উজীর মুখ তুলিয়া দেখিলেন, গুর্জ্জরেশ্বর নিজেই বলিতেছেন,—"উপায় আছে।"

"উপায় আছে জাঁহাপনা? আপনি বিশ্ববিজয়ী হউন। আল্লা আপনার মঙ্গল করুন। বলুন,—কি উপায়ে আমার আমিনাকে আবার ফিরিয়া পাই।"

বাদসাহ বিদ্রূপপূর্ণস্বরে বলিলেন, "উজীর সমসের খাঁ! উপায় আছে,—কিন্তু তুমি তাহাতে স্বীকৃত হইবে কি? তোমার সাহসে কুলাইবে কি?"

উজীর কম্পিতস্বরে বলিলেন,—"অগাধ ঐশ্বর্য্য ছিল, পথের ভিখারী হইয়াছি। পণ পূর্ণ করিতে সর্ব্বস্ব হারাইয়াছি। সেকেন্দার সার উজীর হইয়া,—আজ আমায় একটী আস্‌রফির জন্য পরের কাছে হাত পাতিতে হইবে। থাকিবার মধ্যে আছে আমার এই আঙ্গরাখা, এই পায়জামা, এই অসার উজীরির ছায়াবাজির শেষ-চিহ্ন এই উষ্ণীষ,—আর এই ঘৃণিত জীবন। বাদসাহ ইহার মধ্যে কোন্‌টী চান?"

"তোমার ওই ঘৃণিত জীবনই চাই।"

"এই তুচ্ছ প্রাণ! এখনই ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি! আমিনা পথের ভিখারিণী হউক, তাহাতে দুঃখ নাই। একটা বিকৃত-মস্তিষ্ক বাদসাহের বিলাসের পাত্রী হইয়া কলঙ্কিত জীবন বহন করা অপেক্ষা, তাহার মৃত্যুই আমার স্পৃহনীয়। আমি জীবন-পণই করিলাম।"

সেকেন্দার সাহ মনে করিতেছিলেন, প্রাণের মায়াই সকলের শ্রেষ্ঠ। উজীর প্রাণভয়ে নিশ্চয় আমিনাকে তাঁহার অন্তঃপুরে প্রেরণ করিতে বাধ্য হইবে। যখন দেখিলেন, সমসের খাঁ অন্য উপাদানে নির্ম্মিত, তাঁহার হৃদয় অতি উচ্চ-প্রবৃত্তিতে পরিপূর্ণ, তখন তাঁহার হীন

মস্তিষ্কে একটা ভয়ানক উত্তেজনা দেখা দিল। মুখমণ্ডল ক্রোধে লোহিত-বর্ণ ধারণ করিল। পার্শ্ববর্ত্তী আমীরেরা এইবার প্রমাদ গণিলেন। উজীরের আর রক্ষা নাই।

বাদসাহ উত্তেজিত-কণ্ঠে বলিলেন,—"সমসের! এখনও বিবেচনার সময় আছে। এখনও ভাবিয়া দেখ।"

উজীর দৃঢ়তাপূর্ণস্বরে বলিলেন,—"জাঁহাপনা! নীচ-রক্তে জন্ম নহে,—নীচবংশীয় হইলে, একটা রাজ্যের উজীর হইবার স্পর্দ্ধা রাখিতাম না। এই বিশাল রাজ্যের সমস্ত প্রজা, তাহা হইলে আজ আমায় পিতার মত, বন্ধুর মত ভাবিত না। আপনার প্রজাবৃন্দের মনে এত বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারিতাম না। আপনি যখন বাদসাহী-চাল ছাড়িতে পারিতে-ছেন না, আমি আমার উজীরি-চাল ছাড়িব কেন? এই ঐশ্বর্য্যহীন, সম্ভ্রমহীন হেয় জীবনে কি লাভ? গৌরবজনক মৃত্যুই আমার স্পৃহণীয়।"

সেকেন্দার-সুলতানের মনের মধ্যে এক মহাঝটিকা বহিল। তিনি জানিতেন, প্রজারা প্রকাশ্যে না হউক,—মনে মনে উজীরকে বিশেষ সম্মান করে। গুর্জ্জরের সিংহাসনও অভিশপ্ত। আজ আছে কাল নাই,—এই পাপিষ্ঠ উজীর অধিক দিন জীবিত থাকিলেই, কোন্ দিন এক সর্ব্বনাশ উপস্থিত করিবে। তিনি উজীরকে বিনষ্ট করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বিদ্রূপের সহিত বলিলেন,—"সমসের! তবে প্রাণ-ভিক্ষা চাও না?"

"না—কখনই না।"

"মরিতে চাও, আচ্ছা তাহাই হইবে।" বাদসাহ হাঁকিলেন, "কে আছিস্?"

এক গোলাম, পরদা ঠেলিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া কুর্ণীস করিল। বাদসাহ, কারাধ্যক্ষকে ডাকিতে আদেশ করিলেন।

কারাধ্যক্ষ লতিফ আস্গার খাঁ কাঁপিতে কাঁপিতে বাদসাহের সম্মুখে

আসিয়া কুর্ণিস করিল। উজীরের মলিন ও চিন্তাক্লিষ্ট মুখ, বাদসাহের বিরক্তিভাব, ওম্‌রাহদের চিন্তারেখাঙ্কিত বদনমণ্ডল দেখিয়া, সুচতুর কারাধ্যক্ষ বুঝিল, ব্যাপার সহজ নয়। তখনও সেই গজদন্তনির্ম্মিত ঘুঁটিগুলা সেই মর্ম্মর-ছকের উপর বিশৃঙ্খলভাবে গড়াইতেছিল।

বাদসাহ গম্ভীরকণ্ঠে আদেশ করিলেন,—"ইহাকে কারাগৃহে লইয়া যাও। আর ইহাকে উজীর বলিয়া ভাবিও না। সামান্য অপরাধীর ন্যায় ইহাকে দেখিবে। কাল প্রাতেই ইহার প্রাণদণ্ডের পরোয়ানা পৌঁছিবে। তদনুযায়ী কার্য্য করিও।"

পার্শ্ববর্ত্তী ওমরাহেরা মনে মনে "হায়! হায়!" করিয়া উঠিল। মুখ ফুটিয়া বিলাপ করিতে তাহাদের সাহস হইল না। উজীর, বধাজ্ঞা শুনিয়া একটুও টলিলেন না। স্থির, নিশ্চল, নিষ্কম্প, নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় তাঁহার মুখমণ্ডলে এক ক্ষণস্থায়ী উজ্জ্বলভাব দেখা দিল। উজীরির যবনিকা এইখানেই পতিত হইল। যে আমিনার জন্য এত কাণ্ড, হায় ভাগ্য! সে আমিনার সঙ্গেও দেখা হইল না। বিনা দোষে দণ্ডিত, হতভাগ্য সমসের খাঁর চক্ষু দিয়া অশ্রুপ্রবাহের পরিবর্ত্তে কেন যে রক্ত ফাটিয়া বাহির হইতে লাগিল না, তাহাই বিস্ময়ের বিষয়!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পাঠককে একটু পূর্ব্ব-ঘটনা বলিয়া রাখা প্রয়োজন। গুজরাট-রাজ্যের বাদসাহ সেকেন্দার সুলতানকে ইতিহাসপাঠকমাত্রেই জানেন। নানা কারণে সেকেন্দারের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। রাজ্যমধ্যে অশান্তি, প্রজাবিদ্রোহ, মন্ত্রীর প্রজাপ্রিয়তা, দিবারাত্রব্যাপী ব্যসন, প্রজার উপর অত্যাচারজনিত অনুশোচনায়, সেকেন্দার সাহ একপ্রকার ক্ষণিক উন্মত্ততা-রোগে আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার মনে নানাবিধ খেয়াল জুটিতে লাগিল। এই দাবা-খেলার খেয়াল তাহাদের অন্যতম।

তিনি নিজে একজন শ্রেষ্ঠদরের খেলোয়ার। তাঁহার উপর চাল চালে, এরূপ লোক যে হিন্দুস্থানে ছিল না, এরূপ নহে। তাঁহার সমযোগ্য খেলোয়ার থাকিলেও, তাহারা ভয়ে বড় একটা কাছে ঘেঁসিত না। সেকেন্দার সাহের সমস্ত কল্পনাই উদ্ভট-গোছের। তিনি ঘোষণা প্রচার করিলেন, "যে, বাদসাহের সহিত দাবা-খেলায় জিতিবে, তাহাকে রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ দেওয়া যাইবে, কিন্তু পরাজিত-ব্যক্তির মাথা যাইবে।" এই নিদারুণ পণ দেখিয়া, সহসা কেহ অগ্রসর হইল না। সর্ব্বনেশে পণ! দীন্ দুনিয়ার মালিক, এতবড় রাজ্যের এতবড় একটা দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ বাদসা, তাঁহার সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—সেই ভীষণ কটাক্ষ, সেই তোষামুদে পার্শ্বচর ওম্‌রাহদের প্রত্যেক চালেই "বহুৎ খুব জাঁহাপনা" বলিয়া চীৎকার, এ সব সহ্য করিয়া কোন খেলোয়ারই "উজীরি" লইতে সাহস করিল না।

এদিকে লোকও জুটে না, বাদসাহের খেলার সখও মেটে না। সেই ক্ষণিক-উন্মত্ত ভাবটা আবার একটু জাঁকিয়া উঠিল। দিন যেমন তেমন করিয়া কাটে, কিন্তু অতবড় বাদসাহী-জীবন যে ভয়ানক আমোদশূন্য বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার একটা সামান্য খেয়াল উঠিয়াছে, তাহা চরিতার্থ করিবার জন্য দেশের হতভাগ্যেরা অগ্রসর হইল না, ইহা তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইল। সেই সুবাসিত গোলাপবারিসিক্ত পুষ্প-পাখার হাওয়া বিষবৎ বোধ হয়। ষোড়শী রূপসী বেগমদের নীল ওড়না, সবুজ আঙ্গরাখা-পরা মূর্ত্তিগুলি, যেন সংএর পুতুলের মত বোধ হয়। খেলিতে না পাইলে, বাদসাহের কিছুই ভাল লাগে না। খালি খেলা নয়,—জেতাও চাই। বাদসাহ ভাবিতেছিলেন, তাঁহার গুর্জ্জরের মণিখচিত সোণার তক্তটা যেন পিতলের ও ঝুটা পাথরের হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার প্রেয়সীরা যেন লাবণ্য ও রস বিহীন হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার সখের বাগানের ফুটন্ত ফুলগুলা যেন মলিন ও

গন্ধহীন হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার মাহিনাকরা এস্‌রারী, সারেঙ্গী ও বেহালাদারেরা সুর ভুলিয়া গিয়াছে। নহবত বেসুরা বাজিতেছে, সুমিষ্ট সরবৎ অতি তিক্ত হইয়াছে। পালিত আঙ্গুর-বৃক্ষের সুমিষ্ট পাকা আঙ্গুরগুলা, যেন তিক্তস্বাদ আমলার মত হইয়া পড়িয়াছে।

বস্তুত, ব্যসন এইরূপ ভয়ানক জিনিসই বটে। নেশার মৌতাত আছে, আর খেলার মৌতাত নাই, একথা স্বীকার করিতে পারি না। আজও এক একটা দাবার আসরে কতই না লোক জমে? সামান্য লোকেরই যখন এত ঝোঁক, এত সখ হয়, তখন লক্ষ প্রজার মালিক, একটা প্রবল-পরাক্রান্ত বাদসাহ যে এরূপ সখে মাতিবেন, তাহা আশ্চর্য্য নহে।

বাদসাহ নূতন আদেশ প্রচার করিলেন,—"প্রথমবারে হারিলে ক্রীড়া-সহচরকে জীবন-পণ-স্বত্বে রেহাই দেওয়া হইবে। তিনবার উপর্য্যুপরি হারিলে, জীবন দিতে হইবে। একবার জিতিতে পারিলেই, রাজ্যের উচ্চপদ।"

এই ঘোষণার একটু ফল ফলিল। আমজাদ খাঁ বলিয়া এক দুঃসাহসিক দরিদ্র পাঠান, উজীরির লোভে বাদসাহের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে উপস্থিত হইল। ক্ষুধিত ব্যাঘ্র যেরূপ বহুদিন পরে শিকার দেখিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠে, সেকেন্দার সা, এই নবাগত প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখিয়া সেইরূপ আনন্দিত হইলেন।

বলা বাহুল্য, সেই হতভাগ্য আমজাদ খাঁ, বার বার তিন বারই পরাজিত হইল। বাদসাহের কঠোর আদেশে, এক অদ্ভুত খামখেয়ালিতে, সেই নির্দ্দোষ ব্যক্তির মস্তক স্কন্ধচ্যুত হইল। শুধু তাই? তাহা হইলেও আপদ চুকিয়া যাইত। তাহার সেই ছিন্ন-মস্তকটা হাতে লইয়া, প্রধান ঘাতক, নগরের রাজপথের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে ভীষণ-দৃশ্যে বাদসাহের নিরীহ প্রজা, সেই নগরবাসীরা মহা শঙ্কিত হইল।

খেলোয়ার বলিয়া যাহাদের একটু প্রতিপত্তি ছিল, তাহারা প্রাণ-ভয়ে রাতারাতি সহর ছাড়িল। কে জানে, কখন কাহাকে বাদসা ডাকিয়া ফেলেন। যাহারা জানিত না, তাহারা নিশ্চিন্ত থাকিলেও, আকস্মিক বীভৎস ঘটনায় ভয়ে আকুল হইয়া পড়িল।

উজীর সমসের খাঁ, নিজগুণে লোকপ্রিয় হইয়াছিলেন। সেই সন্দিগ্ধ চিত্ত, অত্যাচারী বাদসাহ, উজীরের এই লোকপ্রিয়তার কথা শুনিয়া, একটা ভবিষ্যৎ বিপ্লবের সন্দেহে আকুলিত হইলেন। কৌশলে উজীরের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে মনস্থ করিয়া, তিনি তাহাকে ক্রীড়া-ক্ষেত্রে আহ্বান করেন। তারপর কি ঘটিয়াছে, আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাদসাহ সেই রাত্রেই কারাধ্যক্ষের নিকট এক গুপ্ত পরোয়ানা পাঠাইলেন। তাহাতে আদেশ ছিল,—"সমসের খাঁকে ফাঁস দিয়া বিনষ্ট করিবে। এই কার্য্য কোন প্রকাশ্য-স্থানে হইবে না।"

বাদসাহের ভয় ছিল, উজীরের লোকপ্রিয়তা। হয়ত এই ভয়ানক ঘটনায়, অসন্তুষ্ট ও উত্তেজিত প্রজারা একটা অনিষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে। কাজ কি অত হাঙ্গামে, গোপনে শত্রুনাশ করাই ভাল। বলা বাহুল্য, বাদসাহের আদেশ গোপনেই যথাযথ প্রতিপালিত হইয়াছিল।

এক প্রহর অতীত হইয়াছে, বাদসাহ নিজ কক্ষে সংবাদের অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিতচিত্তে অবস্থিত। এক পদাতিক আসিয়া সংবাদ দিল, "কাজ শেষ হইয়াছে। সমসেরের মৃতদেহ সমাধিস্থ করিবার জন্য এক মুসলমান ফকির দ্বারা তাঁহার কন্যা গোপনে লইয়া গিয়াছে।" সেকেন্দার সাহ একটু নিশ্চিন্ত হইলেন।

উজীর মরিল,—পাপ গেল। সিংহাসনটা অনেকটা নিষ্কণ্টক হইল।

একটা নিরপরাধীর প্রাণদণ্ড করিয়া, তিনি যে সেই আসমানের মালিক, সেই অনন্তশক্তিমানের কাছে ঘোর অপরাধী হইলেন, একথাটা একবারও তাঁহার মনে আসিল না। এই বাদসাহী—এই দুনিয়াদারি, এই হীরামতি-খচিত তক্ত, এই সাঁচ্চায় মোড়া—মতির শেরপাচওয়ালা উষ্ণীষ—সবই যে দুদিনের জন্য, একথা তাঁহার মনে উঠিল না।

প্রাতে যে ঘটনায় অনুতাপ হয় নাই, অপরাহ্নে ক্রমাগত চিন্তায় বাদসাহের সেই বিকৃত-মস্তিষ্ক একটু উত্তেজিত, একটু চঞ্চল হইয়াছে। সন্ধ্যার পর, সেদিন তিনি কাহাকেও নিজ কক্ষে প্রবেশ করিতে দেন নাই। গভীর রাত্রে সেই অনুশোচনা, সেই অতীতস্মৃতি, তাঁহাকে ভয়ানক যন্ত্রণা দিতে লাগিল। সন্ধ্যার প্রজ্জলিত আলোকগুলি একপ্রহর অতীত না হইতেই নির্ব্বাপিত হইল। তবুও যেন সেই গৃহে অগ্নিশিখা জ্বলিতেছে। শয্যা যেন কণ্টকিত। হৃদয় যেন কি একটা ভারে বিষম ভারগ্রস্ত। মনে কেবল সেই এক কথা, "হায়! কেন এ কাজ করিলাম।" বাদসাহ স্থিরভাবে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু নিদ্রা আসিল না।

গভীর অন্ধকার। রাত্রিও তৃতীয় প্রহর। বিলাসবাগের কক্ষগুলির উজ্জ্বল আলো অনেকক্ষণ নিভিয়া গিয়াছে। আনন্দ-কোলাহল সেদিন, অনেক পূর্ব্বে থামিয়া গিয়াছে। উজ্জ্বলিত কক্ষগুলির উষ্ণতা, সেদিন অনেকক্ষণ ধীরে ধীরে অপসৃত হইয়াছে। সেই গৃহে, সেদিন আর ভৃত্যেরা ফুলের মালা ঝুলাইয়া দেয় নাই। গৃহমধ্যস্থ কৃত্রিম ফোয়ারা-গুলি, সেদিন আর তেমন করিয়া চারিদিকে মৃদুশব্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া, সুগন্ধ বিস্তার করে নাই। রমণীর কলকণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীতের কাকলীময় উচ্ছ্বাস সেদিন সেই কক্ষে প্রতিশব্দিত হয় নাই। আনন্দ, বিলাস, যেন সেদিন বিলাসবাগের বাহিরে গিয়া কোথায় লুকাইয়া পড়িয়াছিল।

এই তামসী নিশীথে, বিলাসবাগের উন্মুক্ত বাতায়নপথে, বিনিদ্রনেত্রে

দাঁড়াইয়া এক মনুষ্য-মূর্ত্তি। তাহার ঊর্দ্ধে অন্ধকার, পার্শ্বে অন্ধকার, সম্মুখে অন্ধকার, হৃদয়ে অন্ধকার। সেই ব্যক্তি নিশাচরের ন্যায়, সেই নগ্ন-সৌন্দর্য্যময়ী সুপ্ত প্রকৃতির বক্ষদেশ-প্রবাহিত অন্ধকার-স্রোতের ভিতর দিয়া, চারিদিকে উদাস দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছিল।

সেই অন্ধকারে, শেষে সত্য সত্যই আলোক দেখা দিল। ক্ষীণোজ্জ্বল দীপ-রেখায় বিলাসবাগের সীমান্তসংলগ্ন সমাধিক্ষেত্রের একাংশ পরিদীপ্ত হইয়া উঠিল। সেই বাতায়নপথপার্শ্বস্থ পুরুষ-মূর্ত্তি যেন, সেই ভীষণ সমাধিক্ষেত্রে সহসা আলোকের আবির্ভাব দেখিয়া, একটু বিস্মিত ও ভীত হইয়া পড়িল। সেই ব্যক্তি অস্ফুটস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, বলিল,—"তোমরা স্বর্গরাজ্য হইতে আলোক হাতে লইয়া যাহাকে খুঁজিতে আসিয়াছ, তাহাকে আর দেখিতে পাইবে না।" সেই অস্ফুট আর্ত্তনাদেই সেই দূরস্থিত আলোকরেখা সহসা অন্তর্হিত হইল। এই বাতায়নপথবর্ত্তী অন্ধকার-বেষ্টিত পুরুষ, আর কেহই নহেন, স্বয়ং সুলতান সেকেন্দার সাহ।

বিলাসবাগের পার্শ্বেই এই সমাধিক্ষেত্র। সেই দিন প্রাতেই সমসের খাঁর ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। বাতায়ন অর্দ্ধোন্মুক্ত করিয়া, সেই দিন অপরাহ্ণেই বাদসাহ এক নবসৃচিত সমাধি দেখিয়াছিলেন। তাহাই সমসের খাঁর গোর। এই গভীর রাত্রে আবার সেই সমাধির প্রতি দৃষ্টি পড়িল। সহসা এই মৃত্যুর লীলাক্ষেত্রে, নৈশান্ধকারমধ্যে আলোকমালা দেখিয়া, তাঁহার মন এক বিসদৃশ কল্পনায় রঞ্জিত হইয়া উঠিল।

তিনি যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেইখানেই স্থির হইয়া রহিলেন। দেখিলেন, আবার সেই অপসৃত আলোকরেখা আবির্ভূত হইয়াছে! দেখিলেন, একটি রমণী-মূর্ত্তি ও একটি পুরুষ-মূর্ত্তি সেইখানে নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান।

সমসেরের প্রাণদণ্ডের পরই, তিনি আমিনাকে আনিবার জন্য

শিবিকা ও সিপাহী পাঠাইয়াছিলেন। দূত আসিয়া সংবাদ দিয়াছিল, উজীরের কন্যা ও ভ্রাতুষ্পুত্র নগর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। হয়ত তাহারাই আবার নির্জ্জনে, সমাধিপার্শ্বে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছে। সেকেন্দারের পাষাণ-হৃদয় এইবার গলিল।

সেই সমাধিপার্শ্ববর্ত্তিনী রমণীমূর্ত্তি, সেই ক্ষীণ-দীপালোকেও—সৌন্দর্য্য-জ্যোতিঃ বিকীরণ করিতেছিল। সেই সুন্দর দেহযষ্টি, সেই অর্দ্ধাবগুণ্ঠন-ময় মুখ, সেই শুভ্রবসনাবৃত ক্ষীণালোকোজ্জ্বলিত, অর্দ্ধান্ধকারবিজড়িত-কায়া—বাদসাহ বড়ই সুন্দর দেখিলেন। বাদসাহ আকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"নিশ্চয়ই তুমি আমিনা। আমিনা! আমিনা! অত সুন্দর তুমি! এই অন্ধকারেও তোমার এত রূপ! সহস্র সমসের মরুক, তাহাতে ক্ষতি নাই,—কিন্তু আমি তোমায় চাই। সহস্র গুজরাট চক্রান্তে ভাসিয়া যাক্—শোণিতস্রোতে প্লাবিত হউক,—তবুও আমি তোমায় চাই।"

বাদসাহ যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, সে স্থানটী একটু দূরবর্ত্তী। তিনি দালানের মধ্য দিয়া ছাদের বারান্দায় আসিলেন। এখান হইতে গোরস্থান দুই রাশি দূরে। দেখিলেন, সেই সমাধির চারিদিকে খনিত মৃত্তিকারাশি; তাহা হইতে শবাধার উত্তোলিত। শবাধার শূন্য। সেই শবাধার হইতে শব উঠিয়া অতিকষ্টে এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই পাংশুমলিন মুখ, সেই বিশীর্ণ গণ্ড, সেই কোটরান্তর্গত উদাসদৃষ্টিময়, সেই উচ্ছৃঙ্খল উষ্ণীষবিরহিত শববৎ মুখ দেখিয়া বাদসাহ চিনিলেন,—এ উজীর সমসের খাঁ!

মরা মানুষেও যে গোর ছাড়িয়া উঠিতে পারে, যাহাকে তিনি ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়াছেন, সে লোক আবার গোর হইতে উঠিতে পারে,—যাহার মৃতদেহ তিনি নিশ্চলভাবে ভূপতিত হইতে শুনিয়াছেন, সে দেহ আবার সজীব হইতে পারে, এ চিন্তা বাদসাহের দারুণ শিরোবেদনা উপস্থিত করিল।

তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "ভ্রমও ত অনেক হয়। অনেক সময়ে ত ছায়া দেখিয়া মানুষ জ্ঞান হয়। সেই ছায়ায় মানুষেরও আকার হাত পা সবই থাকে। ছি! ছি!! আমি না সুলতান সেকেন্দার সাহ! এতবড় দেশটা হিন্দুর হাত হইতে কাড়িয়া লইতে পারিলাম, আর এই সোজা কথাটার মীমাংসার জন্য এখানে দাঁড়াইয়া ভয়ে ভীত হইতেছি! আল্লা! আমায় একি করিলে!"

সহসা তাঁহার চঞ্চল হস্ত, কটিদেশনিবদ্ধ সুতীক্ষ্ণ কালমুকী ছোরা ধরিতে অগ্রসর হইল। হায়! কটিদেশে অস্ত্রমাত্রও নাই! ভ্রান্তিতে তিনি তাহা কক্ষে ফেলিয়া আসিয়াছেন।

বাদসাহ সেই অন্ধকারময়ী রজনীতে, সোপানরাজি অবতরণ করিয়া নীচে আসিলেন। সদরদ্বারে প্রহরী ছিল, সে তাঁহার আকৃতি দেখিয়া ভয় পাইল। উন্মাদ! উন্মাদ! বাদসা উন্মাদ হইয়াছেন। নচেৎ মাথার পাগ্‌ড়ী ফেলিয়া বিনা অস্ত্রে, বিশৃঙ্খলবেশে, এত রাত্রে একাকী কোথায় যাইতেছেন?

সে মস্তকাবনত করিয়া সেলাম করিল। বাদসাহ বাহির হইয়া গেলে, সঙ্গে সঙ্গে কিয়দ্দূর গেল। পশ্চাৎদিকে পদশব্দ শুনিয়া, বাদসাহ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। পরুষকণ্ঠে বলিলেন,—"কে তুই—?"

"জাঁহাপনা গোলাম। এত রাত্রে একাকী যাইতেছেন, সঙ্গ লইয়াছি।"

"শয়তানের বাচ্চা! নিজের কাজে যা! গুর্জ্জরের বাদসার রক্ষার জন্য তোর মত কুকুরের সহায়তার আবশ্যক নাই।

প্রহরী ভয়ে পলাইয়া গেল।

সেকেন্দারসাহ সেই গভীর অন্ধকারে সমাধি-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। সে স্থান সম্পূর্ণ অন্ধকারময়। সেই ক্ষীণবর্ত্তিকাধারিণী কল্পিতা সুন্দরী আমিনাও নাই, সেই নূতন জীবনীশক্তিসমন্বিত অনুমিত

শবদেহ নাই। সে স্থানের সব সমাধিগুলিই প্রস্তরমণ্ডিত। স্থান লক্ষ্য করিয়া নূতনটী খুঁজিয়া লইতে বাদসাহকে বড় কষ্ট পাইতে হইল না। সমাধির উপর ঘাসের স্তর যেরূপ ভাবে সাজান ছিল, তাহাই আছে।

সেকেন্দার সাহ অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া পড়িলেন। এত ভ্রমও মানুষের হয়! এতবড় রাজ্যের বাদসা হইয়া, আজ কি ছেলেমানুষীটাই না করিয়াছি! চিন্তাস্রোতে তাঁহার মুখ মলিন হইয়া গেল। কিন্তু এতটা ভ্রম সহজ মানুষেরা করিতে পারে, তাহা ত সম্ভব নয়। নিশ্চয় সমসেরের দেহ এই কবর হইতে কে সরাইয়াছে। চক্রান্ত! ভীষণ চক্রান্ত! আমারই চাকরে নিমক্‌হারামী করিয়াছে!! কালই এর ব্যবস্থা করিব। হতভাগ্যদের জিয়ন্তে পুতিব।"

মনের সন্দেহ যায় না। ছিন্নবস্ত্র-সংলিপ্ত অগ্নির ন্যায় ধিকি ধিকি জলিয়া উঠে। বাদসাহ মনে মনে ভাবিলেন,—সমসের যদি প্রকৃতই জীবিত থাকে, তবে তাহাকে অভয়দান করিলেই সে ত আসিতে পারে, এত অল্প সময় মধ্যে তাহার উদ্ধারকারীরা তাহাকে লইয়া পলাইবে কি করিয়া?

বাদসাহ সেই সমাধিক্ষেত্রে গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া, বিকৃতকণ্ঠে ডাকিলেন,—

"সমসের খাঁ!"

কেহ উত্তর দিল না। বাদসাহ আরও উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন,—

"সমসের, ফিরিয়া আইস। আমি গুজরাটের বাদসাহ, তোমায় ডাকিতেছি। আর তোমার অনিষ্ট করিব না। আল্লার নাম লইয়া বলিতেছি,—তোমায় উজীরি দিব।"

কেহ আসিল না। সেকেন্দর সাহ বিকৃত শূন্য-মস্তিষ্ক লইয়া, বিলাস-বাগে ফিরিয়া আসিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চারিদিকে বনজঙ্গলের দুর্ভেদ্য পরিখায় পরিবৃত এক ক্ষুদ্র পাহাড়ের বুকের উপর কয়েকখানি মৃৎকুটীর। কুটীরগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়াও পরস্পর সংলগ্ন। কুটীরের সম্মুখে বিঘা দুই সমতল-ভূমি। তাহাতে মানবের জীবিকার উপযোগী, শাকশব্জী ও তরীতরকারী উৎপন্ন হয়।

পাহাড়ের নিম্নদেশ হইতে এই কুটীর কয়েকখানি দেখিবার যো নাই। সেখানে যে লোকের বসবাস আছে, তাহাও কেহ বিশ্বাস করে না। সে স্থান সম্পূর্ণরূপে লোকসমাজের বহিঃকেন্দ্রে নিক্ষিপ্ত। বড় বড় বন্যবৃক্ষের শাখা-প্রশাখার বহুল বিস্তারে সেই অংশের বাহ্যদৃশ্য মধ্যাহ্নেও অন্ধকারময়।

পাহাড়ের দক্ষিণদিক্ বাহিয়া এক ক্ষুদ্র গিরিনদী। নদীতে স্বচ্ছ জল। নদী-গর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া তীরদেশ পর্য্যন্ত আগাগোড়া ছোট বড় প্রস্তরখণ্ডে পরিপূর্ণ। পাহাড়ের উপর হইতে গড়াইয়া গড়াইয়া এই প্রস্তরগুলি নদীগর্ভে প'ড়িয়াছে বলিয়াই বোধ হয়।

এই ক্ষুদ্র নদীতীরে বসিয়া এক অনিন্দ্যসুন্দরী; যেন কাহারও আশাপথ চাহিয়া আছে। কে যেন দূরে গিয়াছে, এখনই ফিরিয়া আসিবে। তাহার যেন আসিবার সময় হইয়াছে, এইরূপ আশা বুকে লইয়া, মুখে সেই আকুলিত-ভাব প্রকাশ করিয়া, সেই সুন্দরী বনদেবী হইয়া, সেখানে দাঁড়াইয়া আছেন।

সহসা কতকগুলি বনফুল উত্তরীয়ে বাঁধিয়া, পা টিপিয়া টিপিয়া, এক-জন পিছন হইতে সেই রূপসীর সুন্দর চক্ষু দুটি মৃদুভাবে আবরণ করিল। সেই ষোড়শী হাসিয়া বলিলেন,—"রহস্য রাখ আলিয়ার, আমি নদীর দিকে চাহিয়া আছি। তুমি পিছন হইতে আসিলে কিরূপে?"

আলিয়ার হাত ছাড়িয়া দিল। বস্তুতঃই সে আলিয়ার! তা না হইলে হাত ছাড়িয়া দিবে কেন?

উত্তরীয়নিবদ্ধ পুষ্পগুচ্ছ লইয়া আলিয়ার বলিল, "আমিন্! আসিবার পথ অনেক। যে যাহাকে ভালবাসে, সে ভালবাসার জিনিসকে দেখিবার জন্য কি পথের অভাব অনুভব করে? আমি নগর হইতে আসিয়াছি অনেকক্ষণ। তুমি যখন কুটীর হইতে বাহির হইয়া নদীতীরে আমায় অন্বেষণ কর, আমি তখন জানিতে পারিয়াছিলাম। তোমায় কষ্ট দিতাম না, এই ফুলগুলির জন্য এত দেরী হইল।"

সেই উত্তরীয়গ্রন্থিবিমুক্ত সুন্দর বনফুলগুলি সত্বরেই আমিনার কুণ্ডলীকৃত সুকৃষ্ণ বেণীর শোভা বর্দ্ধন করিল। আলিয়ার বলিল,—"পিতার নিকট একজন আগন্তুক রহিয়াছেন। আমিন্! এখন ত বাড়ী ফিরিবার যো নাই। এইখানে বসি এস। সূর্য্য ত অস্তাচলে গেলেন। এই পাহাড়ে নদীর ধারে পাথরের সিংহাসনে বসিয়া, বনের বিমুক্ত বায়ু সেবন করা কত সুখকর!"

দুইজনে বসিল। যেন প্রেম আসিয়া অনুরাগকে আলিঙ্গন করিল। জ্যোতিঃ আসিয়া রূপকে আশ্রয় করিল। সৌন্দর্য্য আসিয়া শোভাকে কোলে লইয়া বসিল। আলিয়ার, আমিনার সেই অযত্নক্লিষ্ট রক্তোৎফুল্ল গণ্ডে একটী আকাঙ্ক্ষিত চুম্বনের লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। আমিনাও ছাড়িবার পাত্রী নহে। সে বনের তরুলতা, উন্মুক্ত আকাশ ও কলনাদিনী নির্ঝরিণীকে সাক্ষ্য রাখিয়া, প্রতিশোধ লইল।

আমিনা বলিল,—"আলি! বাবা কি করিতেছেন?"

"তিনি একটা গোপনীয় মন্ত্রণায় ব্যস্ত। গুজরাট হইতে এক গুপ্তচর আসিয়াছে।"

"কিছু শুনিলে কি?"

"কতক শুনিয়াছি, ফিরিয়া গিয়া সব শুনিব।"

"আর কিছু শুনিলে না? পিতাকে যেরূপ কৌশলে রক্ষা করিয়াছি,

বাদসা কি তাহা জানিতে পারিয়াছেন? সমাধি-খননের রহস্য কি আজও প্রকাশ পায় নাই?"

"না, বাদসা ত ধরিতে পারেন নাই। আমরা যেদিন চলিয়া আসি, সেদিন তখনই বাদসা না কি সেখানে আসিয়াছিলেন। একজন প্রহরীর মুখে আমাদের গুপ্তচর এ সংবাদ শুনিয়াছে। বাদসাহ কিন্তু এ সম্বন্ধে আর কোন গোলমাল করেন নাই।"

"বস্—নিশ্চিন্ত হইলাম। কিন্তু আলি, এমন করিয়া কতদিন চলিবে? বড়-বংশে জন্মিয়া, সুখে পালিত হইয়া, দুঃখীর মত, চোরের মত, আর যে লুকাইয়া থাকিতে পারি না। পিতার কষ্টে যে প্রাণ ফাটিয়া যায়। তিনি একটা বড় বাদসার উজীর ছিলেন!!"

"আমিন্! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও যে, তিনি জীবন ফিরিয়া পাইয়াছেন। আর সেই হিন্দু-ফকীরকেও ধন্যবাদ দাও। ফাঁস হইতে নামাইয়া যখন তাঁহাকে গোর দিতে আনে, তখন তিনিই ত মুসলমান-বেশে পিতার দেহ পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারেন যে তিনি অর্দ্ধমৃত! তিনিই ত আমাদের সহায়তা করেন।"

"বাস্তবিক আলি! সেই দিন হইতেই ত সেই মহাপুরুষের দেখা নাই। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন, আবার প্রয়োজনমত দেখা দিবেন। পিতা কিন্তু তাঁহাকে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল।"

আলিমার বলিল,—"তাঁহাদের কথা মিথ্যা হয় না। তিনি সময় হইলেই দেখা দিবেন।"

"দেখ আলি! আমি তোমার উপর আজ রাগ করিব।"

"কেন আমিন্?"

"তুমি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবে কবে?"

"কিসের প্রতিজ্ঞা?"

"প্রতিহিংসার সহায়তা মনে নাই?"

এইবার সময় হইয়াছে। আজই সব স্থির করিব। আমাদের একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষী, আমীর মহব্বত খাঁ যে আমাদের গুপ্তচর, আর তিনি যে, পিতার কাছে এখন এসেছেন, তা কি তোমায় খুলে ব'ল্‌তে হবে আমিনা?"

"মহব্বত খাঁ! তাঁর এত দয়া! তিনিই পিতার প্রকৃত বন্ধু ছিলেন।"

মহব্বত বলিলেন,—"বাদসাহ এখনও খেলার বাতিক ছাড়েন নাই। দিন দিন আরও উগ্র-প্রকৃতি হইয়া উঠিতেছেন। এই এক মাসের মধ্যে আরও দুইজন নব-নিযুক্ত উজীরের মাথা গিয়াছে। এখন পণ হইয়াছে, প্রথমবার হারিলে মাথা যাইবে না, কিন্তু জিতিলে উজীরি প্রাপ্ত হইবে। দ্বিতীয়বারে পদচ্যুতি, তৃতীয়-বারে মস্তক-চ্যুতি।"

"দয়াময়! এই লুপ্তবুদ্ধি সেকেন্দার সাহকে সুমতি দিন। উজীরি দিয়া কৌশলে মাথা কাটিবার সখ্ কেন? করুণাময় আল্লা এমন নরপশুকেও সিংহাসনে বসাইয়াছেন!"

"আমিনা! কি জান, ও একটা ব্যাধি। তাহার প্রতিকার জন্য একজন উপযুক্ত চিকিৎসকের প্রয়োজন। কিন্তু সে চিকিৎসক মেলাও দুর্ঘট। বাদসাহকে খেলায় হারাইবে, এত সাহস কার?"

"খেলায় হারিলেই কি তাঁর চৈতন্য হইবে?"

"হওয়া খুব সম্ভব। জানিনা, এত শক্তি কাহার যে, সে আবার তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে?"

"আছে,—শীঘ্রই জানিতে পারিবে।"

"তুমি তবে ভবিষ্যৎ গুণিতে জান! কোথায় আছে বলনা কেন?"

"এখানেই আছে, এই তোমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া।"

"কে তুমি—আমিনা?" আলিয়ার হো, হো, করিয়া হাসিয়া উঠিল। গিরি, নদী, বৃক্ষতল, পর্ব্বত-গুহায় সেই হাসির প্রতিধ্বনি প্রবেশ করিয়া, আবার শূন্যে ফিরিল।

আমিনা পুনরায় হাসিয়া বলিল,—"আলিয়ার! আমি বাল্যাবধি পিতার কাছে খেলা শিখিয়াছি। তিনি হারিয়াছেন বলিয়া কি আমিও হারিব? আমার সহিত সখ করিয়া খেলিয়া, পিতা কতবার হারিয়াছেন।"

"আমিন্! তুমি যে বাদসাকে হারাইবে, তার আর বিচিত্র কি? অমন দুটি চোক যার, তার আর ভাবনা কি? যদি একদিনও এই মাথা-কাটা উজীরি করিতে পার, তাহা হইলে আমি উজীরনীর স্বামী হওয়ার গৌরবটা পাইব।"

আমিনা গম্ভীরভাবে বলিল,—"না আলি! রহস্য করিতেছি না। পিতার কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাঁহার নির্জ্জন-বাস-কষ্ট বিমোচন করিব,—বাদসাকে হারাইব। যদি পুত্র হইয়া জন্মিতাম, তাহা হইলে কি চুপ করিয়া থাকিতে পারিতাম? শাণিত-অস্ত্রে বাদসাহের বক্ষের উপর এ অত্যাচারের শোধ লইতাম। আলি! তুমি আমার সহায় থাকিলে, কিছুরই ভয় করি না।"

আমিনার মুখ দেখিয়া আলিয়ার বুঝিল, সে রহস্য করিতেছে না। বাল্যকাল হইতেই সে আমিনাকে চিনিত। কাজেই এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিবার জন্য বলিল,—"আমিনা! পরের কথা পরে হইবে; এখন অন্ধকার নামিয়া আসিতেছে,—চল, কুটীরে ফিরিয়া যাই।"

এমন সময়ে সহসা কে গম্ভীর-কণ্ঠে দূর হইতে ডাকিল,—"আমিনা।"

"যাই,—বাবা" বলিয়া আমিনা মরালগতিতে সেই শিলাতল ত্যাগ করিয়া ধাবমান হইল।

তখন অল্প অন্ধকার হইয়াছে। আলিয়ারও অন্য পথে কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

পাঠক! এই নির্জ্জন উপত্যকাবাসী জীব কয়েকটীকে চিনিয়াছেন

কি ? ইহারা উজীর সমসের খাঁ, তাঁহার কন্যা রূপসী আমিনা, আর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আলিয়ার।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পিতার কণ্ঠলগ্ন হইয়া কন্যা বলিতেছে, "পিতঃ ! আমায় বাধা দিবেন না ! আমার সংকল্প পবিত্র। কে যেন কাণে কাণে বলিয়া দিতেছে,—"আমিনা ! অগ্রসর হও, কোন ভয় নাই।"

পিতা সমসের খাঁ অশ্রুপূর্ণ-চক্ষে বলিলেন,—"মা ! তোমায় লইয়া আমি এত কষ্টেও সুখী। বাদসার উজীরি পাইয়াছিলাম, তাহা খোয়াইয়া, মরিয়া বাঁচিয়া বন্যপশুর প্রতিবাসী হইয়াছি। তুমি স্ত্রীলোক—শক্তিহীনা—তোমার সাধ্য কি মা, সেই দুরাচারের অত্যাচার-পথ রোধ কর ?" সকলি অদৃষ্টের কার্য্য। তোমায় কতবার বলিয়াছি,—"তক্‌দির কি বুরাই, তক্‌দির সে নেহি যাতি। বিগ্‌রী হুই তক্‌দির বানাই নাহি যাতি।"

"তাহা হইলেও পিতঃ ! আপনা হইতে এ ছার রমণী-দেহ পাইয়াছি। পুত্র হইলে, আপনার এ দুর্দ্দশা দেখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিতাম না। আমি বুদ্ধিহীনার মত কাজ করিতেছি না। সেই হিন্দু-ফকীর মহাত্মা, সে দিন আবার আমায় দেখা দিয়া, এ বিষয়ে সাহস দিয়া গিয়াছেন।"

"ফকির—হিন্দু ফকির ! কে তিনি ? কেন তিনি আমাদের প্রতি এত দয়াবান্ ?"

"মহাজনের স্বভাবই এই বাবা ! তাঁরা আত্মপর ভেদ রাখেন না। জাতিনির্ব্বিশেষে পাত্রাপাত্র-ভেদবিরহিত হইয়া, বিপন্ন লোকের উপকার করেন।

"কোথায় তুমি সেই মহাত্মার সাক্ষাৎ পাইয়াছ ?"

"এই পাহাড়ে, কাল গভীর রাত্রে তিনি আমায় দেখা দিয়াছিলেন। আমায় কুটীর হইতে ডাকিয়া লইয়া, কতকগুলি কথা বলিয়া গিয়াছেন। শুনিবেন, তাঁহার জীবনের কাহিনী—?"

আমিনা চুপে চুপে সমসের খাঁর কাণে গুটিকয়েক কথা বলিলেন। সেই মলিনমুখ উজীরের মুখমণ্ডল প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রসন্নমুখে বলিলেন,—"ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। আর তোমায় বাধা দিব না। কিন্তু এ স্ত্রীবেশ—"

আমিনা বলিল,—তার জন্য ভাবিবেন না! সে ভারও তিনি লইয়াছেন। বেশ-পরিবর্ত্তন কিছু বেশী আশ্চর্য্যের কথা নহে।"

সমসের খাঁ যুক্তকরে সেই মহাপুরুষের উদ্দেশে বলিলেন,—"সাধু! এতদিন তোমায় চিনিতে পারি নাই, আজ চিনিয়াছি। আজও যে হতভাগ্যকে ভুলিতে পার নাই, এই আমার সৌভাগ্য।' এখন বুঝিতেছি,—কেন তুমি আমায় বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছিলে?"

আমিনা বলিল,—"পিতঃ, এ কার্য্যে আরও দুইজনের সহায়তা চাই। আপনাকে ও আলিয়ারকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে। এত দুঃখকষ্টে আপনার আকৃতির যে বিসদৃশ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহাতে কেহই আপনাকে চিনিতে পারিবে না! তার উপর ছদ্মবেশ। আর আমি চাই আলিয়ারকে।"

"তোমার যাহা অভিলাষ আমিনা! কিন্তু সেই মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাইবে কোথায়?"

"মহব্বত খাঁর বাটীতে। সেইখানেই আপাততঃ আমাদের থাকিতে হইবে।"

"কালই তবে যাত্রা করি—কি বল?"

"তা আর বলিতে? এই সেদিন যে নূতন আদেশ প্রচার হইয়াছে, সেই খামখেয়ালি বাদসাহ শীঘ্রই তাহার পরিবর্ত্তন করিতে পারে।"

আমিনা পিতার বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বন করিয়া, নিজ কুটীর-কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

উজ্জ্বলিত কক্ষ। দ্বারের মাথার উপর সোণার হলকরা নানাবিধ চিত্র। নীচে খিলানের কক্ষ ভেদ করিয়া, অসংখ্য স্ফটিক-দীপাধার গৃহ-মধ্যে বিলম্বিত। প্রকোষ্ঠের চারিধারে কারুকার্য্যময় স্বর্ণপাত্রে রাশি রাশি সুগন্ধি ফুল। হর্ম্ম্যতলে সোণাবাঁধান ফলফুলের কাজ-করা, পাথরের সুন্দর ছোট চৌবাচ্চা। তাহাতে নানাবর্ণের মৎস্য ক্রীড়া করিতেছে। গৃহের স্থানে স্থানে রজতনির্ম্মিত ধূপাধারে অগুরু প্রভৃতি মনোরম সুগন্ধি মৃদু-অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া সুগন্ধ বিকীরণ করিতেছে। ফুলের সুগন্ধ, সেই সুবাসিত স্নেহদ্রব্যের সৎগন্ধ, আর কৃত্রিম প্রস্রবণের উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত বারিধারার সুখময় ঘ্রাণ, সেই বাদসাহী-কক্ষকে মাতাইয়া তুলিয়াছে।

বাদসাহ মধ্যে বসিয়া। আশে পাশে সাত আট জন প্রণয়িনী। কেহ বা পদসেবা করিতেছে, কেহ বা গ্রীষ্ম না থাকিলেও, ওড়না ঘুরাইয়া বাতাস করিতেছে, কেহ বা মধ্যে মধ্যে প্রয়োজনমত সরবতের পাত্র অগ্রসর করিয়া দিতেছে। কেহ বা চুপ করিয়া পিছনে বসিয়া, আর এক জনের প্রতি সরোষ কটাক্ষপাত করিতেছে। আবার কেহ বা দুই একটা রহস্যের কথা বলিয়া, গুর্জ্জরেশ্বরের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতেছে।

এই সুখের সময়েও বাদসাহের অবিশ্রান্ত সুখভোগ ঘটিয়া উঠিল না। এক গোলাম আসিয়া খবর দিল, "মহব্বত খাঁ বাহিরে দাঁড়াইয়া।"

"মহব্বত খাঁ? অন্তঃপুরে বিশ্রাম করিতেছি, তবুও নিস্তার নাই!! ডাক তাহাকে।

বাদসাহ, বেগমদিগকে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। মুহূর্ত্ত-মধ্যে সেই পরীর দল অদৃশ্য হইয়া গেল।

মহব্বত খাঁ গৃহে প্রবেশ করিলেন। কুর্ণীস করিয়া শয্যা-নিম্নে উপবিষ্ট হইলেন। বাদসাহ বলিলেন,—"খবর কি মহব্বত? আবার বিদ্রোহ নাকি?"

"না জাঁহাপনা, বিদ্রোহ নয়! কিন্তু এক সুন্দরমূর্ত্তি যুবক, মহা বিদ্রোহী হইয়া পড়িয়াছে। সে ত কোনমতেই আমার কথা শুনে না। বলে, আমি এই রাত্রে বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎ করিব। বিশেষ প্রয়োজন।"

"এত রাত্রে—কে সে? তাড়াইয়া দাও তাহাকে! কাল সাক্ষাৎ হইবে। না শোনে, প্রহরীদের হুকুম দাও, ফাটকে পূরিয়া রাখুক।"

জাঁহাপনা! অমন সুন্দরমূর্ত্তি যুবক আমি ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। তাহাকে তাড়াইবার কৌশল অনেক করিয়াছি। কিছুতেই সে যাইতে চাহে না।"

"আচ্ছা, আমি দেওয়ান-কামরায় যাইতেছি। তাহাকে সেইখানে লইয়া যাও। এত রাত্রে বড় ত্যক্ত করিল দেখিতেছি।"

বস্তুতঃ তখন সবে সন্ধ্যামাত্র। বাদশাহী কাণ্ড সবই অদ্ভুত!

বাদসাহ সেকেন্দার সাহ, দেওয়ানকক্ষে উপযুক্ত আসনে উপবিষ্ট। মহব্বত খাঁ এক সুন্দরমূর্ত্তি যুবককে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

উন্মুক্ত তরবারি ও উষ্ণীষ সিংহাসনের নীচে রাখিয়া, বাদসাহের ভূলুণ্ঠিত বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বন করিয়া, আগন্তুক যুবক প্রশ্নের অপেক্ষায় সসম্ভ্রমে দাঁড়াইল।

সে কমনীয় মূর্ত্তি দেখিয়া বাদসাহ মনে মনে খুব তারিফ করিলেন। সেই নবীন বয়স, সেই গৌরকান্তি, সেই অজাতশ্মশ্রু মুখমণ্ডলের তেজো-ব্যঞ্জক ভাব, সেই বিস্ফারিত লোচনযুগলের তেজস্বিতা—সেই সরল মুখের সরল হাসি দেখিয়া, বাদসাহ কোমলস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"যুবক! কি চাও? এ রাত্রে তোমার কিসের প্রয়োজন?"

জাঁহাপনা! আপনার উজীরি করিতে চাই।"

"উজীরি—সর্ব্বনাশ! কে তোমায় এ মন্ত্রণা দিল? অমন সুন্দর মুখ! এই নবীন বয়স!"

যুবক সসম্ভ্রমে উত্তর করিল,—"সব জানিয়া শুনিয়াই আসিয়াছি।"

"উজীরির মূল্য কি জান?"

"জানি, ক্রীড়া-পরাজয়ে ছিন্ন-মস্তক। জয়ে অতুল ঐশ্বর্য্য।"

"কিসে তোমায় এই দুঃসাহসিক কার্য্যে ব্রতী করিল?"

"উচ্চ আশা—দারিদ্র্য!"

"উচ্চ আশা সফল হইবার সময় পাইবে কি?"

"ঐশ্বর্য্য-সম্ভোগে দুঃখ দূর হইতেও পারে। কিন্তু আমার জীবনও বড় জ্বালাময় হইয়াছে। আত্মহত্যা মহাপাপ। উজীরি না পাই, রাজদণ্ডে জগৎ-সংসারের জ্বালা এড়াইব।"

"ছি! ছি! অবোধ যুবক, অমন কথা মুখে আনিও না।"

"যতই ভয় দেখান না কেন, নিরস্ত হইব না। জাঁহাপনা! ভদ্র-বংশে জন্মিয়া আজন্ম সৈনিকব্রতে দীক্ষিত হইয়া, আর দরিদ্রতার সহিত সংগ্রাম করিতে পারি না। এবার একবার অদৃষ্টের শক্তি পরীক্ষা করিব। উজীর হই, বাদসাহের কার্য্যে জীবন সমর্পণ করিব।"

"আচ্ছা, কালই তোমার পরীক্ষা হইবে। কালই আমার সঙ্গে এক বাজি খেলিতে হইবে। আজই আমি তোমায় বাহাল করিলাম। কোষাধ্যক্ষকে বলিয়া দিতেছি, ভাবী উজীরের বাহালী মুদ্রা দশ সহস্র আসরফি, সে তোমাকে এখনই দিবে।"

"একটী নিবেদন আছে, জাঁহাপনা! আমার সঙ্গে একজন সুদক্ষ সেনাপতি আছেন। তিনি আমার পরম বন্ধু। তাঁহাকেও সরকারের কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবে।"

"তোমার অমন সুন্দর মুখ! অমন মিষ্ট কথা! এই বয়সে অত

সাহস! আমি বড় আশ্চর্য্য হইয়াছি। আমার সম্মুখে মুখামুখি দাঁড়াইয়া কথা কহিতে অতি সাহসী লোকও সঙ্কুচিত হয়। আজ কি না তুমি আমায় যা বলিতেছ, তাই শুনিতেছি!"

যুবক, সস্মিত-বদনে উত্তর করিল,—"সে জাঁহাপনার অনুগ্রহ। অধীনের আর একটী আরজ আছে। আমি দুর্গের মধ্যে থাকিতে চাই না, অনেক কারণ। সহরের মধ্যে নিজে বাড়ী পছন্দ করিয়াছি। সেই বাটীতেই অবস্থান করিব।"

"তাহাই হইবে। আর আমি বলিতে পারি না। অনেক রাত্রি হইয়াছে। যুবক! এখন বিদায় হও, কাল সাক্ষাৎ হইবে। তোমার মুখ দেখিয়া আমার বড় মায়া হইয়াছে। আল্লা করুন, তোমার সহিত খেলায় আমিই যেন হারিয়া যাই। আমার নিদারুণ পণ তোমার সুন্দর দেহের উপর আধিপত্য করিবে, ইহা যেন না ঘটে। ঈশ্বর তোমায় দীর্ঘজীবী করুন।"

যুবক-উজীর মস্তকাবনত করিয়া, বিদায় লইলেন। মহব্বত খাঁর সহিত একবার চোখাচোখি হইল। যদি কেহ সেই সময়ে একটু মনোযোগের সহিত দেখিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত,—উভয়ের অধরোষ্ঠে একটু অস্ফুট হাস্য-রেখা প্রতিভাত হইয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সেদিন সহর বড় 'সরগরম'। এক অল্পবয়স্ক নবীন উজীর বাদসাহের সহিত পুনরায় খেলিবে,—এই উত্তেজনায় সমস্ত সহরটা পরিপূর্ণ। সবে তিনদিন মাত্র উজীর সাহেব রাজধানীতে আসিয়াছেন; অনেক লোক তাঁহাকে ভাল করিয়া এ পর্য্যন্ত দেখিতেও পায় নাই,—কাজেই প্রাতে মধ্যাহ্নে অপরাহ্নে তাঁহার দর্শনাশায় অনেক লোক রাজপথে জড় হইতে লাগিল; কিন্তু কাহারও দর্শনাশা মিটিল না।

খেলা দেখিবার জন্য নহে, খেলার পরিণাম ভাবিয়াই সকলে আকুল ও উদ্বিগ্ন। নূতন উজীর না কি বড় সুপুরুষ, অতি নবীন-বয়স্ক, তাই তাঁহার দিকে লোকের এত সহানুভূতি। তাই, দলে দলে নগরস্থ লোকেরা তাঁহাকে দেখিবার জন্য জনতা করিতেছে।

কিন্তু প্রহরীরা সে জনতা ভাঙ্গিয়া দিল। দিনের বেলায় কাহাকেও বাঘে লইয়া গেলে যেমন সকলে আশঙ্কিত হয়, খেলার সংবাদে লোকে সেইরূপ হইয়া পড়িল। বৃদ্ধ সমসের খাঁর মৃত্যুর পর, আরও দুইজন এইরূপে মাথা দিয়াছে।

নগরের ত এই অবস্থা। রাজভবনেও এইরূপ একটা উদ্বেগ ও আতঙ্কের ছায়া। যাহারা উজীরকে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিল, তাহারা সকলেই বিষণ্ণ। সকলেই মনে মনে নিষ্ঠুর-বাদসাহকে অভিসম্পাত করিতেছে।

বাদসাহ এতদিন বেশ ঠাণ্ডা ছিলেন। খেলার কথা ভুলিয়া যাইতেছিলেন; কিন্তু বহুদিন শিকারবিহীন ব্যাঘ্র শোণিতাস্বাদে যেরূপ ভীষণ ভাব ধারণ করে, সম্রাট্ সেকেন্দার সাহ এখন সেইরূপ অবস্থায় পড়িয়াছেন। একটা অজাতশ্মশ্রু বালক, তাঁহাকে ক্রীড়ায় পরাস্ত করিয়া, এত লোকের সম্মুখে অপমানিত করিতে চাহে,—এই চিন্তায় তাঁহার বিকৃত-মস্তিষ্ক ভয়ানক উত্তেজিত। তাঁহার হৃদয় হইতে অনুতাপ চলিয়া গিয়াছে। আবার তিনি সংহার-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন।

এবার খেলা আরম্ভ হইবে,—রত্নমঞ্জিলের সীমান্তবর্ত্তী সেই সাবেক ঘরে। যাহারা চাল বুঝে, বিচার করিতে জানে, তাহারাই জনকতক সেই গৃহে থাকিবে। বাদসাহের নিত্যসহচর তোষামোদেরা,—যাহারা কেবল গোলমাল করিয়া এত লোকের মাথা খাইয়াছে,—তাহাদের নীচ অন্তঃকরণও এই নবীন উজীরের জন্য ব্যথিত হইয়াছে।

সন্ধ্যার পর উজ্জ্বলিত-কক্ষে খেলা আরম্ভ হইল। বাদসাহ ও

তাঁহার সম্মুখে নবীন উজীর। চারিপাশে অমাত্যবর্গ। গৃহভিত্তি-বিলম্বিত উজ্জল আলোকে সকলের মুখই পরিদৃশ্যমান। উদ্‌গ্রীব হইয়া সকলে খেলার চাল দেখিতেছে।

বাদসাহের চির-অভ্যস্ত হাত আজ যেন কি হইয়া গিয়াছে। তাঁহার চাল খারাপ হইতে লাগিল। নবীন উজীর ক্রমশঃ জয়ের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আমীরেরা, তোষামোদেরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চায়ি আরম্ভ করিল। শেষ চালে বাদসাহ পরাজিত হইলেন। দুই এক জন সহসা চীৎকার করিয়া উঠিল,—"বহুৎ আচ্ছা—"

বাদসাহ তাহাদের প্রতি কঠোর দৃষ্টি করিলেন। তাহাদের মুখ হইতে সহসা কথাটা বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, সেটা কেবল একটা উত্তেজনার ফল। তাহারা বেশ সমজাইয়া গেল। একবারে মুখ বন্ধ করিল।

বাদসাহ হারিয়াও হারিতে চাহেন না। তাঁহার মনে একটা ঘৃণার সঞ্চার হইতেছে।

কখন হারি নাই, আজ একটা অজাতশ্মশ্রু বালকের সহিত পরাস্ত হইতে হইল, সেকেন্দর বাদসার এ কলঙ্ক কখনও ঘুচিবে না। তিনি গম্ভীর-কণ্ঠে আদেশ করিলেন,—"আবার খেলা আরম্ভ হউক।" এইবার সকলে আরও ভীত হইল।

হস্তিদন্তময় দাবার ঘুঁটিগুলি পুনরায় সাজান হইল। এবার খেলার অবস্থা দেখিয়া, সেই সব পার্শ্ববর্ত্তী ওমরাহেরা "বাদসাহের জয়" বলিয়া একটা ভীষণ চীৎকার করিল। সে চীৎকারে, সেই রত্নমঞ্জিলের লোহিত প্রস্তরময় কক্ষ পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। বাদসাহ সেবার হারিবার মুখে জিতিলেন।

নবীন উজীরের মুখ শুকাইল। তিনি দেখিলেন, মৃত্যু তাঁহার শিয়রে। বাহ্যিক একটা খুব উৎকণ্ঠার লক্ষণ দেখা গেল; কিন্তু যদি

কেহ তাহার অন্তরের মধ্যে সূক্ষ্ম দৃষ্টিক্ষেপ করিত, তাহা হইলে বুঝিত, তিনি এ পরাজয়ে আনন্দিত।

বাদসাহ উল্লসিত-মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"উজীর, এইবার!" ব্যাঘ্র শীকার ধরিয়া যেরূপে তাহার নিরাশ-কাতর মুখের দিকে একবার উল্লাসপূর্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করে, বাদসাহ সেইরূপ উল্লসিত।

উজীর ভগ্ন-হৃদয়ে মলিনমুখে বলিলেন,—"যখন জানিতে পারিয়াই খেলিতে বসিয়াছি, তখন জীবন-বিসর্জ্জনে ভয় করি না। জাঁহাপনা, কিন্তু আমায় দুই দিন সময় দিন।"

বাদসাহের কঠোর-হাস্যে সেই গৃহ প্রতিধ্বনিত হইল। দুই একজন তাহার অনুকরণ করিয়া, তাঁহার মন রাখিতেও ছাড়িল না। বাদসাহ বলিলেন,—"আচ্ছা, তাহাই হইবে। তোমার এই নবীন বয়স, সুন্দর মুখশ্রী দেখিয়া তোমার উপর দয়া হইয়াছিল। কিন্তু তুমি আমায় প্রথমেই হারাইয়াছিলে, ক্ষমা করিতে পারিতাম। কিন্তু—"

আর বলিতে হইল না। একজন প্রহরী আসিয়া বাদসাহের সম্মুখে একখানি লোহিত মোড়কাবৃত পত্র ও একটী অঙ্গুরীয় ধরিল। বাদসাহ ধীরে ধীরে সেই পত্রখানি উন্মোচন করিলেন। তাঁহার সেই সহাস্য মুখ মলিন হইয়া গেল। তিনি পত্রখানি নবীন উজীরের হাতে দিলেন।

উজীরও মুখে খুব বিষণ্ণতার ভান দেখাইলেন। শুষ্ক-মুখে বলিলেন,—"এখন উপায়?"

বাদসাহ অন্যান্য সকলকে উঠিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। ক্রীড়া-গৃহ মন্ত্রভবনে পরিণত হইল। বাদসাহ বলিলেন,—"উজীর, পূর্ব্বকথা ভুলিয়া যাও। তোমার প্রাণদণ্ড আপাততঃ রহিত করিলাম। নূতন সেনাপতি আলিয়ার যদি এই বিদ্রোহীদের দমন করিতে পারে, দশ হাজার আসরফি পুরস্কার দিব। কিন্তু বিদ্রোহীদের সর্দ্দারকে জীবন্ত

আনিতে হইবে। সেই পশুর জীবনের পরিবর্ত্তে তোমার জীবন ফিরিয়া পাইবে।"

নবীন উজীর আগ্রহের সহিত বলিলেন,—"দেখি, আল্লা কি করেন? জাঁহাপনা! এ গোলাম চেষ্টার ত্রুটি করিবে না। এই উপায়েও যদি আমার প্রাণ-ভিক্ষা পাই, তাহাও মঙ্গলকর!"

পরদিন প্রাতে সকলেই দেখিল,—সেনাপতি আলিয়ার খাঁ সসৈন্যে নগরদ্বার হইতে বাহির হইতেছেন। নগরবাসীরা নবীন সেনাপতির বীরত্বব্যঞ্জক মূর্ত্তি দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইল। তিনি কোথায় কি উদ্দেশ্যে যাইতেছেন, কেহই জানিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

এক নির্জ্জন-কক্ষে আমিনা উপবিষ্ট। নিকটে কেহ নাই, কেবল চিন্তাই আমিনার সঙ্গিনী। আমিনা মনে মনে ভাবিতেছে,—"ঘটনা-স্রোত কোথায় যে আমাদের লইয়া যাইতেছে, তাহাও জানি না। দুরাশায় ভর করিয়া, সেই হিন্দু-সন্ন্যাসীর কথায় ভুলিয়া, এই দুরূহ কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছি। স্ত্রীলোকের পক্ষে যাহা অসম্ভব, তাহা করিয়াছি। সন্ন্যাসী মহাশয় যে কে, তাহা ত আজও বুঝিলাম না। তিনি অযাচিতভাবে, এ অভাগিনীর অনেক উপকার করিয়াছেন। পিতাকে অর্দ্ধমৃত অবস্থায়, বধ্যভূমি হইতে ফকিরবেশে সরাইয়া আনিয়াছেন। আমরা ত তখন প্রাণভয়ে লুক্কায়িত,—এ হতভাগ্যদের মুখের দিকে কেহ ত দেখিবার ছিল না। তিনিই ত পরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারিয়াছিলেন, ভয়ে দারুণ শ্বাসরোধে, পিতার চেতনাই অপহৃত হইয়াছে,—মৃত্যু হয় নাই। তিনিই ত সর্ব্বসমক্ষে, দিবাভাগে, সাধারণের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য পিতার শবদেহ সমাধিস্থ করিয়াছিলেন। কবরের মধ্যে শবাধারে কৌশলে বায়ু-প্রবাহপথ রাখিয়া, ঔষধ দ্বারা পিতার

দেহে জীবনীশক্তির সঞ্চার রাখিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু হইয়াও, নির্ব্বিকারচিত্তে মুসলমানের সমাধিক্ষেত্রের সব কাজই করিয়াছিলেন। তিনিই ত সেই নীরব নিশীথে পিতাকে সমাধি হইতে উত্থিত করিয়া, পুনরায় বাঁচাইয়াছিলেন। আমার বোধ হয়, তিনি ঈশ্বরের প্রেরিত দূত,—না হয় কোন অদ্ভুতশক্তিশালী ব্যক্তি। আজ রাত্রে তিনি আমায় নির্জ্জনে দেখা করিতে বলিয়াছেন। সরাইখানার ঘাটে,—তাঁহার জীবনের কথা বলিবেন বলিয়াছেন। তাঁহার সহিত একবার দেখা করা নিতান্তই প্রয়োজন।"

"প্রাণাধিক প্রিয়তম আলিয়ারকে শত্রুমুখে পাঠাইয়া অবধি, আমার প্রাণ চঞ্চল হইয়াছে। জানি না, আলিয়ার এখনও জীবিত আছে কি না? সেই সন্ন্যাসীই ত অদ্ভুত উপায়ে বাদসাহের কাছে বিদ্রোহ-সংবাদ পাঠাইয়া, আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন! মহব্বত খাঁ নিশ্চয়ই এ মহাপুরুষকে চেনেন। কিন্তু তিনিও ত কিছুই ভাঙ্গিতে চান না।"

আমিনা ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ করিয়া, একবার মুকুরের নিকট দাঁড়াইলেন। নিজের কমনীয় মূর্ত্তি,—সেই মুকুরে প্রতিফলিত দেখিয়া একটু হাসিলেন। সহসা শিহরিয়া উঠিয়া দ্বারের দিকে দেখিলেন, দ্বার বন্ধ; সুতরাং সে উদ্বেগের নিবৃত্তি হইল।

"এই বেশেই যাওয়া উচিত। রাত্রিও দ্বিপ্রহর হয়। আলিয়ারের সংবাদ তাঁহার মুখেই পাইব, এই আশায় যাইতেছি; জগদীশ্বর আলির মঙ্গল করুন।"

আমিনা এক কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রে সর্ব্বশরীর আবৃত করিয়া, গভীর নিশীথে একাকিনী নদীতীরে চলিলেন। সেই নীরব নিশীথে স্রোতস্বিনীর এক নিভৃত ঘাটের উপর, আমিনা একাকিনী বসিয়া আছেন। সেই ভীষণ অন্ধকারের তীব্রতায় সহিত—নিজের কৃষ্ণকায় মিলাইয়া, গোমী নদী

আঁধার সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে বহিয়া চলিয়াছে। নীল আকাশে তারাগুলি,—তাহার কৃষ্ণসলিলের উপর নিজেদের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ নিক্ষিপ্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। নদীতীরস্থ বৃক্ষগুলিও পত্র-সঞ্চালন বন্ধ করিয়াছে।

সহসা সেই অন্ধকারে এক দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী আসিয়া তাহার স্কন্ধদেশে হস্ত স্পর্শ করিয়া গম্ভীরস্বরে ডাকিলেন,—"আমিনা!"

ছদ্মবেশী আমিনা বলিল,—"আপনি আসিয়াছেন, কিন্তু এত দেরী হইল যে?"

"একটু কাজ বাকি ছিল,—সেটুকু সারিয়া আসিয়াছি। তোমায় বলিয়াছিলাম, শেষ একদিন সাক্ষাৎ হইবে। আজ সেই দিন। আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে। আমার প্রতিহিংসা-ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। আজ তুমি যাহা করিলে না,—আলিয়ার যাহা পারিল না, আমি তাহা শেষ করিয়া আসিলাম।"

"সব ভাঙ্গিয়া বলুন,—না হইলে বুঝিতে পারিতেছি না।"

"আমিনা! প্রতিশোধের ভার ন্যায্যতঃ তোমার উপর; কেন তাহা বলিতেছি। তাই কৌশলে তোমায় এই কার্য্যে ব্রতী করিয়াছিলাম। কিন্তু তোমার দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। আলিয়ারও পারিবে না!"

"কেমন করিয়া জানিলেন, আলিয়ার পারিবে না?"

"হিন্দুর যোগবল বলিয়া একটা জিনিস আছে। বিশ্বাস কর কি?—"

"আজ্ঞে, খুবই করি। অপরের মুখে শুনিলে করিতাম না। আপনার মুখ হইতে কখনও অসত্য বাহির হয় না।"

"তা স্পষ্টই দেখিতেছি; আলিয়ার, বিদ্রোহীর সর্দ্দারকে ধরিতে পারা দূরে থাক্, তাহাদের হস্তে বন্দী হইয়াছে। বিশ সহস্র আসরফি না দিলে, তাহার জীবন রক্ষা হইবে না। তাহার নিরাপদ প্রত্যা-

বর্ত্তনের উপর তোমার জীবন। না আসিলে এই দুষ্টবুদ্ধি বাদসাহ অন্যরূপ বুঝিবে। বাদসাহ বিশ্বাস করিবেন না যে, আলিয়ার বন্দী হইয়াছে। মনে করিবেন, প্রাণভয়ে পলাইয়াছে।”

“আলিয়ারকে যদি ফিরিয়া না পাই, তাহা হইলে আমিও মরিতে প্রস্তুত। আপনার কাছে বলিতে লজ্জা বোধ হয়, আমি আজও প্রবৃত্তি জয় করিতে শিখি নাই। আমি আলিয়ারকে ভাল বাসিয়াছি। তাহাকে না পাইলে, মৃত্যুই আমার শ্রেয়ঃ। অত টাকাই বা কোথায় পাইব? টাকাও হইবে না,—আলিয়ারও ফিরিবে না।”

“মা! আলিয়ারের উদ্ধারের উপায় আমি করিয়াছি। টাকা কার, কে ভোগ করে? এ জগতে টাকা লইয়া অনেক নাড়াচাড়া করিয়াছি। এ গরীবের অনেক টাকা ছিল। আমি আজীবন সন্ন্যাসী নহি।”

আমিনা সেই অন্ধকারবেষ্টিত দীর্ঘাকার মহাপুরুষের পা দুখানি জড়াইয়া ধরিলেন। সন্ন্যাসী সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—“মা! রাত্রি পোহাইবার পূর্ব্বেই আমি নগর ত্যাগ করিব। সেকেন্দার সার মৃত্যু-সংবাদ পাইলেই, এ পাপরাজ্য ত্যাগ করিয়া হিমালয়পথবর্ত্তী হইব। আর তুমি আমায় দেখিতে পাইবে না। কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে তোমায় এক অদ্ভুত কথা শুনাইব।”

আমিনা সহসা বাদসাহের মৃত্যু-সম্ভাবনা শুনিয়া, অধিকতর আশ্চর্য্য হইলেন। কাতরকণ্ঠে বলিলেন,—“প্রভো! কিছুইত বুঝিতে পারিতেছি না।”

“বৎসে! সকল কথা খুলিয়া না বলিলে, কি করিয়া বুঝিবে?” আমিনা তোমার প্রকৃত নাম নয়। তুমি হিন্দুর ঘরে জন্মিয়াছ। তোমার নাম রত্নবতী। সেকেন্দার সাহ যে সময় রাজনগর আক্রমণ করেন, তখন তোমার বয়স তিন বৎসর। আমি জাতিতে শ্রেষ্ঠী। অগাধ ঐশ্বর্য্য আমার ছিল। আমিই রাজনগরের রাজার রত্নবণিক্ ছিলাম।”

"দুষ্ট, রাজপুরী ধ্বংস করিয়া, অর্থের আশায় আমার পুরীতে প্রবেশ করিল। সেই অগণিত সৈন্যপ্রবাহকে আমার লোকজন রোধ করিতে পারিল না। আমি তখন রাজকার্য্যেই বারাণসীতে ছিলাম। যেদিন এই ঘটনা হয়, সেই দিনই বাড়ীতে পৌঁছি।"

"রাজা যুদ্ধে নিহত, রাজ্য দস্যু-হস্তগত। আমার স্ত্রীপুত্রও গৃহে নাই,—ভাণ্ডার লুণ্ঠিত। উন্মাদের মত একবস্ত্রে আমি গৃহত্যাগ করিলাম। এক বিশ্বাসী ভৃত্য, আমার একমাত্র এক-বৎসর-বয়স্কা কন্যা ও আমার প্রধান কর্ম্মচারীর পুত্র কুমারসিংহকে অতি সংগোপনে কোন স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। সেই আসিয়া পথিমধ্যে আমায় সংবাদ দিল। আমার সহধর্ম্মিণী (তোমার গর্ভধারিণী) শত্রুর আগমন-সংবাদের পূর্ব্বেই বিষ-পানে আত্মহত্যা করেন।"

"আমি সেই শিশু-কন্যা ও কুমারসিংহকে লইয়া নৌকাযোগে পলায়ন করিলাম। সেই নদীর তরঙ্গবিহীন বক্ষে, কখনও ঝড় হইতে দেখি নাই। আমার অদৃষ্টক্রমে সেই দিন রাত্রে, ঝড়ে আমাদের নৌকা ডুবিয়া গেল। আমি তোমাদের বাঁচাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না। শেষ অনেক কষ্টে জীবন লইয়া পরপারে পৌঁছাই। তখন আমার অর্দ্ধ-চেতন অবস্থা। তীরে পৌঁছিয়াই মূর্চ্ছিত হইলাম।"

"চেতনা-সঞ্চারের পর বুঝিলাম, কাহারও সজ্জিত-কক্ষে আমি শুইয়া আছি। শুনিলাম, সে বাটী একজন ধনী মুসলমানের। তাঁহার নাম সমসের খাঁ।"

তাঁহার ভৃত্য আমায় ব্যাকুল দেখিয়া বলিল,—"আপনি উতলা হইবেন না। আপনার সেই দুটী শিশুকে অর্দ্ধমৃতাবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। আমার প্রভু তাহাদের লইয়া নগরে গিয়াছেন। এখানে বড় লুঠের ভয়। রাজনগর অধিকারের পর সেকেন্দার সাহ, শীঘ্রই এদেশ লুণ্ঠন করিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। আমার প্রভু পূর্ব্বেই পলাইয়াছেন। বাড়ীতে

আর কেহই নাই। তাঁহার আদেশে কেবল আমিই আপনার চেতনার জন্য অপেক্ষা করিতেছি। আপনিও পলায়ন করুন—"

"কন্যাটী ও শিশুটী জীবিত আছে, এই সংবাদেই তখন আমার অপার আনন্দ হইল। তাহাদের জাতি ও ধর্ম্ম লোপের আশঙ্কা আদৌ তখন মনে উঠিল না। আমি দুই একদিন মধ্যে সুস্থ হইয়া,—সেই ভৃত্যের সঙ্গে, সমসের খাঁর গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইলাম। সেখানে তাঁহাকে পাইলাম না। তারপর অনেক ঘুরিয়া, গুর্জ্জরে তোমাদের সন্ধান পাই। আমার সেই এক বৎসরের কন্যা রত্নবতী, আজ তুমি "আমিনা",—আর সেই সুকুমার তিনবর্ষীয় শিশু কুমারসিংহই "আলিয়ার।" আর উজীর সুমসের খাঁই তোমাদের পালক-পিতা।"

সেই অন্ধকারমধ্যে আমিনার চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। আমিনা তখন বুঝিল, কেন সেই হিন্দু-সন্ন্যাসী তাহার জন্য—তাহার পালক-পিতার জন্য এত করিয়াছেন। আমিনা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"পিতঃ! আমায় যদি ফিরিয়া পাইলেন,—তবে কেন সংসার ত্যাগ করিবেন? আমাদের জাতি গিয়াছে, —ধর্ম্ম গিয়াছে,—কিন্তু সংসারে আসুন। আপনাকে দেখিয়াই আমাদের সুখ।"

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"না—মা! আর সংসারে থাকিব না। সংসারে থাকিয়া পশুভাব প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রতিহিংসার প্রবল-বহ্নিতে জ্বলিয়া জ্বলিয়া, নরকের কীট হইয়াছি। তোমার জীবন-রক্ষার জন্য, আলিয়ারের জীবন-রক্ষার জন্য, প্রতিহিংসার জন্য, আজ যা করিয়াছি,—তাহা আজীবন প্রায়শ্চিত্তেও যাইবে না।"

"পিতঃ! এমন কি-দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন, যার জন্য আজীবন প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন?"

"মা! যা করিয়াছি, তাহা আর ফিরিবে না।"

"কি করিয়াছেন—পিতঃ?"

১৬

"আমি প্রতিহিংসাবশে বাদসাহকে বিষ-প্রয়োগ করিয়াছি।"

"কবে—কেন এ কাজ করিলেন?"

"এখনও এক প্রহর অতীত হয় নাই। তোমার মা'র সেই বিষাক্ত-দেহ, মলিনমুখ আজও আমার মনে জাগিতেছে। তাহার সেই মৃত-দেহের ছায়ামূর্ত্তি দিনরাতই আমার কাণে কাণে বলিতেছে,—"প্রতি-হিংসা! প্রতিহিংসা!!" তোমার দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্যই, তোমায় স্ত্রীবেশ ত্যাগ করাইয়া পুরুষ সাজাইয়াছি। পরে বুঝিলাম, তোমায় কেন অযথা পাপভাগিনী করিব? অনেক ভাবিয়া, আমি নিজে এই কাজ হাতে লইয়াছি। যে নিষ্ঠুর ব্রত, পৈশাচিক কাণ্ডের সূচনা করিয়াছিলাম, আজ তাহা শেষ করিয়াছি।"

আমিনা আকুলকণ্ঠে বলিল,—"পিতঃ! সর্ব্বনাশ করিয়াছেন! আমি সামান্য বালিকামাত্র। কিন্তু প্রতিহিংসার স্থানে ক্ষমা দেখাইলে, বোধ হয় উপযুক্ত শাস্তি হইত। ক্ষমাই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম।"

সন্ন্যাসী গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"তাহার অবসর পাইলাম কই? যাহা করিয়াছি, তাহা আর ফিরিবে না। আমারই ন্যায় আর এক হতভাগ্য, বাদসাহের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া, তাহার অন্তঃপুরে বাস করি-তেছে। সেই আমার সহায়তা করিয়াছে। সেই বাদসাহের তাম্বূলের মধ্যে তীব্র স্বাদহীন বিষ রাখিয়া দিয়াছে। মা! যা করিয়াছি, নিজ হস্তে করি নাই। তবুও ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিব। নিজের জন্য তুষানল ব্যবস্থা করিব।"

আমিনা অনেকক্ষণ কি ভাবিল, বলিল,—"পিতঃ! অতীতের অনু-শোচনায় ফল নাই। একটী শেষ অনুরোধ, যেন আর একবার আপ-নার দেখা পাই। আলিয়ার কি আজই ফিরিয়া আসিবে?"

"হাঁ—আজই, শেষরাত্রে। সেজন্য নিশ্চিন্ত থাক। অবস্থা বুঝিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছি।" সন্ন্যাসী বস্ত্রমধ্য হইতে এক থলিয়া

বাহির করিয়া, আমিনার হাতে দিয়া বলিলেন,—"মা! এই ক্ষুদ্র আধারটীর মধ্যে অনেক জিনিস আছে। কুমারসিংহের সহিত তোমার বিবাহ দিব বলিয়াই, তাহাকে লালনপালন করিয়াছিলাম। বিধাতা সে আশা সমূলে বিনাশ করিলেন। তাঁহারই লীলায় তোমরা জাতিভ্রষ্ট, ধর্ম্মচ্যুত, আমার অঙ্কচ্যুত। বিবাহের সময়ে থাকিতে পারিব না। আজ কিছু যৌতুক দিলাম,—সময়মত এই পেটি খুলিয়া দেখিও। সেই মঙ্গলালয়ের কৃপায়, তোমরা আজীবন সুখী হও।" সন্ন্যাসী আর বলিতে পারিলেন না, তাঁহার কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইতেছিল। আমিনা সেই সন্ন্যাসীর পদবন্দনা করিলেন।

দূরে যেন কাহারও পদশব্দ শ্রুত হইল। আমিনা চমকিয়া পশ্চাৎদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না! সম্মুখে ফিরিয়া দেখেন,—সন্ন্যাসী সেই অন্ধকারে সহসা অন্তর্দ্ধান হইয়াছে।

সন্দিগ্ধচিত্তে আমিনা ঘাটের উপর উঠিলেন। দেখিলেন, অদূরে এক ছায়ামূর্ত্তি ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। আমিনা এক বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইলেন। মূর্ত্তি ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া চলিয়া গেল। আমিনা ত্বরিত বেগে পথ ঘুরিয়া নিজ বাটীর দ্বারের সম্মুখেই আসিলেন। দেখিলেন, সম্মুখেই—আলিয়ার।

"আলিয়ার! আলিয়ার! তুমি আসিয়াছ? কতই ভাবনা হইয়াছিল! তুমি শত্রু হস্তে বন্দী, আর কি তোমায় ফিরিয়া পাইব!"—আমিনা সেই অবস্থাতেই আবেগভরে আলিয়ারকে আলিঙ্গন করিল। আলিয়ার কাতরকণ্ঠে বলিল,—

"এ সব খবর তোমায় কে দিল আমিন্?"

"সেই মহাপুরুষ,—তিনিই তোমায় মুদ্রা দিয়া উদ্ধার করিয়াছেন।"

"তাঁহাকে শত শত অভিবাদন করি। আমার বোধ হয়, তিনি এ

পৃথিবীর লোক নহেন। কোন স্বর্গীয় দূত। তা না হ'লে এই অভাগা-দের উপর তাঁহার এত করুণা কেন?"

আমিনা আবেগপূর্ণকণ্ঠে বলিল,—"প্রিয়তম! সে অনেক কথা। সেই মহাপুরুষের আজ পরিচয় পাইয়াছি! সে সব কথা শুনিলে তুমি আরও আশ্চর্য্য হইবে। সে সব পরে হইবে,—কিন্তু আর একটী কর্ত্তব্য আমাদের সম্মুখে। বিলম্বে সর্ব্বনাশ হইবে। তোমায় পাইয়া আমি সব ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আলিয়ার! বাদসাহের যে জীবনসঙ্কট অবস্থা।"

আমিনা, আলিয়ারকে দুই চারি কথায় সমস্ত ঘটনা বুঝাইয়া দিল। দ্রুতপদে নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া, আমিনা ত্বরিত বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া লইল। সেই গভীর নিশীথে দুই জনেই সেই লোক-সমাগম-বিরহিত, গুর্জ্জরনগরীর রাজপথ দ্রুতপদে অতিবাহিত করিয়া, বিলাস-বাগের দ্বারে উপস্থিত হইল। বিলাসবাগের মধ্যবর্ত্তী রত্নমঞ্জিলের রত্নকক্ষে বাদসাহ আছেন।

দ্বারে এক প্রহরী ঢুলিতেছিল। সে অত রাত্রে নূতন উজীর ও সেনা-পতিকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল। সঙ্গীন নোঙাইয়া সম্মান প্রদর্শন করিল।

আলিয়ার সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাদসাহ কোথায়? কেমন আছেন?"

প্রহরী আশ্চর্য্য হইল। সে অন্তঃপুরের কোন সংবাদই রাখে না।

আলিয়ার পুরীমধ্যে গিয়া, প্রধান শরীর-রক্ষীকে জাগাইলেন। গোলমালে মীর মুন্সি ও আরও কয়েকজন কর্ম্মচারী জাগিয়া উঠিল। সকলেই দ্রুতপদে বাদসাহের কক্ষের নিকটবর্ত্তী হইয়া দ্বার ঠেলিলেন। দ্বার খুলিয়া গেল।

রত্নমঞ্জিলের কক্ষমধ্যে তখনও সুগন্ধি দীপ উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছে। তাঁহারা যে দৃশ্য দেখিলেন,—তাহা অতি ভীষণ। তাঁহাদের সকলেরই মুখ উদ্বেগে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

পার্শ্বের রত্নখচিত শয্যায়, বাদসাহ সেকেন্দার সাহ কক্ষের মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার মাথায় উষ্ণীষ ঠিক্‌রাইয়া পড়িয়া কক্ষমধ্যে গড়াগড়ি যাইতেছে। সেই সাধের দাবাখেলার ঘুঁটিগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।

সকলেই ব্যস্ত হইয়া তাঁহার দেহস্পর্শ করিলেন। সেই হিমাঙ্গ, মলিনমুখ, বিকৃতবদন, নিশ্চল, নিষ্পন্দ দেহ-যষ্টি দেখিয়া সকলে বুঝিলেন,—গুর্জ্জরের বাদসাহ সেকেন্দার সাহের বাদসাহী-লীলা শেষ হইয়াছে।

তখনই হাকিম ডাকা হইল। মানুষে যাহা পারে না, তাহা তাহার দ্বারা হইবে কেন? হাকিম মুখ বাঁকাইয়া বলিল,—বাঁচাইব কাহাকে? প্রায় দুই ঘণ্টা হইল, বাদসাহ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন!"

গুর্জ্জরের অভিশপ্ত সিংহাসন শূন্য হইল। মলিনমুখে সকলেই সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন। যথাকর্ত্তব্য মন্ত্রণায় সকলেই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

তখন প্রভাত হইয়াছে। অন্ধকার পলাইয়াছে। প্রভাতী-পক্ষীরা কূজন আরম্ভ করিয়াছে। শীতল-সমীরে রত্নমঞ্জিলের কক্ষগুলি পুনরায় সজীব হইতেছে। হায়! হায়! বাদসাহ সেকেন্দার সাহ, সে দিনের প্রভাত আর দেখিতে পারিলেন না। সব ফুরাইল।

সিংহাসন কখনও শূন্য থাকে না। রাজ্যের প্রধানগণ, সেকেন্দার সাহের অপমৃত্যুতে দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু সিংহাসন শূন্য থাকিল না। নূতন সেনাপতি আলিয়ার খাঁকে তাহারা গুর্জ্জরের রত্নময় সিংহাসনে বসাইলেন। আর ছদ্মবেশী নবীন উজীরের প্রকৃত-রহস্য যখন প্রকাশিত হইয়া পড়িল, তখন সেই রত্নমঞ্জিলের উজ্জ্বলিত কক্ষে আমিনা, আলিয়ারের পার্শ্বে বসিয়া, সেই রত্নকক্ষের শোভা সম্বর্দ্ধন করিলেন। শুভক্ষণে শুভদিনে সেই রত্নমঞ্জিলেই তাঁহাদের উদ্বাহ-কার্য্য শেষ হইল।

আলিয়ার "জাহান্দারসাহ" উপাধি ধারণ করিয়া, গুর্জ্জরের প্রজা-পালন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ সমসের খাঁ, রাজ্যের প্রধান উজীরের পদে নিযুক্ত হইলেন। আমিনা "আফ্‌সারান্নিসা বেগম" উপাধি ধারণ করিলেন।

একদিন আফ্‌সারান্নিসা বেগম হাসিতে হাসিতে রত্নমঞ্জিলের নিভৃত কক্ষে বসিয়া, গুর্জ্জরের নবীন সম্রাট্ জাহান্দারসাহকে প্রেমপূর্ণ-কণ্ঠে ডাকিলেন,—"আলিয়ার! আলি!" সম্রাট্ জাহান্দারের পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তিনি হাস্যমুখে আমিনার সেই রক্তোৎফুল্ল ওষ্ঠাধরে একটী আগ্রহপূর্ণ চুম্বন-রেখা অঙ্কিত করিয়া বলিলেন, "কেন আমিন?"

আমিনা বলিল,—"আজ আমি আফ্‌সারান্নিসা বেগম, আর তুমি জাহান্দারসাহ বাদসা। মনে পড়ে,—সেই পার্ব্বত্য ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর! মনে পড়ে,—সেই নির্ঝরিণীর কলসঙ্গীত! মনে পড়ে,—সেই হরিণ-শিশুর মধুর নৃত্য! মনে পড়ে,—সেই চন্দ্রকিরণাঙ্কিত আকাশে জলন্ত-নক্ষত্র! মনে পড়ে,—প্রেমের সেই করুণ-সঙ্গীত! আমাদের সেই প্রকৃতির স্নেহময় কোলে আমরা সুখী ছিলাম, না আজ এই "রত্নমঞ্জিলে" বেশী সুখী?"

গুর্জ্জর-সম্রাট্, রাজমহিষীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—"রাজ্ঞি! সে স্মৃতি কখন ভুলিতে পারিব না। প্রকৃতি আমাদের যেরূপ স্নেহ-মমতায় পালন করিয়াছেন, আজ এস, আমরা সেই স্নেহের অনুকরণে প্রজাপালন করি। দয়াময় যা করেন মঙ্গলেরই জন্য!"

বস্তুতঃই জাহান্দারসার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল। প্রজারা তাঁহার সুশাসনে ষেকেন্দারের অত্যাচার-কাহিনী ক্রমশঃ ভুলিয়া গেল।

মতি-মিনার

প্রথম পরিচ্ছেদ

"কুমার ঔরঙ্গজেব দীর্ঘজীবী হউন,—সম্রাটের মৃত্যু হইয়াছে।"

"অসম্ভব মিথ্যাকথা! তুমি দূত—কিন্তু সাবধান! মিথ্যা-কথার জন্য শাস্তিভোগ করিতে হইবে।"

"জনাব! আমি মিথ্যা বলিবার জন্য এত শ্রম স্বীকার করিয়া আসি নাই। সুবেদার, নজফালী খাঁর দুৰ্দ্ধৰ্ষ প্রকৃতি জানি। তাঁহার সম্মুখে মিথ্যা বলবার সাহস আমার নাই। কিন্তু রাজদূতকে মিথ্যাবাদী বলিলে, তাহার একটী প্রায়শ্চিত্ত আছে।"

"যুবক, তোমার কথায় আমার বিশ্বাস হইতেছে না। ঔরঙ্গজেব তোমায় কেন পাঠাইয়াছেন?"

"আপনার রাজ্য-মধ্য দিয়া সৈন্য লইয়া যাইতে তিনি ইচ্ছুক।"

"কেন, দিল্লী অবরোধ করিবেন,—এই না? সুলতান দারার কাল খরিতা পাইয়াছি, তাহাতেই বুঝিয়াছি, এ সব ঔরঙ্গজেবের চক্র।"

"সুলতান দারা বিধৰ্ম্মী। তাঁহার কথায় বিশ্বাস নাই। তিনি কোরাণ মানেন না।"

"সাহজাদা ঔরঙ্গজেবও চতুর-চূড়ামণি। কোরাণ মানিয়াও তিনি কুচক্রী।"

যুবকের মুখমণ্ডল ক্রোধে লোহিতবর্ণ ধারণ করিল। যুবক বলিল, "আমি আপনার দুর্গমধ্যে আসিয়াছি বলিয়া, এত অপমান করিতে সাহসী হইতেছেন। আপনি প্রবীণ, পক্বকেশ, জানেন ত সাহাজাদা ঔরঙ্গজেব দুৰ্ব্বল-হস্তে অসি ধারণ করেন না।"

নজফালি খাঁ একবার কি ভাবিলেন। সম্মুখে কুণ্ডলাকৃতি স্বর্ণ-খচিত আলবোলার নল হইতে, একবার সুবাসিত ধূম আকর্ষণ করিলেন। হাঁকিলেন,—"গোলাম! সরবৎ লে-আও!"

সরবৎ আসিল। নজফালী এক নিশ্বাসে তাহা পান করিলেন। তবু তৃষ্ণা। তিনি মহা সমস্যায় বিক্ষিপ্ত। বলিলেন,—"ঔরঙ্গজেব কি চান?" যুবক বলিল,—"কিছুই না—কেবল আপনার সামান্য সহায়তা। তিনি আপনার রাজ্য মধ্য দিয়া কেবল সেনা লইয়া যাইবেন।"

নজফালি মাথা নাড়িয়া, বলিলেন,—"যুবক! তোমার প্রভুকে বলিও, পাঠান নজফালি নিমকহারামী জানে না। সাহাজান বাদসাহের নিশ্চিত মৃত্যু-সংবাদ না পাইলে, সে কাহারও সহায়তা করিবে না। তোমার কথা মিথ্যা হউক! বৃদ্ধ-সম্রাট্ দীর্ঘজীবী হউন! আল্লা, তাঁহাকে কুশলে রাখুন।"

যুবক বলিলেন,—"আমিও তাই বলি! বৃদ্ধ-সম্রাট্ দীর্ঘজীবী হউক। কিন্তু এই পত্র দেখুন। সুলতান দারার পত্র অপেক্ষা, এ পত্রের মূল্য অধিক।"

"পত্র কে লিখিয়াছে?"

"রৌশন-আরা বেগম।"

"বুঝিয়াছি। রৌশন-আরাও এ চক্রান্তের মধ্যে। তিনি জেহান-আরার পতনের চেষ্টা করিতেছেন। রঙ্গমহালে একাধিপত্যের আশায়, কনিষ্ঠ সহোদরের সহায়তা করিতেছেন।"

কিয়ৎক্ষণ দুইজনেই চুপ করিয়া রহিলেন! অম্বুরী তামাকটা আপনিই ভস্মীভূত হইতে লাগিল।

নজফালী শেষ বলিলেন,—"যুবক! আজ আমার দুর্গে থাক, কাল প্রাতে তোমায় উত্তর দিব।"

"ঔরঙ্গজেব বলিয়া দিয়াছেন,—প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা চলিবে

না। এই রাত্রেই সৈন্য-চালনা করিতে হইবে। সাফ্ জবাব এখনই দিতে হইবে।"

নজফালী খাঁ এবার ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল যুবকের ঔদ্ধত্য-পূর্ণ কথায় লোহিতবর্ণ ধারণ করিল! সাহজাদ বাদসাহের অনুগ্রহে, সৌহার্দ্দতায় তিনি বাহারগড়ের নবাব-সুবেদার হইয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না।

নজফালী পরিশেষে ধীরস্বরে বলিলেন,—"যুবক! তোমার প্রভুকে বলিও, নজফালীর দেহে যতক্ষণ পর্য্যন্ত পবিত্র পাঠান-শোণিত এক-বিন্দু থাকিবে, ততক্ষণ অধর্ম্মপক্ষে সে সহায়তা করিবে না।"

"এই আপনার শেষ-উত্তর?"

"হাঁ—"

যুবক, অসির উপর ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন,—"তবে তাহাই হউক! কিন্তু বাহারগড়ের দুর্গের একখানি প্রস্তরও কাল সন্ধ্যার পূর্ব্বে খাড়া থাকিবে না,—নবাব-সুবেদার এ ব্যবস্থায় বোধ হয় রাজি আছেন?"

নজফালীর মুখমণ্ডল পুনরায় লোহিতবর্ণ ধারণ করিল। হইলেই বা রাজদূত! কিন্তু এ ধৃষ্টতা অমার্জ্জনীয়। তিনি ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন,—"সাহাজাদাকে বলিও, তিনি যেন দিবাভাগে এ দুর্গ আক্রমণ করিয়া, আমার শক্তি পরীক্ষা করেন।"

"তাহাই হইবে। কিন্তু আপনার আসন্নবুদ্ধি ঘটিয়াছে।"

"তুমি আমার দুর্গ হইতে বাহির হইয়া যাও। দুষ্ট! তোমার ন্যায় ধৃষ্ট-দূতের মুখ-দর্শনেও পাপ।" যুবক উঠিয়া গেল। কিন্তু নিম্ন-প্রকোষ্ঠের সোপান উত্তীর্ণ না হইতে হইতে, নজফালি হাঁকিলেন,—"বন্দে-আলি!"

এক ভীমকায় সৈনিক আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। নজফালী গম্ভীর-

কণ্ঠে বলিলেন,—"এইমাত্র এক যুবক এখান হইতে চলিয়া যাইতেছে। সে যেন দুর্গের বাহিরে না যায়। দুর্গদ্বার বন্ধ করিয়া, তাহাকে আটক্ কর।"

আদেশ তৎক্ষণাৎ পালিত হইল।

বলা বাহুল্য, পাঁচ সাতজন ভীমকায় সৈনিক জুটিয়া, যুবার অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইয়া, তাহাকে নির্জ্জন-গৃহে বন্দী করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যুবক আর কেহই নহেন। ঔরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার মহম্মদ-সাহ। নজফালী খাঁর দুর্ব্বুদ্ধিতে তিনি আজ নিরস্ত্র-অবস্থায় বন্দী। ক্ষুৎপিপাসায় তাঁহার শরীর ক্লান্ত, দরদরধারে ঘর্ম্ম বাহির হইতেছে,—সন্ধ্যার পূর্ব্বে সংবাদ না দিলে নয়, উপায় কি ?

কুমার দেখিলেন, পলায়নের কোন উপায় আছে কি না? কিছুই নাই। সেই প্রস্তরময় কক্ষে বাতায়ন নাই। নজফালীর লোকে তাঁহাকে সুপাচ্য অন্ন দিয়া গিয়াছে, তিনি তাহা স্পর্শ করেন নাই। তৃষ্ণার যন্ত্রণায় কেবল একপাত্র বারি পান করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে তৃষ্ণা বাড়িয়াছে মাত্র।

ক্রমশঃ রাত্রি অধিক হইতে লাগিল। দুর্গের বাহিরে বন্দীদিগের সাবধান-জন্য পদশব্দ ভিন্ন আর কিছুই শোনা যাইতেছিল না। গৃহমধ্যে দুই একটা আশ্রয়গ্রহণকারী ক্ষুদ্র পক্ষীর পক্ষ-শব্দ মাঝে মাঝে বিরাট্ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল।

পিতা ঔরঙ্গজেব, সৈন্য-সামন্ত লইয়া বাহারগড়ের পাঁচ ক্রোশ দূরে অবস্থান করিতেছেন। তিনি কত আশান্বিতচিত্তে, পুত্রের প্রত্যাগমন-পথ চাহিয়া আছেন। একটু বিলম্বে, একটু অমনোযোগে, রাজ্য জীবন

সিংহাসন সবই অতল-জলে ডুবিবে। সাহজাদা, ক্রোধে দন্তপেষণ করিলেন, তাঁহার হস্ত দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হইল। নজফালীকে সম্মুখে পাইলে তিনি তাঁহার জীবননাশ করিতে তখনই প্রস্তুত।

কুমার ক্লান্ত হইয়া তন্দ্রাভিভূত হইলেন। তন্দ্রায় স্বপ্ন আসিল। দেখিলেন, এক স্বর্গের দূতী আলোকহস্তে তাঁহাকে পথ দেখাইয়া, যেন বাহিরে পৌঁছিয়া দিয়াছেন। তিনি নজফালীর ঘৃণিত কারাকক্ষ হইতে মুক্ত হইয়া, প্রান্তরের মুক্তবায়ুতে হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছেন।

স্বপ্ন কি সত্য হয়! অন্য কোথাও না হউক, সেদিন যেন হইল। কুমার মহম্মদ শুনিলেন, কে যেন তাঁহাকে বলিতেছে,—"যুবক! তোমায় মুক্তি দিতে আসিয়াছি।"

সেই সন্তপ্ত-শরীরে কে যেন পুষ্পস্পর্শ সুকোমল হস্ত বুলাইল। সাহজাদা নিদ্রাভঙ্গে দেখিলেন, ক্ষীণবর্ত্তিকা লইয়া এক পরমাসুন্দরী যুবতী, তাহার অঙ্গস্পর্শ করিয়া বলিতেছেন,—"তোমায় মুক্ত করিয়া দিব, সঙ্গে আইস।"

কুমার সবিস্ময়ে বলিলেন,—"কে তুমি?"

যুবতী হাসিয়া বলিলেন,—"সে কথায় প্রয়োজন নাই। তুমি শীঘ্র উঠিয়া আইস।"

একবারে আত্মীয়তার সম্বোধন! কুমার একটু আশ্চর্য্য হইলেন। বলিলেন,—"তোমার পরিচয় না পাইলে, চোরের মত দুর্গত্যাগ করিব না। বন্দীকে ছাড়িয়া দিতে তোমার কতটা অধিকার, তাহা একবার জানিতে চাই।"

যুবতী এবার একটু হাসিল। সে হাসি যেন, কত মাধুরীময়। যুবরাজ যেন অত সুন্দর-হাসি, রমণীর ওষ্ঠাধরে আর কখনও দেখেন নাই। সুন্দরীর কেশজাল পৃষ্ঠে পড়িয়াছে, গায়ে একখানি ফিরোজা-রঙ্গের মণিখচিত ওড়না, তন্নিম্নে বহুমূল্য পেশোয়াজ। আর মুখে

অতুলনীয় স্বর্গীয় প্রভা। ওষ্ঠাধরে মৃদু হাসি। এক হস্তে প্রজ্জ্বলিত বর্ত্তিকা, আর একখানি পুষ্প-কোমল হস্ত তাঁহার গাত্রে।

যুবতী বলিলেন,—"তোমার পরিচয় আগে দাও।"

এত সরল প্রশ্নের উত্তর না দিয়া কি থাকা যায়!

সাহজাদা বলিলেন,—"আমি ঔরঙ্গজেব-বাদসাহের জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার মহম্মদ!"

যুবতী চমকিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন,—"কুমার! প্রগল্ভা রমণীর ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। পিতার সহিত যখন আপনার কথা হয়, তখন আমি যবনিকার পার্শ্বে থাকিয়া সবই শুনিয়াছি।"

"সুন্দরি! তবে তুমি নজফালী খাঁর কন্যা! এ পঙ্কিল-সলিলে তোমার ন্যায় স্বর্ণপদ্ম ফুটিয়াছে! এ নরকের রাজ্যে, তোমার ন্যায় স্বর্গীয় দূতীর আবির্ভাব হইয়াছে! কিন্তু তুমি আমাকে মুক্ত করিবে কেন?"

যুবতী উত্তর করিল না। মনে মনে বলিল,—"কেন করিব, কি বুঝিবে তুমি! যখন তোমার পরিচয় পাইয়াছি, আজ জীবনের সাধ মিটাইব। একখানি চিত্র আমার বক্ষের নিবিড় আবরণে দিনরাত লুকাইয়া রাখি। সে চিত্র কার,—তুমিই না সেই মনচোর? তুমি আমায় ভুলিয়াছ, কিন্তু আমি ত তোমায় ভুলিতে পারি নাই। কেন তোমায় সেই খোস্‌রাজের দিন আগরায় দেখিয়াছিলাম?"

কোন উত্তর না পাইয়া, সাহজাদা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি ভাবিতেছ সুন্দরী?"

"কিছুই না—আপনি আমার সঙ্গে আসুন।"

যুবরাজ বিনা বাক্যব্যয়ে, তাহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইলেন। দেখিলেন, অতবড় জায়গীরদারের কন্যা, অলঙ্কার-পরিশূন্যা। গাত্রে অলঙ্কারমাত্র নাই,—তবু যেন কত সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে অঙ্গে যেন কত লাবণ্য ঝরিয়া পড়িতেছে।

কুমার দেখিলেন, তাঁহার উদ্ধারকর্ত্রীর অঞ্চলে কি যেন বাঁধা রহিয়াছে। তিনি সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার অঞ্চলে কি সুন্দরী!"

যুবতী উত্তর করিল না। হাসিয়া বলিল,—"ও কিছুই নয়। দিল্লীশ্বরের পৌত্রের অমন কত ছড়াছড়ি যায়।"

দুইজনে দুর্গদ্বারে আসিলেন। আবদ্ধদ্বার মুক্ত হইল। এক প্রহরী সেই মুক্ত দ্বারপথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—"আমার উপায় কি করিয়াছেন?"

যুবতী অঞ্চলবদ্ধ দ্রব্যগুলি মোচন করিয়া, প্রহরীকে দিয়া বলিলেন,—"গোলাম! নজফালীর দাসত্ব ছাড়িলেও, এগুলিতে তোমার আমিরি-চালে চলিবে।"

সাহজাদা দেখিলেন, সকলগুলিই হীরকালঙ্কার। তিনি বুঝিলেন, সেই উদার-হৃদয়া যুবতী, নিজের যথাসর্ব্বস্ব দিয়া, তাঁহাকে মুক্ত করিলেন। তাঁহার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইল। তিনি আবেগপূর্ণ-কণ্ঠে বলিলেন,—"সুন্দরী! তোমার নামটী জানিতে কি সৌভাগ্যবান্ হইব না?"

রমণী বলিল,—"এ দীনার নাম লইয়া দিল্লীশ্বরের পৌত্রের কি উপকার হইবে?"

"জীবনদাত্রীর নাম জানিতে কি আমার ন্যায় হতভাগ্যের কোন আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে না?"

"অধীনাকে জুলিয়া বলিয়া জানিবেন।"

জুলিয়া—কি সুন্দর নাম! শব্দ-সমষ্টিতেও কি এত সৌন্দর্য্য আছে! কত নাম শুনিয়াছেন,—এরূপ ত একটীও সুন্দর নহে; জুলিয়া—জুলিয়া এত রূপ তোমার—এত গুণবতী তুমি! আমি তোমার কে, যে, আমার জন্য এত করিতেছ?"

জুলিয়া বলিল,—"কুমার! আপনাকে আরও একটু অগ্রসর করিয়া

দিই। আপনি সোজাপথে গেলে, এখনই ধরা পড়িতে পারেন। ঘটনাটা বেশীক্ষণ চাপা থাকিবে না। আমার পিতা নজফালীর বুদ্ধিকে অতিক্রম করে, এরূপ লোক অল্পই আছে।”

কুমার বলিলেন,—“জুলিয়া! তুমি আমায় ছাড়িয়া দিয়াছ জানিলে, তোমার পিতা কি বলিবেন?”

“সে কথার এখন প্রয়োজন নাই। বিদায় দিন,—কখনও না কখন দেখা হইবে।”

সহসা পশ্চাতে যেন পদশব্দ শ্রুত হইল। জুলিয়া চমকিত হইয়া উঠিল। মনে ভাবিল, ভ্রম।

কুমার চলিয়া গেলেন। সুন্দরী জুলিয়াও দুর্গমধ্যে শূন্য-হৃদয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। বিরাট্ প্রকৃতির উপর কে যেন, পরিস্কৃত নিখাদ তরলরজতধারা ছড়াইয়া দিয়াছে। আকাশে নক্ষত্রমণ্ডলবেষ্টিত কলঙ্কী চাঁদ, প্রাণ ভরিয়া হাসিতেছে। আজ যেন প্রকৃতির বাসরসজ্জা। সেই শুভ্রজ্যোৎস্নার কোলে, কত শুভ্র বনমল্লিকা ফুটিয়াছে,—সেই জ্যোৎস্না-সাগরে ভাসিয়া, চকোর এদিক ওদিক উড়িয়া বেড়াইতেছে। আর সেই ফুটন্ত জ্যোৎস্নায় হৃদয়ে অন্ধকার লইয়া, সাহজাদা মহম্মদ বাহারগড়ের রাজপথ দিয়া বিষণ্নমনে চলিয়াছেন।

যুবরাজ দেখিলেন,—যেখানে তিনি অশ্বটী বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেখানে সে অশ্ব নাই। ভাবিলেন,—বাহারগড়ের কোন দুষ্টসৈনিক তাহা আত্মসাৎ করিয়াছে। গভীর রাত্রে, শত্রু-নগরীতে তিনি একা। আত্মরক্ষার সহায়, জুলিয়া-প্রদত্ত এক সুশাণিত অস্ত্রমাত্র। তিনি ধীরে ধীরে নগরের সীমা অতিক্রম করিলেন। প্রান্তরে পড়িলেন।

এখান হইতে পাঁচ ক্রোশ অতিবাহিত করিলেই তিনি নিজ শিবিরে পৌঁছিবেন।

তাঁহার হৃদয় শূন্য। তাঁহার পূর্ণতা যেন কে কাড়িয়া লইয়াছে। যে লইয়াছে, সে যেন তাহার বিনিময়ে কিছু দেয় নাই। দৌত্যাভিযান, কর্ত্তব্য, পিতৃকার্য্য, সবই ভাসিয়া গিয়াছে। তাঁহার হৃদয়ে যেন কাহার প্রদীপ্ত-রূপবহ্নি ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে। তিনি ভাবিতেছেন, যেন ইহাকে পাইলেই তাঁহার সব আশা পূর্ণ হয়। রাজ্য, সিংহাসন, কর্ত্তব্য, সব ভস্ম হউক!

সে জুলিয়া! জুলিয়ার সৌন্দর্য্যে রাজকুমারের হৃদয় পরিপূর্ণ। জুলিয়াকে দেখিয়া, তিনি নজফালীর অপমান ভুলিয়াছেন; নিজের কর্ত্তব্য ভুলিয়াছেন। জুলিয়া তাঁহাকে জীবন দিয়াছে,—স্বাধীনতা দিয়াছে,—কিন্তু হৃদয় কাড়িয়া লইয়াছে। ঘটনা প্রকাশ হইলে, জুলিয়াকে কতই না লাঞ্ছিত হইতে হইবে।

সম্মুখে ভীষণ প্রান্তর,—কি করিয়া উত্তীর্ণ হইবেন, রাজপুত্র তাহাই ভাবিতেছেন। স্বেদ-জলে তাঁহার শরীর প্লাবিত, ক্লান্তি তাঁহার দেহে অবসাদ আনিয়া দিয়াছে।

সহসা পশ্চাতে অশ্বপদশব্দ শ্রুত হইল। কে যেন বেগে ঘোড়া ছুটাইয়া আসিতেছে। কুমার বুঝিলেন, নজফালী তাঁহাকে ধরিবার জন্য অশ্বারোহী পাঠাইয়াছেন। তিনি স্থির হইয়া পশ্চাতে দৃষ্টি করিলেন, কিছুই দেখা গেল না।

সহসা সুকণ্ঠ-নিঃসৃত উন্মাদিনী স্বরলহরীতে তাঁহার কর্ণকুহর পরিপূর্ণ হইল। তিনি সবিস্ময়ে শুনিলেন, কে যেন বড়ই মিষ্টস্বরে, সেই রাত্রে গান গাহিতেছে।

এ জ্যোৎস্নার রাজত্বে, এত সুরবাঁধা-গলায়, ঘোড়ায় চড়িয়া কে গান গায়, দেখিবার জন্য কুমারের বড় কৌতূহল হইল। সহসা এক

অশ্বারোহী সম্মুখে আসিল। গান বন্ধ করিল। দূর হইতে বলিল,—"কে যায় ?"

যুবরাজ বলিলেন,—"তুমি কে ?"

"আমি যে হই না কেন ? চোরের মত পলাইতেছ, তুমি কে ?"

যুবরাজ একটু নিকটে আসিলেন। বলিলেন,—"তোমার ত বড় স্পর্দ্ধা দেখিতেছি। আমি কে তাহার পরিচয় এখনই পাইবে।"

মহম্মদ দেখিলেন, যে অশ্বে সেই যুবক অশ্বারোহী চড়িয়াছে, সে অশ্ব তাঁর। তিনি বলিলেন,—"এ অশ্ব আমার! তুমি কোথা পাইলে ?"

অশ্বারোহী উত্তর করিল,—"যেখানে পাই না কেন ? তোমায় ধরিতে আসিয়াছি। সহজে ধরা দাও। অশ্বের সংবাদে তোমার কি প্রয়োজন ?"

"তুমি একা,—না তোমার মত আরও দুই একজন আছে ?"

"আমার হস্ত হইতে আগে পরিত্রাণ পাও। নজফালী খাঁ, তোমায় ধরিতে পাঠাইয়াছেন, তোমায় বন্দী করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছেন। আবার ডাকিতেছেন।"

"কেন,—আতিথ্য-সৎকারের জন্য বুঝি ?"

"যাহা হউক,—তুমি ফিরিয়া চল। না হইলে বন্দী করিব। ঔরঙ্গজেবের পুত্র এত কাপুরুষ ?"

কুমার এবার ক্রুদ্ধ হইয়া অস্ত্র বাহির করিলেন। অশ্বারোহীর বক্ষ লক্ষ্য করিয়া, সেই অস্ত্র চালনা করিলেন। অশ্বারোহী ক্ষিপ্রবেগে অশ্ব হইতে লাফাইয়া পড়িল। ত্বরিত-গতিতে গিয়া, কুমারকে দৃঢ়-আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিল।

সে আলিঙ্গন—কঠোর পুরুষের নহে। সে স্পর্শ—পুষ্পময়। তিনি বলিলেন,—কে তুমি ?"

যুবক-বেশী, মস্তকের উষ্ণীষ ফেলিয়া দিল। বেণী এলাইয়া দিল;

একটু মধুর হাসি হাসিল। বলিল,—"আমায় চিনিতে পারিতেছ না,—ছি! ছি! তোমাকেই আবার বাদসা দৌত্যকার্য্যের জন্য পাঠাইয়াছিলেন?"

যুবরাজ, সে পাপিষ্ঠাকে চিনিলেন। বলিলেন,—"তুমি—তুমি! দলিয়া, তুমি এ বেশে, এরাত্রে এখানে কেন?"

"তোমারই জন্য।"

"আমারই জন্য—কেন এত কষ্ট করিলে?"

"কি বলিব কুমার! কেন করিলাম! তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব। দলিয়া যে তোমা ছাড়া একদণ্ড থাকিতে পারে না। যখন শুনিলাম, তুমি একা বাহারগড়ে আসিয়াছ—তখন তোমার সঙ্গ লইলাম। বুঝিলাম, বিপদ সম্মুখে। আমি ফুলওয়ালী সাজিয়া বাহারগড়ের দুর্গের মধ্যে ঢুকিলাম। তারপর সংবাদ পাইলাম, তুমি বন্দী।"

"বটে,—তারপর!"

"কি করিয়া তোমায় উদ্ধার করিব,—বড়ই ভাবনা হইল। দুর্গের মধ্যে সন্ধ্যা হইলে বিদেশী থাকিতে দেয় না, আমার কৌশল ব্যর্থ হইল। আমায় তাহারা দুর্গ হইতে বাহির করিয়া দিল। আমি বাহিরে আসিয়া ভাবিলাম,—কি করি! দেখিলাম, তোমার অশ্ব বাঁধা রহিয়াছে। অশ্ব লইয়া এক মুসাফেরখানায় তাহা লুকাইয়া রাখিলাম।"

"বুঝিয়াছি,—শেষ কি করিলে?

"দুর্গের দ্বারে যে প্রহরী থাকে,—তাহার সহিত কোন উপায়ে এক প্রকার আত্মীয়তা করিয়া লইলাম। তার পাহারা বদল হইল,—তার পর যে আসিল, সে আমায় সন্দেহ করিয়া তাড়াইয়া দিল। আমি বলিলাম, বিদেশী ফুলওয়ালী, একরাত্রি থাকিতে দাও। সে বলিল, নগরের মধ্যে মুসাফেরখানায় যাও।"

"মুসাফেরখানায় গিয়াছিলে কি? সেখানে কি করিলে?

"কি আর করিব? তোমার জন্য কত কাঁদিলাম। খোদার নিকট কত প্রার্থনা করিলাম। মনে ভাবিলাম, রাত্রি এইখানে কাটাই, প্রাতে উপায় করিব।"

"এরাত্রে আবার সরাই হইতে বাহির হইলে কেন?"

"কেন? তোমায় দেখিব বলিয়া। আমার চ'খে নিদ্রা নাই,—প্রাণে শান্তি নাই! এই সরাইখানা সহরের শেষপ্রান্তে। যত পথিক যায়, সকলকেই দেখি। শেষ তোমায় দেখিলাম। আনন্দে সব ভুলিলাম। তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে ঘোড়ায় চড়িয়া, পাগ্‌ড়ী বাঁধিয়া চলিলাম। বুঝিলাম,—তুমি ক্লান্ত, অশ্বের বড় প্রয়োজন। কিছু খাবারও পূর্ব্বে সংগ্রহ করিয়াছি। যদি প্রয়োজন হয়।"

"গান গাহিতেছিলে কেন?"

"মনে বড় একটা আমোদ হইতেছিল। এই পাপিয়ার ঝঙ্কার, এই মৃদু মলয়, আর এই চাঁদের আলো। তারপর তোমার মুক্তিলাভ, আমার দর্শন। প্রাণের বাঁধ ভাঙ্গিয়া সঙ্গীত আসিতেছিল। রুদ্ধ করিতে পারিতেছিলাম না।"

কুমারের চক্ষে অশ্রু আসিল। দলিয়াকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন করিলেন। সেই জ্যোৎস্নামাখা—আরক্তিম গণ্ডে, ছি! ছি! বলিতেও লজ্জা করে, একটী চুম্বনের রেখাও পড়িল। কুমার আবেগপূর্ণ-স্বরে বলিলেন,—"দলিয়া! কেন আমার জন্য এত কষ্ট করিলে?"

"কেন করিলাম,—কি বুঝিবে তুমি? তুমি বাদসাহ-পুত্র—তোমার কত আছে? কিন্তু আমার কে আছে সখা! যুদ্ধে আমায় বন্দিনী করিয়া আনিয়াছ,—আজ দুই বৎসর তোমার পিছনে পিছনে ফিরিতেছি, আদর করিয়া বুকে ধরিয়াছ। আর আজ বলিতেছ,—কেন আসিলে?" সেই জ্যোৎস্নালোকে কুমার দেখিলেন,—দলিয়ার চোকে জল।

কুমার একটু লজ্জিত হইলেন। এ ক্ষেত্রে প্রশ্নটা ঠিক হয় নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রক্তপতাকা-খচিত বিস্তীর্ণ বস্ত্রাবাসের একটী উজ্জ্বলিত কক্ষে, এক শ্বেতবস্ত্রবিভূষিত, উষ্ণীষধারী, নাতিখর্ব্ব, নাতিদীর্ঘাকার, তেজস্বী পুরুষ, উজ্জ্বল বর্ত্তিকালোকে মনোনিবেশসহকারে কয়েকখানি গোপনীয় পত্র-পাঠ করিতেছেন। তাঁহার সেই সুন্দর শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখমণ্ডল, কখনও বা বিষাদরঞ্জিত, কখনও বা ভ্রূকুটীমণ্ডিত, কখনও বা চিন্তাশূন্য, কখনও বা আশাশূন্য ভাব ধারণ করিতেছে। সম্মুখের ভিত্তিগাত্রে মণিখচিত চর্ম্ম ও অসি। গৃহমধ্যে বিলাসের আর কোন বিশেষ উপকরণ নাই।

রাত্রি তখন তৃতীয়-যামে পড়িয়াছে। আকাশের চাঁদ যেন ক্লান্ত হইয়া, বিশ্রামের জন্য গগনের কোলে ঢলিয়া পড়িতেছে। প্রকৃতির কোলে পাখী নীরব, সমীরণ গতিহীন, নিসর্গসুন্দরী নিস্তব্ধ, আর অত-বড় জনপূর্ণ মোগল-স্কন্ধাবার শব্দমাত্রহীন। এই রাত্রি-জাগরণকারী, নির্জ্জনে চিন্তামগ্ন পুরুষ আর কেহই নহেন,—স্বয়ং ঔরঙ্গজেব।

ঔরঙ্গজেব—আকুল-চিন্তায় উদ্‌ভ্রান্ত। তাঁহার সম্মুখে মহাসমস্যা। একদিকে দিল্লীর সিংহাসন—অন্যদিকে পিতৃস্নেহ, ভ্রাতৃপ্রেম, মায়া-মমতা। তাঁহার হৃদয়ে, মণিখচিত তক্ততাউসের জ্যোতিটা কিছু বেশী আধিপত্য করিয়াছিল। তিনি বিশেষ চিন্তিত, কেননা, কুমার মহম্মদ তখনও ফিরিয়া আসেন নাই।

এক ছায়ামূর্ত্তি আসিয়া তাঁহার কক্ষদ্বারে দাঁড়াইল। ঔরঙ্গজেব বলিলেন,—"কে তুমি?"

"জাঁহাপনা! কুমার ফিরিয়া আসিয়া হুকুমের অপেক্ষা করিতে-ছেন।"

"কুমারকে এইখানে আসিতে বল।"

কুমার মহম্মদ মলিন-মুখে শিবির-কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

ঔরঙ্গজেব ভ্রূকুটীভঙ্গি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহম্মদ! এত বিলম্ব কেন?"

সাহাজাদা সকল কথাই ধীরে ধীরে বলিয়া ফেলিলেন। বলিলেন না কেবল,—জুলিয়ার কথা।

ঔরঙ্গজেবের মুখমণ্ডল,—ক্রোধে লোহিতবর্ণ ধারণ করিল। তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞাসূচকস্বরে বলিলেন,—"বেশ! কাল সূর্য্যাস্তের মধ্যে বাহারগড়ের দুর্গের নাম লোপ হইবে ও সেই সঙ্গে নজফালী খাঁর ছিন্নমস্তক এখানে আসিয়া পৌছিবে। কিন্তু মহম্মদ! সব কথা বলিলে,—কি করিয়া উদ্ধার পাইলে, তাহা ত বলিলে না।"

"নজফালীর কন্যা, আমার পলায়নের সাহায্য করিয়াছে।"

"বেশ কথা! তাহার এই সৎকার্য্যের জন্য তাহাকে একদিন পুরস্কৃত করিব। তুমি এখন বিশ্রাম করিতে পার, বড় ক্লান্ত হইয়াছ।"

সাহাজাদা, কুর্ণীস করিয়া চলিয়া গেলেন।

তাহার পরদিন প্রভাতের বিমল আলোকের সহিত কুমার মহম্মদ জাগরিত হইলেন। প্রতিমুহূর্ত্তেই তিনি আশা করিতেছিলেন,—কখন্ কুচ্ করিবার হুকুম হয়। কিন্তু তাহা হইল না। দিনটাও সেইরূপে কাটিল। মহম্মদ, পিতার প্রকৃতি ভালরূপেই জানিতেন। তিনি স্থির করিলেন,—"হয়ত পিতা দিল্লী হইতে কোন আবশ্যকীয় সংবাদের জন্য কালক্ষয় করিতেছেন,—না হয়, তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাহেন না, কবে দুর্গ আক্রমণ করিবেন। তাঁহার কাহারও উপর বিশ্বাস নাই।"

দিন চলিয়া গেল। সন্ধ্যা আসিল। মোগল-স্কন্ধাবারে প্রত্যেক শিবির-চূড়ায় লাল, নীল, হরিতবর্ণের দীপাবলী জ্বলিয়া উঠিল। আকাশের নক্ষত্রমণ্ডল একদৃষ্টে সে আলোকশোভা দেখিতে লাগিল। সন্ধ্যার হাওয়ায়, নহবতের মধুর স্বর চারিদিকে ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল। সাহাজাদা নিজ কক্ষে বসিয়া, জুলিয়ার সেই অতুলনীয় রূপরাশি কল্পনায়

চক্ষে দেখিতেছিলেন। এমন সময়ে দলিয়া দেখা দিল। হাসিভরা-মুখে বলিল,—"কাল সমস্ত রাত্রিটা কষ্টে গিয়াছে, তাই আজ সন্ধ্যায় আসিলাম। মেজাজ কেমন সাহজাদা,—নিদ্রা বেশ হইয়াছে ত?"

"এক রকমে দিন কাটিয়াছে দলিয়া! তুমি কেমন আছ?"

দলিয়া উত্তর দিল না। সে অঞ্চলমধ্যে লুকাইয়া একছড়া মালা আনিয়াছিল। আদরের সহিত তাহা সাহজাদার গলায় পরাইয়া দিল। বলিল,—সারাদিন বসিয়া এ মালা তোমার জন্য গাঁথিয়াছি।"

কুমার, দলিয়ার এ প্রেমোপঢৌকন পাইয়া একটু হাসিলেন। বলিলেন,—"দলিয়া! তুমি আমায় বড় ভালবাস! না?"

"কি করিয়া এ পাপ-মুখে বলিব।"

"কেন ভালবাস,—আমায় ভাল বাসিয়া তোমার লাভ কি?"

"তাহা ত জানি না। আকাশে চাঁদ ওঠে, লোকে চাঁদকে ভালবাসে। নির্ঝরিণী—শীতল বাতাসে লহর তুলিয়া হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া যায়, লোকে লহরের ক্রীড়া দেখিতে ভালবাসে। মলয় হাওয়ায় শুভ্র ফুলগুলি রূপের গরবে—উহার গায়ে ঢলিয়া পড়ে, লোকে তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। আকাশে মেঘ উঠে,—লোকে তাহার চিত্রিত সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হয়। ভালবাসার আবার কেন কি সাহজাদা!"

"শীঘ্রই ত যুদ্ধ বাধিবে দলিয়া। আমি যদি সেই যুদ্ধে মরি?"

"আমিও মরিব।"

"আমি যুদ্ধক্ষেত্রে মরিব,—শত্রুর অস্ত্রে মরিতে পারি। তুমি কেন মরিবে?"

"তোমায় ভালবাসি বলিয়া মরিব। তুমি গেলে আমার থাকিবে কি? তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে পার, আর আমি পারি না? এই ত তুমি

বাহারগড়-দুর্গে গিয়াছিলে, আমিও কি সেখানে যাই নাই? আমিও হাতিয়ার লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাইব,—তুমি মরিলে আমি মরিব। তুমি আহত হও, আমি সেবা করিব। তুমি যে দলিয়ার সর্ব্বস্ব!"

বাহারগড়ের কথায় কুমারের একটী নূতন চিন্তা জাগিয়া উঠিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন,—"দলিয়া! আমার একটী উপকার করিতে হইবে।"

"কি?"

"আর একবার সেই দুর্গে যাও।"

"কেন—ধরা দিবার জন্য না কি?"

"না—তা নয়। আমার একখানা পত্র একজনকে দিয়া আসিবে।"

"কে সে—নজফালী খাঁ বাহাদুর?"

"না—জুলিয়া।"

"জুলিয়া কে?"

"নজফালীর কন্যা।"

"বুঝিয়াছি,"—জুলিয়ার নামোল্লেখে দলিয়ার হৃদয় চমকিয়া উঠিল। জুলিয়া সুন্দরীশ্রেষ্ঠা, কুমারের জীবনদাত্রী। সে, সব কথা আভাসে বুঝিল। কত কি ভাবিতে লাগিল। কুমার তাহাকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া বলিলেন,—"কি ভাবিতেছ দলিয়া?"

"কিছুই না।—কিন্তু কখন যাইতে হইবে?',

"কাল প্রভাতে। আজ আমার শিবিরের পাশের কক্ষে থাক।"

"বিশেষ প্রয়োজন কি?"

"কিছুই নয়। তিনি আমার জীবন-রক্ষা করিয়াছেন। একটা কৃতজ্ঞতা জানান মাত্র।"

"সওয়ার পাঠাইলেই ত হইত।"

"না,—তাহাতে বিপদ্। শত্রুপুরী, পত্র ধরা পড়িতে পারে।

তাহাতে অনেক অনর্থ। তুমি গেলে,—সরাসর মহলে গিয়া জুলিয়ার হাতে পত্রখানি দিতে পারিবে।”

“তাই করিব। তোমার জন্য সবই করিতে পারি।”

দলিয়ার সেই কাঁচাসোণার মত রূপ, যেন বর্ষার নদীতরঙ্গের মত উছলিয়া পড়িতেছে। সেই সুন্দর মুখে শিবির-কক্ষে সুগন্ধি দীপের আলো পড়িয়া, তাহা অতি সুন্দর দেখাইতেছে। সেই ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত ঘন কেশরাশি ওড়নার উপর দিয়া পৃষ্ঠে দুলিতেছে। সে চঞ্চল কৃষ্ণ-তারকাময় স্থিরকটাক্ষপূর্ণ, কজ্জল-রেখাঙ্কিত চক্ষু দুটী প্রতিমুহূর্ত্তে কত ভালবাসার কাহিনী প্রকাশ করিতেছে। সে চক্ষু যেন বলিতেছে,—তুমি আমার সর্ব্বস্ব, তোমার জন্য না পারি কি?

ধীরপ্রবাহিত মলয়-বাতাস, এইবার অবসর বুঝিল। অতি সন্তর্পণে সেই প্রহরী-বেষ্টিত মোগল-শিবিরের নির্জ্জন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া, সেই চঞ্চল বাতাস, দলিয়ার কুঞ্চিত-কেশরাশি আর মতি-বসান ওড়না লইয়া, খেলা করিতে লাগিল। গৃহমধ্যে সোণার শিকলীবাঁধা একটা ভীমরাজ চোখ বুজিয়া ছিল, সেটাও অবসর বুঝিয়া ডাকিয়া উঠিল। দলিয়া, নাগকেশর, চম্পক ও চামেলি মিশাইয়া সেই মালাছড়াটা গাঁথিয়াছিল। মলয়,—সিদ্ধহস্তে তাহার গন্ধটুকু চুরি করিয়া, গৃহের চারিধারে ছড়াইয়া দিল। কুমার মহম্মদ একবার দলিয়ার সেই সুন্দর, অতি সুন্দর, মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার প্রাণের ভিতর যেন একটা উল্লাস-তরঙ্গ বহিল।

কুমার উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে বলিলেন,—“দলিয়া! তুমি অতি সুন্দর। তোমার চিত্ত অতি সরল। আমার পিতা তোমায় বন্দিনী করিয়া, আমার সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু তুমি শত্রুতা ভুলিয়া আমায় জীবন সমর্পণ করিয়াছ। দলিয়া! তোমার সেই চিরপ্রিয় বিরহ-সঙ্গীতটা একবার গাও না। এ নির্জ্জনে কিছুই যে ভাল লাগে না।”

দলিয়ারও তখন গান গাহিতে ইচ্ছা হইতেছিল। দলিয়া, ভিত্তি-গাত্র হইতে একটা বীণ্ পাড়িয়া, তাহার সহিত সুর মিলাইয়া গাহিল—

ইসকুমেঁ তেরে কোহে গম্ সর্ পর্—
লিয়া যোহো সোহো।
আয়েস্ ও নেশাত্, জিন্দিগি ছোড়াদিয়া
যোহো সোহো—(পিয়ারে !)
যোহো—সোহো ॥

সুন্দরী দলিয়ার সুকণ্ঠ-নিঃসৃত সুরতরঙ্গ, সেই কক্ষের মধ্যে জীবন্ত-মূর্ত্তিতে ঘুরিতে লাগিল। তখন তাহার উপবেশন-ভঙ্গী দেখিয়া বোধ হইল, যেন শ্বেতবস্ত্র-বিভূষিতা, হাস্যমুখী, কলকণ্ঠা, ভৈরবীরাগিণী সশরীরে মূর্ত্তিমতী হইয়া, কুমার মহম্মদের শয্যাপার্শ্বে বীণা লইয়া তান ছাড়িতেছেন। কিয়া মিঠি বাত ! কিয়া মিঠি ভাব ! কিয়া মিঠি সুর ! কিয়া মিঠি দলিয়া ! মহম্মদের কাণের মধ্যে দিয়া সেই মিঠি-সুরতরঙ্গ হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে। সেই হৃদয়ের নিভৃত-কন্দরে সযত্নে রক্ষিত, এক প্রেমময়ী মূর্ত্তির চারিধারে বিজলী খেলাইয়া, সুর যেন অকুলকণ্ঠে কাঁদিয়া বলিতেছে,—

"ইসকুমেঁ তেরে, কোহে গম্ সর্ পর্—লিয়া যোহো সোহো।"

দলিয়া কি ভাবিয়া সহসা সুর থামাইল। কুমার বলিলেন,—"দলিয়া ! থামিলে কেন পিয়ারি ? স্বর্গ হইতে আবার কেন নীচে নামাইলে ?"

দলিয়া উত্তর করিল না। ধীরে ধীরে উঠিয়া যেখানকার বীণ্ সেখানে রাখিয়া দিল। সেই সুরতরঙ্গময়ী জীবিত বীণা, মৃতের ন্যায় স্বস্থানে নিশ্চল হইয়া রহিল। কোথায় বা তার সেই সুর, কোথায় বা তার সে স্বরতরঙ্গ, কোথায় বা তার সেই মূর্চ্ছনা, গমক, গিট্‌কারি-মিশ্রিত সুরময়ী-প্রতিধ্বনি। হাতের গুণে, দলিয়ার কোমলকণ্ঠের

বৈদ্যুতিক-শক্তিতে, সেই অচেতন বীণা বাঁচিয়াছিল। আবার হাতের গুণে মরিল।

সহসা বাহিরে প্রহরীর গভীর কণ্ঠধ্বনি শ্রুত হইল। দ্বিতীয় প্রহরে পাহারা বদল হইতেছে, এজন্য নাকারাখানায় আবার গম্ভীর বাদ্যের ধ্বনি উঠিল। কুমার, দলিয়ার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন,—"পিয়ারি! কাল প্রত্যুষে যাইতে হইবে। এই পত্রখানি রাখিয়া দাও। আর মেহের-বাণি করিয়া এক পেয়ালা মিঠি সরবৎ, এ পিয়াসীর মুখে তুলিয়া দাও।"

স্বর্ণ-ভৃঙ্গার হইতে সুবাসিত অমৃতবিন্দু ঢালিয়া সুন্দরী দলিয়া, স্বর্গের পরীর ন্যায়, সেই পানপাত্র প্রিয়তমের মুখের সুমুখে ধরিল। এক নিশ্বাসে পাত্র শেষ করিয়া সাহজাদা ভাবিলেন, দলিয়ার হস্তস্পর্শে সে অমৃতবিন্দু আরও সুমিষ্ট হইয়াছে; দলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

"কে জানে এই দলিয়া—পিশাচী কি স্বর্গের পরী?"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দলিয়া, প্রাণের মধ্যে একটা অজানিত নিরাশার ছায়া, একটা ধীরে জাগরিত ব্যথা লইয়া, শয্যায় অঙ্গ ঢালিল বটে, কিন্তু ঘুমাইল না। কে যেন তাহার সেই সুন্দর নেত্রপল্লব হইতে ঘুমের অলস কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে। তখন অনেক রাত্রি হইয়াছে। সেই গভীর রাত্রে দলিয়ার হৃদয়ে সয়তানের কলুষিত ছায়া পড়িল। সে ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ করিয়া, দীপ জ্বালিয়া, অতি সন্তর্পণে শয্যানিম্ন হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া পড়িবার চেষ্টা করিল। এ সেই জুলিয়ার নামের পত্র। পত্র খুলিতে গিয়া দলিয়ার হাত কাঁপিতে লাগিল। প্রাণ যেন শিহরিয়া উঠিল। বুকের ভিতর দুরু দুরু করিতে লাগিল। সেই পত্র খুলিলে,—যেন তাহার সর্ব্বনাশ হইবে, অতদিনের আশা চলিয়া যাইবে,

সে যেন মরিবে, সে যেন আজীবন বিষের জালায় জলিবে! কেন এত সন্দেহ! ছি! বিশ্বাসের কি অপলাপ করিতে আছে? করিলে জাহান্নমে যাইতে হয়। পরের নামে পত্র, খুলিবার কি অধিকার তাহার? সে সামান্য দুঃখিনী বন্দিনী মাত্র, রাজারাজড়ার পত্রের রহস্য-ভেদে তাহার অধিকার কি?

যেখানে সু ও কু প্রভৃতির সহিত সংগ্রাম বাধে, সেখানে "কু" প্রবৃত্তিই জয়শ্রী লাভ করে। দলিয়ার-কুপ্রবৃত্তিই প্রবল হইল। দলিয়া পত্রখানি খুলিয়া পড়িল,—তাহাতে লেখা ছিল—"সুন্দরী জুলিয়া! তুমি কত সুন্দর। সেই একবার স্বর্গের দূতীরূপে দেখা দিয়াছিলে, তখনই সেই সুন্দরচিত্রে এ অভাগার প্রাণ পূর্ণ হইয়াছে। হৃদয়ে বর্ষার স্রোত-প্রবাহের ন্যায় তোমার রূপতরঙ্গ খেলিতেছে। কেন তুমি অনিন্দ্য রূপ-রাশি লইয়া জন্মিয়াছিলে? কেন তুমি আমার চোখের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে? কেন তুমি নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া আমায় মুক্তি দিলে? কারাগার হইতে ছাড়িয়া দিয়া, কেন আবার তোমার হৃদয়-কারাগারে শৃঙ্খলিত করিলে? তোমার জন্য আমি রাজ্য, সুখ, ঐশ্বর্য্য, কর্ত্তব্য সবই ছাড়িতে বসিয়াছি। বল জুলিয়া! তুমি আমার হইবে কি না?"

"শীঘ্রই দুর্গ আক্রমণের জন্য আমাকেই সেনাপতিরূপে বাহার-গড়ে যাইতে হইবে। শীঘ্রই শত্রু-বেশে তোমার কাছে যাইতে হইবে। তোমরা যদি এই পত্র পাইয়াই দুর্গ ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাও, তাহা হইলে আপদ-সম্ভাবনা অল্প। নচেৎ পিতা ঔরঙ্গজেবের ক্রোধমুখে নিস্তার নাই।"

"উত্তরে লিখিয়া দিও, আবার কোথা তোমার দেখা পাইব।"

দলিয়া পত্র পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইল। বুঝিল, তাহার সর্ব্বনাশ হইতে আর বাকি নাই। যে পত্রে তাহার আশা, ভরসা, সুখ, সচ্ছন্দ সবই চলিয়া যাইবে, সে দূতীরূপে সেই পত্রই পৌঁছাইয়া দিতে যাই-

তেছে। ইচ্ছা করিয়া কঠিন লৌহ-জিঞ্জির নিজের পায়ে পরাইতেছে। স্বেচ্ছায় তীব্র-হলাহল নিজের মুখে তুলিয়া ধরিতেছে।

সেই সরলা দলিয়া, প্রেমের প্রতিহিংসায় সয়তানী হইল। তাহার হৃদয়ে দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। সে জ্বালা, সে সহিতে পারিল না। শেষ পাপিষ্ঠা এক মতলব আঁটিল।

মনে মনে বলিল,—আমি যে এত ভালবাসি, তাহার প্রতিদান কই কুমার! দুঃখিনী বলিয়া, নিরাশ্রিতা বলিয়া আমায় পায়ে ঠেলিলে? আশা দিয়া মাথায় তুলিয়া, শেষে পদদলিত করিলে? রমণীর হৃদয় তুমি জাননা। রমণী, প্রেমের প্রতিহিংসায় রাক্ষসী হয়। নিশ্চয়ই এ প্রেমপত্র কখনই জুলিয়ার নিকট পৌঁছিবে না। দলিয়া নিজের সর্ব্বনাশের পথ নিজে সৃষ্টি করিবে না। রমণী হইয়া কে কোথায় পারিয়াছে! কে কবে এমন কাজ করিয়াছে?"

সেই গভীর রাত্রে পাপিষ্ঠা দলিয়া, পা টিপিয়া নিঃশব্দে নিজ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া, সাহজাদার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। দেখিল, কুমার সুখ-শয্যায় শুইয়া সুষুপ্তিক্রোড়ে সুখস্বপ্ন দেখিতেছেন। আ! মরি! কি সুন্দর রূপ! সেই ঘুমন্ত ওষ্ঠাধরে মধুর হাসি! শুভ্রশয্যার উপর সেই রূপের তরঙ্গের কি উজ্জ্বল জ্যোতিঃ! দলিয়া যে সংকল্পে গৃহ-প্রবেশ করিয়াছিল, সে মুখ দেখিয়া যেন তাহা শিথিল হইয়া গেল। তাহার চক্ষে জল আসিল। বলিল,—"স্বামিন্! হৃদয়েশ্বর! দলিয়ার সর্ব্বস্ব, এত সুন্দর তুমি! যদি কাহারও হও ত দলিয়ারই হইবে। তুমি যদি কাহাকেও চরণে স্থান দাও, দলিয়াই সেই আশ্রয় পাইবে। এ ক্ষুদ্র হৃদয়খানি ভাঙ্গিয়া দিয়া,—পদদলিত করিয়া, আর কাহারও হইতে পারিবে না। অত দিনের নীরবে পুষ্ট, অত যত্নসঞ্চিত ভালবাসা, দুর্দ্দম রমণী-প্রবৃত্তি, দলিয়া সহজে বিসর্জ্জন দিতে পারিবে না। তাহার সুখের পথে যে কণ্টক হইবে,—তাহারও শ্রেয়ঃ নাই। ইষ্টসিদ্ধি না

হয়, দলিয়া মরিবে; কিন্তু জীবিত থাকিয়া, তোমায় পরের হইতে দিবে না—”

কুমারের সেই নিদ্রিত দেহ স্পর্শ করিয়া, দলিয়া শিহরিয়া উঠিল। অঙ্গুলি হইতে অতি সন্তর্পণে এক অঙ্গুরীয়ক খুলিয়া লইয়া, চোরের ন্যায় নিজ কক্ষে ফিরিয়া আসিল। তার পর সে কি করিল, তাহা এখন শুনিয়া কাজ নাই,—পরে প্রকাশ পাইবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাহারগড়ের দুর্গে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। নজফালী প্রভাতে উঠিয়া যখন জানিতে পারিলেন, তাঁহার বন্দী পলাইয়াছে, তখন তিনি ক্রোধে রক্তমুখ হইলেন। সে ক্রোধের মাত্রাটা, সেই কারাগারের হতভাগ্য প্রহরীর উপর গিয়া পড়িল, কিন্তু তাহাকে কেহ খুঁজিয়া পাইল না। সদরদ্বারে যে প্রহরীটা ছিল,—সেও পলাতক। নজফালী বুঝিলেন, একটা ঘোর চক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। কুমার মহম্মদ অল্পবয়স্ক হইয়াও, তাঁহার উপর এক চাল চালিয়া গিয়াছেন।

প্রভাতের উজ্জ্বলরশ্মি, ক্রমশঃ তীব্রতেজ হইয়া উঠিতেছে। তখন মধ্যাহ্নের বিকাশ। এক ফুলওয়ালী সেই বাহারগড়ের দুর্গদ্বারে দেখা দিল। দ্বারে যে প্রহরী ছিল, সে মহা গরম হইয়া বলিল,—“কোন্ হ্যায়?”

“আমি গরীব ফুলওয়ালী।”

“কি চাও,—এখানে কেহ ফুল কিনিবে না।”

“কিল্লাদারের কন্যা ফুলের কথা বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আমার আয়ি নিত্য ফুল যোগায়। আজ তাহার অসুখ,—সে আমায় পাঠাইল।”

প্রহরী জানিত,—কে একজন বৃদ্ধা, অন্দরমহলে ফুল বেচিয়া যায়;

সুতরাং সে এ কথায় বিশ্বাস করিল। বলিল,—আচ্ছা! তুমি যাইতে পার। কিন্তু যাহা পাইবে, তাহার সিকি আমার।"

"সিকি কেন? তোমায় অর্দ্ধেক দিব। তোমার পাহারা কতক্ষণ?"

"সন্ধ্যা পর্য্যন্ত।"

"বেশ—ভালই হইয়াছে! আমি ত এ রৌদ্রে ফিরিতে পারিব না। খানাপিনা আজ এখানে হইবে। বিবি সাহেব সহজে ছাড়িবেন না।"

ফুলওয়ালী অন্দরমহলে কখনও যায় নাই,—তবু চিনিয়া চিনিয়া গেল। সম্মুখে একটা বৃদ্ধা বাঁদী কাজ করিতেছিল,—ফুলওয়ালী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"হাঁ গা! জুলিয়া-বিবি কোন্ ঘরে থাকেন?"

বুড়ী দেখিল, অতি সুন্দর রূপ। এরূপ অনেক চেহারা অন্দর-মহলে আমদানী হয়। বলিল,—তুমি কি ফুল বেচিতে যাইতেছ?"

"হাঁ—গো আয়ি।"

বুড়ী সে সম্বোধনে গলিয়া গেল। সে আরও একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া, জুলিয়ার কক্ষটা দেখাইয়া দিল।

সেই ফুলওয়ালী মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে, গৃহদ্বারের সন্নিকটে দাঁড়াইল। দেখিল, গৃহমধ্যে এক অলোক-সামান্যা রূপসী, এক সোফার উপর অর্দ্ধ-হেলায়িত, রূপতরঙ্গায়িত, দেহযষ্টি রাখিয়া বিশ্রাম করিতেছেন; তখন বড় গ্রীষ্ম। দুইজন দাঁড়াইয়া পাখা করিতেছে। একজন সরবৎ ছাঁকিতেছে। তবুও যেন গরম যাইতে চায় না। সেই গৃহাধিষ্ঠাত্রী সুন্দরী, একমনে একখানি পুস্তক লইয়া তাহার পাতা উল্টাইতেছেন, কখনও বা মৃদুস্বরে—

মরতাহুঁ তেরে ইস্‌কমে সবুসারু খবর লে—
টুকমেরি দিলজারু কি খবর লে॥
আয়বাদ তুহি যাকে, জারা সাওখ্‌সে কহনা—
মরুতা হ্যায় কোই পসে দিওয়ার খবর লে॥

এই কবিতাটীকে আবৃত্তি করিতেছেন, আর সেই আবৃত্তির শেষমুখে ওষ্ঠাধরে একটু মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিতেছে। এমন সময়ে ফুলওয়ালী অগ্রসর হইয়া বলিল,—"সেলাম পৌছে,—বিবি-সাহেব!"

সুন্দরী জুলিয়া মুখ তুলিয়া দেখিলেন, যে সেলাম দিল, সে অতি সুন্দর ফুলওয়ালী। গরীবের ঘরে এত সুন্দর হয় না। লোকটাও নূতন। কখনও আসে নাই। জুলিয়া সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে তুমি?"

ফুলওয়ালী একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল,—"আমি ফুল বেচিয়া খাই।"

"এখানে—কি প্রয়োজন?"

"ফুল বেচিতে আসিয়াছি।"

"আমার এখন ফুল কিনিবার সময় নয়।"

"না কেনেন—এ গুলি আপনার নাম করিয়া আনিয়াছি, আপনাকেই দিয়া যাইব।"

পাপিষ্ঠা দলিয়া অগ্রসর হইয়া, সেই কক্ষমধ্যে দাঁড়াইল। দেখিল, দেখিবার মত রূপ বটে। এত সুন্দর না হইলে, সাহাজাদা ভাল বাসিবেন কেন? অত মাধুরী, অত সৌন্দর্য্য, অত রূপের তরঙ্গ, অমন সুন্দর চক্ষু, অমন সুন্দর ভ্রূ, অত কালো চুল, তারপর ঐ উজ্জ্বল কান্তিময় তড়িৎজড়িত রূপতরঙ্গের উপর নীল ওড়নার বাহার; যেন নীলমেঘে সৌদামিনীকে চারিদিক হইতে ছাইয়াছে। পাপিষ্ঠা দলিয়া মনে মনে বলিল, পুরুষ হইলাম না কেন,—তাহা হইলে হয়ত এ রূপের মর্ম্ম বুঝিতাম। পায়ে ধরিয়া সাধিতাম, মলিন মুখ দেখিলে সোহাগ করিতাম, বিনা পণে বিক্রীত হইয়া থাকিতাম। হায়! রমণী হইয়া রমণীর রূপের মূল্য কি বুঝিব?

সুন্দরী জুলিয়া কোমলকণ্ঠে বলিলেন,—"ফুলওয়ালি! রাগ করিও না। তোমার ফুল কিনিব। তোমার ব্যবসা কত দিনের?"

দলিয়া সহাস্যে উত্তর করিল,—যতদিন প্রেমের মর্ম্ম বুঝিয়াছি, আপনার হৃদয়কে পরের করিয়া দিয়াছি,—সখ্ করিয়া পায়ে জিঞ্জির পরিয়াছি, নিজের মনকে পরের হাতে দিয়াছি।"

জুলিয়া, ফুলওয়ালীর এই অদ্ভুত উত্তরে একটু হাসিল। অনেক ফুলওয়ালী বাহারগড়ে আসিয়াছে,—কিন্তু এমনটী কেহ নয়। আরও একটু কৌতুক দেখিবার জন্য জুলিয়া বলিলেন,—"তুমি যাহাকে ভাল বাসিয়াছ,—তাহাকে কি পাও না?"

"কেন পাইব না?"

"তবে সে তোমায় ছাড়িয়া দেয় কেন?"

"তা—সেই জানে।"

ফুলওয়ালী—দাঁড়াইয়াছিল, কেহ তাহাকে বসিতে বলে নাই। সে আপনি সেই হর্ম্ম্যতলে বসিল। ফুলের মালাগুলি—জুলিয়ার সম্মুখস্থ এক স্বর্ণপাত্রে রাখিয়া বলিল,—"গোস্তাখি মাফ্ হউক বিবি! আমি আপনাকে এই মালাগুলি পরাইয়া দিব।"

জুলিয়া সম্মত হইলেন। ফুলওয়ালী' জুলিয়াকে সাজাইতে লাগিল। অবসর বুঝিয়া, কাণের কাছে বলিল,—"আমি ফুল বেচিতে আসি নাই। সাহজাদা আমায় পাঠাইয়াছেন।"

সে কথা আর কেহ শুনিল না। শুনিল কেবল জুলিয়া। জুলিয়া বাঁদীদের বিদায় করিয়া দিল। সেই সদাপ্রফুল্ল, হাস্যময় মুখ, যেন একটু মলিন হইল। চাঁদ মেঘান্তরালবর্ত্তী হইলে যেমন মলিন হয়, স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বতীর বুকে মেঘের ছায়া পড়িলে যেমন মলিনতা আসে, চিন্তা আসিলে সুন্দরীর সুন্দর-আস্য যেরূপ মলিন হয়, জুলিয়া সেইরূপই হইলেন। বলিলেন,—"খপর কি ফুলওয়ালি?"

দলিয়া পাপিষ্ঠা। সে পত্র বাহির করিয়া দিল। পত্রে যাহা লেখা ছিল, পাঠ করিয়া জুলিয়া বড়ই বিষণ্ন হইলেন। বলিলেন,—"এখন উপায় ?"

"উপায় আপনার হাতে।"

"কি করিয়া যাই,—দুর্গাধিপতির বন্দোবস্তে, সহজে প্রবেশ বা বহির্গমনপথ বন্ধ। যাইতে হইলেও ছদ্মবেশে যাইতে হইবে। তাও অতি সাবধানে।"

"তার উপায় আমি করিব। আমার এই পেশোয়াজ, আঙ্গরাখা, ওড়্না—যদি ঘৃণাবোধ না করেন, আপনি পরিতে পারেন।"

"তারপর তোমার উপায় ?"

"সে আমি নিজে ভাবিব। এমন কেহ এ দুর্গে নাই,—যে দলিয়াকে আবদ্ধ রাখিতে পারে।"

"যদি ধরা পড় ?"

"মরিব।"

"আমার জন্য তুমি মরিবে কেন ?"

"আমার কেহ নাই। আশা নাই, ভরসা নাই, জীবনে সুখ নাই, এ জীবনের মূল্যও নাই। আপনার উপকারের জন্য মরিতে পারিলে ত ভাগ্য ?" এত মিথ্যা বলিতে দলিয়ার মুখে আট্‌কাইল না।

জুলিয়া বলিলেন,—"তুমি এখন খানাপিনা কর। সন্ধ্যা হউক,—যাহা হয় করা যাইবে।"

ফুলওয়ালি তাহাতেই স্বীকৃত হইল।

প্রতিদিন যেমন জলস্রোতের মত, শকটনেমির আবর্ত্তনের মত সময় চলিয়া যায়, সে দিনও তাই হইল। সন্ধ্যার আকাশে—অন্ধকার আসিল, তারা ফুটিয়া উঠিল। গগনের কোলে—নীড়ান্বেষী পাখীগুলি, পথ ভুলিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল। পাপিয়া কাতরকণ্ঠে ডাকিতে

লাগিল। সেই অস্তগামী, সূর্য্যকরাঙ্কিত, রাঙ্গা মেঘগুলি ক্রমশঃ কাল হইয়া গেল। বাহারগড়ের দুর্গকক্ষগুলি উজ্জ্বল দীপালোকে উজ্জ্বলিত হইল।

জুলিয়া দলিয়াকে ডাকিয়া বলিলেন,—"ফুলওয়ালি! সব ঠিক করিয়াছি। বেশ-পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নাই। আমি আস্‌রফি দিয়া প্রহরীর মুখ বন্ধ করিয়াছি। তাহাকে বলিয়াছি,—নিকটে যে সিদ্ধপীরের আস্তানা আছে, সেখানে কাল শুভদিনে মঙ্গলার্থে সিন্নি দিতে যাইব। আজ আর যাইব না,—তুমি ফিরিয়া যাও।"

দলিয়া বলিল,—"বেশ ভালই হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার আসিবার সময় দ্বিপ্রহর। কাল একটু রাত্রে বাহির হইলে ভাল হয়। নদী-তীরের ঘাটে আমি অপেক্ষা করিব?" জুলিয়া বলিলেন,—"তাহাই হইবে। তুমি কাল আসিও।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শিবিরমধ্যে, ঔরঙ্গজেব একাকী বসিয়া যেন কাহার অপেক্ষা করিতেছেন। দিল্লীর এক গোপনীয় পত্রে, বাহারগড়ের দুর্গাক্রমণের আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে। এমন সময়ে প্রহরী আসিয়া বলিল,—"বক্তিয়ার খাঁ আসিয়াছেন।"

ঔরঙ্গজেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন,—"গোলাম! তাঁহাকে আসিতে বল্।"

এক দৃঢ়কায়, পরুষমূর্ত্তি সৈনিক, সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া কুর্ণীস্ করিল। বলিল,—"সম্রাট্! আপনি দীর্ঘজীবী হউন।"

"সম্রাট্" সম্বোধনে—ঔরঙ্গজেবের ওষ্ঠাধরে একটু হাসি আসিল। বলিলেন,—"আপনি যে আগে হইতেই ভবিষ্যৎবাণী করিতেছেন? আপনার সদিচ্ছাকে ধন্যবাদ দিই।"

বক্তিয়ার বলিলেন,—দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি, দিল্লীর সিংহাসন আপনার। সুলতান দারা বিধর্ম্মী,—লোকে তাঁহাকে চায় না। সাহসুজাও বিলাসী,—রাজদণ্ড-পরিচালনার শক্তি তাঁর নাই। তিনি সুন্দরীদের বিলোল-কটাক্ষে মরিয়া যান,—তক্ততাউসে বসিবার উপযুক্ত তিনি নহেন। এখন আমায় স্মরণ করিয়াছেন কেন?"

ঔরঙ্গজেব কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া উত্তর করিলেন,—"বক্তিয়ার সাহেব! আপনার পত্রোল্লিখিত প্রস্তাব উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়াছি। কাল দিল্লীর পত্রে যাহা জানিয়াছি, তাহাতে কালক্ষয় করা অসম্ভব। এখন বাহারগড় ধ্বংস করিবার জন্য সৈন্যনাশ অযৌক্তিক মনে করি। আপনি দুর্গের চাবি খুলিয়া দিবেন। আমার সৈন্যেরা বিনা রক্তপাতে, দুর্গ দখল করিবে। দুর্গ জয় হইলে,—আপনি নূতন দুর্গাধিপতি হইবেন।"

বক্তিয়ার খাঁ নতমুখে বলিলেন,—"আমিও প্রস্তুত, কিন্তু আর একটী কথা—"

"বুঝিয়াছি, সুন্দরী জুলিয়া! নজফালীর কন্যা! ঔরঙ্গজেব, দুর্গ চান, দুর্গাধিপতিকে চান্,—তাঁহার কন্যাকে চাহেন না। আপনি সে সুন্দরীকে লইবেন।"

"তারপর আর একটী প্রস্তাব—"

"বুঝিয়াছি,—আপনার এ সহায়তার জন্য অর্থ পুরস্কার। নজফালীর ভাণ্ডারে যাহা আছে,—তাহার অর্দ্ধেক আপনাকে দিব। এ সময়ে আমারও অর্থের বড় প্রয়োজন। ফৌজ বাড়াইতে হইতেছে,—নচেৎ সবই আপনাকে দিতাম। কিন্তু জীবিত নজফালী, বা তাহার ছিন্ন-মস্তকে আমার বিশেষ প্রয়োজন। সেই পাপিষ্ঠের জন্যই আমার এত বিলম্ব হইতেছে। অপমানও বিশেষ হইয়াছে।"

বক্তিয়ার খাঁ বলিলেন,—"আজ বেশ সুযোগ আছে। দুর্গের মধ্যে শতাধিক সেনা থাকে। বাকি থাকে ছাউনিতে। আপনি যদি আজ

শেষরাত্রে, সসৈন্যে বাহারগড়ের সন্নিহিত হইতে পারেন, ত ভালই হয়। ছাউনির সেনারা আপনার কার্য্যে বাধা দিবে না। যদি দেয়, দুর্গের মধ্যবর্ত্তী সেনাসমূহ। কিন্তু তাহাদের তরবারি, বর্শা প্রভৃতি, সেলে-খানায় আজ প্রাতে, পরিষ্কার করিবার জন্য দেওয়া হইয়াছে। সকলেই অস্ত্র-বিহীন। অতি সহজেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে।"

ঔরঙ্গজেবের মুখমণ্ডল প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—বক্তিয়ার সাহেব! এখনই আপনাকে নবাব-উপাধিতে সম্মানিত করিতেছি। আপনার বন্দোবস্ত অতি উত্তম। ঔরঙ্গজেব উপকার ভুলেন না। তবে—মানুষ সয়তান। খাঁ সাহেব! আর কাহারও এ বিশ্বাস না হউক, ঔরঙ্গজেব অন্ততঃ বিশ্বাস করেন। আজ আপনি স্বার্থের প্রলোভনে আমার সহায়তা করিতেছেন; কিন্তু মনের গতি ফিরিতে কতক্ষণ?"

"আজ না হয়, দুই দিন পরে, যিনি এই বিশাল হিন্দুস্থানের একচ্ছত্রা সম্রাট্ হইবেন, তাঁহার সহিত মনোভঙ্গ ঘটিলে, নজফালীর এ ক্ষুদ্র সেনাপতি কয়দিন টিকিবে? জনাব! আমি দুর্গ চাই না, ঐশ্বর্য্য চাই না, নবাব-উপাধি চাই না,—সুবাদারি চাই না। যাহার জন্য আজ আমি প্রভুর এ সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছি, তাহাকেই চাই!"

জনাব! আপনার লক্ষ্য দিল্লীর সিংহাসন, আমার লক্ষ্য জুলিয়া! আমি সৌন্দর্য্যের জন্য উন্মাদ নহি। এ ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। জাঁহাপনা! আমি জুলিয়ার দর্প চূর্ণ করিতে চাই। নজফালীর দর্প চূর্ণ করিতে চাই। সামান্য অবস্থা হইতে এই বাহারগড়ের সেনাপতি হইয়াছি। সকলেই আমায় দেখিলে কাঁপিয়া উঠে, কিন্তু জুলিয়া ঘৃণা করে। নজফালী মুখে না হইলেও মনে মনে অবজ্ঞা করেন। রাজ্য, দুর্গ ও অর্থ, আমার উদ্দেশ্য নয়,—জাঁহাপনা! সেই সিংহিনীকে বশ করিতে চাই, নিজের বাঁদী করিতে চাই।"

ঔরঙ্গজেব মনে মনে একটু হাসিলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন,—"তাহাই হইবে খাঁ-সাহেব। ঔরঙ্গজেব যদিও দুর্গ চান, কিন্তু নরকালীর ছিন্নমুণ্ড তাঁহার প্রথম বাঞ্ছনীয়।"

বক্তিয়ার বলিল,—"তবে আজ রাত্রি-শেষে, আপনি শতাধিক সেনা লইয়া গেলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে। আমার সেনাদের আমি কৌশলে দূরে রাখিব। অতর্কিত আক্রমণে, একটা গোলমাল বিশৃঙ্খলা ঘটিবে, সেই গোলমালে আমার সেনারা আপনার সেনার সহায়তা করিবে। কেহ বুঝিবে না, কিসে কি হইল।"

ঔরঙ্গজেব আবার গম্ভীরমুখে বলিলেন,—"বেশ সংকল্প! কিন্তু—"

বক্তিয়ার শুষ্কমুখে বলিল,—"কিন্তু কি জাঁহাপনা?"

"যদি তোমার কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতা দেখিতে পাই।"

"বলুন,—কোরাণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি। আপনার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া কোথায় পলাইয়া বাঁচিব?"

ঔরঙ্গজেব অঙ্গুলিস্থিত হীরকাঙ্গুরীয়ের দিকে দৃষ্টি সংযত করিয়া বলিলেন,—"সত্য,—কিন্তু যে একবার পারিয়াছে,—সে যে আবার পারিবে না, তাহার প্রমাণ কি?"

"জনাব! স্বার্থসিদ্ধির জন্য কে না জগতে কি কাজ করে? জুলিয়া আমায় উন্মাদ করিয়াছে। বেয়াদবি মাফ্ করিবেন,—জুলিয়ার জন্য আমি নরকের প্রজা হইতে পারি,—জুলিয়াকে পাইব বলিয়াই এতদূর অগ্রসর হইয়াছি।"

ঔরঙ্গজেব মনে মনে ভাবিলেন,—আমার সতর্ক চক্ষুর সম্মুখে বক্তিয়ার কিছুই করিতে পারিবে না। যদি করে, আমার সেনারা তাহার ছিন্নমস্তক সর্ব্বাগ্রে আমায় উপহার দিবে।"

বক্তিয়ার কুর্ণীষ করিয়া বিদায় লইলেন। তাহার এই ভীষণ পাপ-কার্য্যের সাক্ষী রহিলেন,—কেবল এই বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডের সেই অনন্ত

শক্তিমান্ অধীশ্বর। আর রহিল—আকাশের অসংখ্য উজ্জ্বল তারকা ও আর একজন। সে লুকাইয়া সকল কথাই শুনিয়াছিল। সে আর কেউ নয়,—সেই পাপিষ্ঠা দলিয়া। কিন্তু আমরা বিশ্বস্তচিত্তে বলিতে পারি, দলিয়া অনিচ্ছার সহিত, এই ভীষণ মন্ত্রণায় গুপ্ত-শ্রোতারূপে উপস্থিত হইয়াছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বাহিরে অশ্ব বাঁধা ছিল। বক্তিয়ার চিন্তাপূর্ণ-মুখে, সেই অশ্বে আসিয়া আরোহণ করিল। সে যাহা করিয়া আসিল, তার আর ফিরাইবার উপায় নাই। মনে ভাবিল,—"বিশ্বাসঘাতকতা মহাপাপ! কিন্তু কে না করে? স্বার্থের জন্য কে না বিশ্বাসকে বলি দেয়? লোকে দেখিলেই পাপ। এই ত ঔরঙ্গজেব, গোপনে দিল্লীর সিংহাসনের জন্য ছুটিয়াছেন। সম্রাটের নিষেধসত্বেও রাজধানীর দিকে সৈন্যচালনা করিতেছেন। দিল্লীর সম্রাটের বেলা যাহা পাপ নয়,—দরিদ্র বক্তিয়ারের বেলা তাহা কেন পাপ হইবে? যখন নজফালী মরিবে, বাহারগড় আমার সুবাদারীতে আসিবে, জুলিয়া যখন আমার পার্শ্বে বসিয়া আমার বাঁদীগিরি করিবে, আমার অনুগ্রহে বিকাইবে,—তখন অর্থবলে, অসিবলে, যে উপায়ে হউক, লোকের মুখ বন্ধ করিব।"

বক্তিয়ার আবার ভাবিল,—রাজ্য—সিংহাসন, চিরকাল একজনের থাকে না। নজফালী, এ দুনিয়ায় একেবারে সুবাদার হইয়া জন্মায় নাই। যে উপায়ে সে এই বাহারগড় অধিকার করিয়াছিল, তাহা শুনিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। ইহজন্মেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। সে পাপ করিয়াছে, দয়াময় খোদা, আমায় তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্তের উপলক্ষ করিয়া পাঠাইয়াছেন। আর এক কথা, আমি যদিও তার সহায়তা করি, বিশ্বাসঘাতক না হই, তাহা হইলেও তাহার পরিত্রাণ

কই ? দিল্লীর বাদসার অগণ্য ফৌজের সহিত সে কতক্ষণ যুঝিবে ? মধ্য হইতে, আমিও মরিব, সেও মরিবে।"

"জুলিয়া ! জুলিয়া ! তুমি দর্পিতা, কিন্তু তুমি অতি সুন্দর। তুমি আমায় ঘৃণা কর,—কিন্তু আমি তোমায় ভালবাসি। তুমি ফিরিয়া চাও না, কিন্তু আমি হৃদয়ে তোমার মূর্ত্তি আঁকিয়া, নির্জ্জনে দিবারাত্র দেখিতেছি। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তোমায় ভালবাসিয়া, তোমার ঘৃণাকে প্রেমে পরিণত করিব। তোমার জন্য আজ বিশ্বাসঘাতক হইয়াছি, তোমার জন্য সেনাপতি হইয়া কেহ যাহা করে নাই,—তাহা করিয়াছি। আর ফিরিবার উপায় নাই।"

সম্মুখে দুইটী পথ। একটী বাহারগড়ে গিয়াছে,—আর একটী দিল্লীর দিকে। বক্তিয়ারের অশ্ব, সহসা সেইখানে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। অনতিদূরে সেই অন্ধকারে শ্বেতবর্ণের একটা কি পদার্থ দেখিয়া, অশ্বটা ভয় পাইয়াছিল। সেই পথ-সন্ধির মধ্যে এক সুবৃহৎ পিপুলবৃক্ষ। তাহার নিম্নে দাঁড়াইয়া এক শ্বেতবস্ত্রমণ্ডিত ছায়ামূর্ত্তি। শিক্ষিত অশ্ব, এই মূর্ত্তি দেখিয়াই সন্দেহে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবস্থা বুঝিয়া, ত্বরিত-গতিতে বক্তিয়ার অশ্ব হইতে নামিলেন। সে ছায়া-মূর্ত্তি যেন একটু সরিয়া গেল। সে অন্ধকারে আর তাহা দেখা গেল না। একি—প্রেতমূর্ত্তি না কি ? অন্য কেহ হইলে ভয় পাইত, কিন্তু বক্তিয়ারের হৃদয় অত্যন্ত সাহসপূর্ণ। দৃঢ়মুষ্টিতে বর্শা হস্তে লইয়া, বক্তিয়ার গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"যেখানে আছ, যেই হও না কেন,—স্থির হইয়া দাঁড়াও। নড়িলেই মৃত্যু। এই সুতীক্ষ্ণ বর্শার আঘাতে প্রাণ যাইবার সম্ভাবনা।"

সে মূর্ত্তি আর নড়িল না। স্থির হইয়া দাঁড়াইল। সেই বিরাট্ অন্ধকাররাশি মথিত করিয়া, সেই গভীরা যামিনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, একটা গভীর হাস্যধ্বনি উঠিল। বক্তিয়ার অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"কে তুমি ?"

"মুসাফের।"

"মুসাফের! এত রাত্রে এখানে একা দাঁড়াইয়া কেন?"

"বাহারগড়ের ভবিষ্যৎ-কিল্লাদার, বক্তিয়ার খাঁ সাহেবকে দেখিব বলিয়া।"

"ভবিষ্যৎ-কিল্লাদার!" বক্তিয়ার চমকিয়া উঠিলেন। কে-এ? ভিতরের কথা এ জানিল কি করিয়া? বক্তিয়ার বলিলেন,—"তোমার কণ্ঠস্বরে, আকৃতি-প্রকৃতিতে বোধ হইতেছে, তুমি স্ত্রীলোক। যুবতী বলিয়াই অনুমান করিতেছি। তুমি এত রাত্রে এখানে একাকিনী কেন?"

"জনাব! আমি বাহারগড় হইতে ফিরিতেছিলাম। অশ্বের পদশব্দ পাইয়া, এই বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইয়াছি।"

"বাহারগড়ে গিয়াছিলে কেন? কেমন করিয়া জানিলে যে, আমি বক্তিয়ার সাহ?"

"আপনারা কত রসদ, কত সেনা রাখিয়াছেন, তাহা দেখিবার জন্য বাহারগড়ে গিয়াছিলাম। আপনি বক্তিয়ার সাহ, তাহাও আমি জানি। এ রাত্রে ঔরঙ্গজেবের সহিত মন্ত্রণা করিতে আপনি যে মোগল শিবিরে—"

বক্তিয়ার ক্ষিপ্রগতিতে, সেই তীক্ষ্ণ বর্ষা, রমণীর বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া বলিলেন,—"সয়তানি! তোমায় বধ করিব। দেখিতেছি, আমাদের গুপ্তকথা সকলই তুমি জান। তুমি কে, তাহা জানি না,—তবু তোমায় বধ করিব। তুমি মরিলে, জগতে আর কেহই এ কথা শুনিতে পাইবে না।"

রমণী সেই অন্ধকারে আবার হাসিয়া উঠিল। মৃত্যু সম্মুখে, তবু হাসি। বক্তিয়ার বর্ষা উঠাইয়া লইলেন। বলিলেন,—"তোমার রহস্য কি, বুঝিলাম না। মৃত্যু সম্মুখে—তবু ভয় নাই? অদ্ভুত স্ত্রীলোক তুমি!"

"আমায় বধ করিবেন কেন? বক্তিয়ার সাহেব, আমি আপনার

কি করিয়াছি? একদিনে এত পাপ নাই করিলেন! প্রভুর সর্ব্বনাশ! রমণী-হত্যা! সবই কি একদিনে করিতে হয়!"

বক্তিয়ার এ কথায় বড় আকুল হইয়া উঠিলেন। এ সব কি কথা! কে এ অদ্ভুত রমণী! এমন গোলমালে তিনি আর কখনও পড়েন নাই।

তিনি চঞ্চলভাবে প্রশ্ন করিলেন—"যুবতি! তোমার নাম কি?"

"এ বাঁদীর নাম দলিয়া।"

"দলিয়া,—বেশ সুন্দর নাম, কখনও শুনি নাই। তুমি এ রাত্রে কোথায় যাইবে?"

"মোগল-শিবিরে।"

বক্তিয়ার কি ভাবিলেন। বলিলেন,—"না—সে পথ রুদ্ধ। আমার সঙ্গে চল।"

"কেন"?—

বক্তিয়ার এই 'কেন'র উত্তর দিলেন না। মুহূর্ত্তমধ্যে ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রবৎ, সেই কোমলাঙ্গী দলিয়াকে অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া, বাহারগড়ের পথ ধরিলেন। দলিয়া ইহাতে কোন আপত্তি করিল না। সে দুষ্টা—বাহারগড়ে ফিরিতে চাহিতেছিল।

দীপকরোজ্জ্বলিত, সুচিত্রিত সজ্জিত কক্ষে, বক্তিয়ার উপবিষ্ট। সম্মুখে দাঁড়াইয়া সেই নির্ভীক-হৃদয়া সুন্দরী দলিয়া। বক্তিয়ার বলিলেন,—"দলিয়া! তুমি অতি সুন্দর। হায়! যদি কাল তোমায় দেখিতাম,—হয়ত জুলিয়াকে ভুলিতে পারিতাম। নরকের এত নিম্নে নামিতে হইত না।"

দলিয়া উত্তর দিল না। তাহার রক্তোৎফুল্ল ওষ্ঠাধরে, একটু মলিন হাস্য-রেখাই ইহার উত্তর দিল। সে দুষ্টা নির্ভীক-হৃদয়ে বলিল,—"বক্তিয়ার সাহেব! ও কথা এখন ছাড়িয়া দিন। আমার ন্যায় একটা বাঁদী আপনার আকাঙ্ক্ষার যোগ্য নহে। সাধ্য কি আপনার—আমায়

এত সহজে আপনি এখানে লইয়া আসেন। বাধা দিলে কখনই পারিতেন না। কিন্তু আপনার কাছে আমার বিশেষ প্রয়োজন। তাই স্বেচ্ছায় আসিয়াছি।"

বক্তিয়ার বড়ই বিস্মিত হইলেন। দেখিলেন, উজ্জ্বল দীপরশ্মি পড়িয়া, সেই সুন্দরী দলিয়া আরও সুন্দর হইয়াছে। তিনি মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া পড়িলেন। বলিলেন,—"দলিয়া! আমার দ্বারা তোমার কি স্বার্থসিদ্ধি হইবে?"

দলিয়া বলিল,—"সেনাপতি! সকল কথা খুলিয়া না বলিলে বুঝিতে পারিবেন না। আমি বড় অভাগিনী। এক সময়ে আমার পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য ছিল। আমার পিতার জীবন নাশ করিয়া, ঔরঙ্গজেব তাঁহার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছেন। আমায় বন্দিনী করিয়াছেন। যে-জুলিয়াকে আপনি ভালবাসেন, সেই জুলিয়ার পিতা নজফালী অপেক্ষাও আমাদের অবস্থা উন্নত ছিল।"

"আমি বন্দিনী হইয়াও সকল কষ্ট ভুলিলাম। একজনের মুখ দেখিয়া,—আমার প্রাণের জ্বালা গেল। সে কে? কুমার মহম্মদ! ঔরঙ্গজেবের পুত্র। ঔরঙ্গজেব আমাকে তাহার সেবার জন্য নিযুক্ত করিয়া দিলেন। আমি সাহজাদার রূপ-বহ্নিতে উন্মাদ পতঙ্গীর ন্যায় ঝাঁপ দিলাম।"

"আমি মনে ভাবিয়াছিলাম,—সাহজাদা আমায় যেরূপ অনুগ্রহ করেন, একদিন আমি দিল্লীর রঙ্গমহালে তাঁহার হৃদয়েশ্বরী হইয়া বিরাজ করিব। এই উচ্চ আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া, আমি এতদিন কাটাইয়াছি। কিন্তু জুলিয়া, আমার সে সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।"

"সাহজাদাকে, নজফালী বন্দী করেন, এ সংবাদ জানেন। তাঁহার সুন্দরী কন্যা জুলিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করে। জুলিয়ার রূপ দেখিয়া, সাহজাদা আমায় ভুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। যে উপায়ে হউক,

জুলিয়াকে তাঁহার চক্ষের অন্তরাল করিতে হইবে। আপনি জুলিয়ার জন্য উন্মাদ। আপনি তাহাকে পরের হইতে দিবেন না,—আপনার সহায়তা তাই আমার প্রার্থনীয়।"

"সেনাপতি! আজীবন আপনি তরবারি-হস্তেই জীবন কাটাইয়াছেন। রমণীর প্রেমের গভীরতা বুঝিবেন কিরূপে? যাহাকে ভালবাসিয়াছি, যাহার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছি, যাহার সুন্দর রূপ—হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে দিবারাত্র লুকাইয়া দেখিতেছি, যাহার চরণে সর্ব্বস্ব বিকাইয়াছি, তাহাকে প্রাণ থাকিতে পরের হইতে দিব না।"

"আপনি জুলিয়াকে চান্। আমি চাই—কুমার মহম্মদকে। এ ক্ষেত্রে দুই জনের স্বার্থ একধর্ম্মী। মহম্মদকে জুলিয়ার চক্ষুর উপর হইতে সরাইতে না পারিলে,—সে আপনার হইবে না। আর জুলিয়া আপনার না হইলে, আমি সাহজাদাকে পাইব না। এখন আমার মনের কথা বুঝিয়াছেন ত?"

বক্তিয়ার এবার সব বুঝিলেন। তিনি সোৎসুক-হৃদয়ে, সরলভাবে বলিলেন,—"দলিয়া! আমি তোমার সহায়তা করিব। কিন্তু একটা কথা,—আমি যে তোমাদের শিবিরে গিয়াছিলাম, জানিলে কিরূপে?"

"আমি অনিচ্ছায়, আপনাদের কথা শুনিয়াছি। তখন আমি কুমারকে লইয়া জুলিয়ার নিকট আসিবার জন্য তাঁহার কক্ষে যাইতেছিলাম। জুলিয়ার নাম শুনিয়া, সেখানে একটু দাঁড়াইলাম। সকল কথা শুনিলাম। আপনার শিবিরত্যাগের পূর্ব্বেই কুমারকে লইয়া বাহিরে আসিলাম।"

"বুঝিয়াছি,—এখন কুমার কোথায়?"

"নদী-তীরে—ভগ্ন মস্‌জেদে; জুলিয়ার নিকটে।"

"তুমি এখন কি করিতে চাও?"

"এরূপ বন্দোবস্ত করুন, যেন জুলিয়া দুর্গে প্রবেশ করিতে না পারে। কুমার মহম্মদ এখনও আপনার সীমা-মধ্যে, তাঁহাকে বন্দী

করুন। আমার এই কাতর-অনুরোধ রক্ষা করুন। ইহাতে উভয়েরই লাভ।"

"তাহাই স্বীকার করিলাম। কিন্তু তোমার কথার উপর বিশ্বাস কি? তুমি ভবিষ্যতে এ সকল গুপ্ত-কথা প্রকাশ করিবে না, তাহার প্রমাণ কি? স্ত্রীলোক—বড়ই অবিশ্বাসী।"

"আমার কথার উপর বিশ্বাস করুন। নীচ-বংশে দলিয়ার জন্ম নহে। আজ প্রাণের জ্বালায় আপনাকে ধরা দিয়াছি। এখন স্বার্থই আমার লক্ষ্য। আপনার অনিষ্টে আমার লাভ কি? আপনি আমার সহায়তা করিতেছেন,—আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।"

"দলিয়া! তুমি এখানে অপেক্ষা কর। আমি ফিরিয়া না আসিলে, তুমি যাইতে পারিবে না। যতক্ষণ না ফিরি, তুমি ততক্ষণ আমার বন্দিনী।"

"তাহাই স্বীকার করিলাম।"

বক্তিয়ার খাঁ এক প্রহরীকে ডাকিলেন। তাহাকে বলিলেন,—"এই বিবিকে বেগমের মত সম্মান করিবে, কিন্তু আমি না আসা পর্য্যন্ত ইহাকে ছাড়িও না। তোমার জান্ যাইবে।"

বক্তিয়ার সেই গভীর নিশীথে, অশ্ব ছুটাইয়া আবার রাজপথের উপর দিয়া চলিলেন। জুলিয়ার দর্শনাকাঙ্ক্ষাই তখন তাঁহার হৃদয়ে প্রবল। কিন্তু তাঁহাকে অধিক পরিশ্রম করিতে হইল না।

নবম পরিচ্ছেদ

"জুলিয়া—জুলিয়া! প্রিয়তমে! প্রাণাধিকে!"

"কেন হৃদয়েশ্বর!—কেন প্রিয়তম!"

"আবার কবে তোমার দেখা পাইব? পিতার সঙ্গে তোমাদের শত্রুতা বাধিয়াছে, অতি শীঘ্রই দুর্গ জয় হইবে। ঔরঙ্গজেবের সহিত

তোমার পিতা পারিয়া উঠিবেন না। যদি তিনি আমাদের হস্তে বন্দী হন?"

"কুমার! সে আশঙ্কা ত্যাগ করুন। আপনার পত্র পাইয়া তাঁহাকে প্রকারান্তরে সাবধান করিয়া দিয়াছি। তিনি আজ রাত্রি-শেষে দুর্গ ত্যাগ করিবেন।"

"কিন্তু জুলিয়া,—তাহা হইলেও ত তুমি আমার হইবে না। যদি তোমার পিতা বাহারগড় ছাড়িয়া দেন, দুর্গ আমাদের দখলে আসিবে। তুমি তাঁহার সঙ্গে থাকিবে। আমি তোমাদের শত্রু! আমার সঙ্গে তোমার দেখা হওয়া বড়ই অসম্ভব। কেন জুলিয়া আমায় মজাইলে?"

জুলিয়া কথাটা বুঝিল। চিরবিরহের মলিনছায়া তাহার নেত্রপথে ফুটিয়া উঠিল। জুলিয়া আশাপূর্ণ-স্বরে বলিল,—"কুমার! যদি দয়াময়ের অভিপ্রেত হয়, মিলন আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে না।"

রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ। মহম্মদ, শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। প্রিয়তমার সাহচর্য্যও তাঁহার পক্ষে তখন কষ্টকর হইল। কুমার রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন,—"জুলিয়া! প্রিয়তমে! আজ বিদায় দাও, যদি বাঁচিয়া থাকি, আবার দেখা হইবে। অনেকক্ষণ গোপনে শিবির ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি।"

জুলিয়াও গোপনে দুর্গ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। তাহার হৃদয়ও ক্রমশঃ শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছিল। সেই প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য ব্যাকুল হইল।

সেই নির্জ্জন-নিশীথে, তরঙ্গায়িত ক্ষুদ্র নদীতীরে, অসংখ্য উজ্জ্বল তারকাকে সাক্ষী রাখিয়া, প্রকৃতিকে সাক্ষী রাখিয়া, অশ্রু-বিনিময় করিয়া, প্রেমিক-দম্পতি ভগ্ন-হৃদয়ে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। কে জানে আবার তাহারা কবে মিলিবে?

জুলিয়া সেই গভীর রাত্রে, সাহসে বুক বাঁধিয়া, বাহারগড়ের দিকে

অগ্রসর হইল। কখনও সে গৃহের বাহির হয় নাই। আজ প্রেমাকাঙ্ক্ষা, মিলনের আশা, হৃদয়ের দুর্দ্দম-প্রবৃত্তি, তাহাকে এতদূরে আনিয়া ফেলিয়াছে। যতক্ষণ সে প্রিয়তমের নিকটে ছিল, ততক্ষণ চিন্তা তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। এখন আবার সেই চিন্তা আসিয়া জুটিল।

সম্মুখে গগনস্পর্শী উন্নত দুর্গদ্বার। জুলিয়া ভাবিল,—তাহার কষ্ট শেষ হইয়াছে। আশার আনন্দে হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু দুর্গদ্বারের সমীপবর্ত্তী হইয়া দেখিল,—তাহা ভিতর হইতে বন্ধ।

জুলিয়া মহা প্রমাদ গণিল। তাহার শরীর ঘর্ম্মে প্লাবিত। সেই সুন্দর মুখে, ক্লান্তি চিহ্ন লইয়া, অতি ক্ষীণস্বরে জুলিয়া ডাকিল,—"কে আছ! দ্বার খুলিয়া দাও।"

সেই অন্ধকারে—একজন যেন কোথা হইতে উত্তরের প্রতিধ্বনি করিল। বলিল,—দ্বার খুলিবার আদেশ নাই। এ রাত্রে এ দুর্গে তোমার কি প্রয়োজন?"

জুলিয়া এই উত্তরে শিহরিয়া উঠিল। সম্মুখে লোকমাত্র নাই, উত্তর করে কে? জুলিয়া সবিস্ময়ে দেখিল,—কে একজন দীর্ঘাকার লোক অন্ধকারে শরীর ঢাকিয়া, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। জুলিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। সে মূর্ত্তি নিকটে আসিয়া বলিল,—"কে তুমি? দুর্গদ্বারে এ রাত্রে তোমার কি প্রয়োজন?"

"আমি দুর্গাধিপতির কন্যা,—দুর্গে প্রবেশ করিব। দ্বারবন্ধ করিল কে?"

সেই অন্ধকার-বেষ্টিত দীর্ঘকায় পুরুষ, কঠোর বিদ্রূপের সহিত বলিল,—নজফালী খাঁর কন্যা, এ রাত্রে দুর্গের বাহিরে গিয়াছিলেন কেন?"

জুলিয়া রুষ্টচিত্তে বলিলেন,—"তাঁহার কারণ আপনার জানিবার প্রয়োজন নাই। বলা না বলা দুর্গাধিপের কন্যার ইচ্ছা। তাহার পিতার দুর্গতোরণ তাহার জন্য চিরকালই উন্মুক্ত।"

"সত্য, কিন্তু সে সব দিন গিয়াছে,—সুন্দরি! নজফালীর আদেশে, আজ সকলের পক্ষেই দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে। আমি যে সেনাপতি,—আমারও প্রবেশাধিকার নাই।"

জুলিয়া এবার সেই অন্ধকার-বেষ্টিত পুরুষকে চিনিল। ঘৃণার সহিত বলিল,—"বক্তিয়ার খাঁ—তুমি! তুমি ইচ্ছা করিয়া আজ আমার এই সর্ব্বনাশ করিলে ?"

"কে বলিল,—জুলিয়া! আমি করিয়াছি। তোমার পিতার আদেশ। আমি তাঁহার আজ্ঞাবাহী ভৃত্য। কিন্তু তুমি এ রাত্রে একাকিনী কোথা গিয়াছিলে ?"

"যেখানেই যাই না বক্তিয়ার! তোমার তাহা শুনিবার অধিকার কি ?"

"অধিকার আছে,—না হইলে বলিতাম না। তুমি না বলিলেও আমি সবই জানি। এ রাত্রে পাঠান-সর্দ্দার, নজফালীর কন্যা, অভিসারিকাবেশে, দুর্গের বাহির হইয়া গিয়াছেন,—একথা লোকে শুনিলে বলিবে কি ?"

জুলিয়ার মুখমণ্ডল সেই অন্ধকারে ভীষণ ক্রুদ্ধভাব ধারণ করিল। জুলিয়া কঠোরস্বরে বলিল,—"বক্তিয়ার! সাবধানে কথা কহিও। যাহা বলিয়াছ, তাহার পুনরুক্তি শুনিলে, আমি তোমার মুখে পদাঘাত করিব।"

বক্তিয়ার সহাস্যে বলিল,—"তোমার ন্যায় সুন্দরীর পদাঘাত সহ্য করিতে সেনাপতি বক্তিয়ার খাঁ সর্ব্বদাই প্রস্তুত। তোমার অতি সুন্দর সুকোমল আরক্তিম-গণ্ডে, এই নির্জ্জন-নিশীথে, একটী চুম্বন-রেখা অঙ্কিত করিতেও বোধ হয় সে সঙ্কুচিত নহে।"

জুলিয়া এ অবমাননায় ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল। সে তখন শক্তি-হীনা, আশ্রয়হীনা। বলিল,—কাপুরুষ! তুমি না এই অগণ্য সৈন্যের সেনাপতি! তোমার অই ঘৃণিত-দেহ না আমারই পিতার অন্নে পুষ্ট!

তুমি তোমার প্রভুকন্যাকে এরূপে অপমান করিতে সাহসী হইতেছ! কাল প্রাতে নজফালী একথা শুনিলে, তোমার ছিন্নমস্তক ধুলায় লুটাইবে।"

বক্তিয়ার, হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। এ হাসি উপেক্ষার—প্রতিশোধের। তাহার হৃদয়ে ঘৃণার দাবানল জ্বলিয়াছে। নীচ-প্রতিহিংসায় তাহার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিয়াছে। সে বলিল,—"জুলিয়া! কাল নজফালীর ছিন্নমস্তক আমিই আগে দেখিতে পাইব। তুমিও কাল প্রভাতে দেখিবে, বক্তিয়ার খাঁ বাহারগড়ের স্থবেদার হইয়াছেন; আর জুলিয়া তাঁহার অঙ্কলক্ষ্মী হইয়াছেন,—তাঁহার কৃপার ভিখারিণী হইয়াছেন।"

জুলিয়া এ কথায় বড়ই বিস্ময়ান্বিত হইল। দুশ্চিন্তে তাহার মন আকুল হইয়া উঠিল। বলিল—"এসব কি কথা বক্তিয়ার!"

বক্তিয়ার বলিল,—"যাহা ঘটিবে, তাহাই বলিতেছি। জান তুমি জুলিয়া,—অগণ্য সৈন্য আমার অধীনে। তোমার পিতা নামে মাত্র স্থবাদার। আমি আমার সমস্ত সৈন্য, ঔরঙ্গজেবের সহায়তায় নিযুক্ত করিয়াছি। আজ রজনীশেষে, প্রভাতের আলোকের সঙ্গে সঙ্গে দেখিবে,—নজফালী, মোগল-সেনার হস্তে বন্দী। দুর্গ আমার দখলে।"

"বিশ্বাস-ঘাতক! নরাধম! প্রভুদ্রোহি! নরকেও তোমার স্থান হইবে না।"

"নরক কোথায় সুন্দরি! বৃথা ভয় দেখাইও না। যেখানে জুলিয়া, সেখানে স্বর্গ। তুমি, আরাধনায় আমার হও নাই। আজ বলপ্রয়োগে তোমায় আপনার করিব। আমি চরণে ধরিয়া সাধিয়াছিলাম, ফিরিয়া দেখ নাই,—এখন আমার চরণে ধরিয়া সাধিতে হইবে।"

ছি! ছি! পিশাচ!—এ প্রভুদ্রোহিতা—এ বিশ্বাসঘাতকতা কেন করিলে? কেন ইচ্ছা করিয়া জাহান্নমে নামিলে?

"তোমারই জন্য জুলিয়া।"

"আমারই জন্য!—"

"হাঁ—তোমারই জন্য। তুমি যদি সহজে আমার হইতে, তাহা হইলে আজ এ কলঙ্কিত-কার্য্যে আমায় হস্তক্ষেপ করিতে হইত না। নজফালী যদি তোমায় আমার প্রার্থনামতে, আমার সহিত মিলিত করিয়া দিতেন, আজ দেখিতে,—বক্তিয়ার, এইখানে দাঁড়াইয়া, তোমার মুখ চাহিয়া, অগণ্য সৈন্য লইয়া, হৃদয়ের শোণিত দিয়া, প্রভুকার্য্য সাধন করিত। ঔরঙ্গজেবের ছিন্নমস্তক প্রভুকে উপহার দিত। তোমার রূপে, আমার হৃদয় ভরিয়া রহিয়াছে। এখন বুঝিয়াছি, তোমায় না পাইলে আমার মৃত্যু শ্রেয়ঃ।"

"বক্তিয়ার, তুমি না সেনাপতি? তুমি না বীর? এত নীচতা তোমার হৃদয়ে! কাপুরুষ! এখনও প্রতিনিবৃত্ত হও। এ সংকল্প ত্যাগ কর। আমায় দুর্গে প্রবেশ করিতে দাও। সৈন্য লইয়া আমার পিতার সহায়তা কর। যাহা করিয়াছ,—তাহা আমি কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করিব না। কেবল জানিলে তুমি,—আর ঐ বিমানান্তরালে যে মহা শক্তিমান্ আছেন—তিনি। তোমার সৎকার্য্যের জন্য, আমি হয়ত তোমায় ভ্রাতৃবৎ স্নেহ করিতে পারি।"

এ তিরস্কারে, এ অনুযোগের কথায়, সে পাপিষ্ঠ ভুলিল না। সে তখনও অনেকদূর অগ্রসর। দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সহিত বক্তিয়ার বলিল,—"জুলিয়া, সহস্র অনুরোধ—তোমার অই সুন্দর চোখের ধারাবাহী কাতর-অশ্রু, তোমার ন্যায় শ্রেষ্ঠা সুন্দরীর করুণ কাতরোক্তি,—কিছুতেই বক্তিয়ারের মনের সংকল্প ফিরাইতে পারিবে না।"

জুলিয়া সেইখানে ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল। নতজানু হইয়া অশ্রু-পূর্ণ-নেত্রে একবার ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল,—সেই সুবিস্তৃত নীলাকাশে, চিরদিনই যেমন অসংখ্য তারকা জ্বলিয়া থাকে, মেঘের

উপর দিয়া মেঘ ছুটিয়া থাকে, স্তরের উপর স্তর বাঁধিয়া অন্ধকার বিরাজ করে—সেদিনও তাই। সেই পৃথিবী,—সেই স্নেহময় প্রকৃতি, সেই সমুন্নত দুর্গ,—সেই তাহার ক্রীড়াকানন বাহারগড়, সবই সেইরূপ আছে,—কেবল তাহারই সর্ব্বনাশ হইয়াছে। যে দুর্গদ্বারে প্রবেশসময়ে, কত অশ্বারোহী, পদাতি তাহার সঙ্গে গিয়াছে, যেখানে সে পিতার সঙ্গে প্রবেশ করিলে, সৈনিকেরা অস্ত্র অবনত করিয়া সম্মান করিয়াছে,—আজ সেই দুর্গদ্বার তাহার পক্ষে রুদ্ধ। আজ সে অনাথিনীর ন্যায় প্রবেশের জন্য এক পাপিষ্ঠের করুণা ভিক্ষা করিতেছে।

জুলিয়া অশ্রুপূর্ণচক্ষে উপরের সেই অনন্তবিস্তৃত নীলাকাশের দিকে চাহিয়া বলিল,—"দয়াময়! অনন্ত শক্তিমান্ খোদা! আজ তুমি আমার এই করিলে প্রভু!"

সেই সুন্দর গণ্ডে—ধীরে প্রবাহিত, অতি সুন্দর, করুণাসিক্ত, অশ্রুবিন্দু দেখিয়াও পাষাণহৃদয় বক্তিয়ারের হৃদয় গলিল না। সে হৃদয়ে প্রেম নাই—সে কঠোর-প্রাণে মমতা নাই—সে পাষাণবক্ষে ভালবাসা নাই। তাহাতে ছিল কেবল—নীচতাময় ঈর্ষ, রূপতৃষ্ণা, আর পাশবপ্রবৃত্তি। তাহাই তখন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। পাপিষ্ঠ বক্তিয়ার,—বলিতে লজ্জা করে—জুলিয়ার এ কাতরতায় হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করিল।

বক্তিয়ার যাহা বলিল,—তাহার প্রত্যেক কথাই যে সম্পূর্ণ সত্য, তাহা জুলিয়া বুঝিয়াছিল। সেই রাত্রে দুর্গে প্রবেশ করিতে না পাইলে, তাহার পিতার যে সমূহ বিপদ্,—তাহারও যে জগতে দাঁড়াইবার স্থান থাকিবে না, তাহাও সে বুঝিয়াছিল। সে বক্তিয়ারের মুখের দিকে চাহিয়া নিরাশ-হৃদয়ে বলিল, "বক্তিয়ার! আমি তোমার কি করিয়াছি যে, দাঁড়াইবার স্থান রাখিলে না?"

বক্তিয়ারের হৃদয়ে তখনও করুণার ছায়া নাই। সে স্বচ্ছন্দে

বলিল,—"কেন জুলিয়া? তোমার দাঁড়াইবার স্থান নাই কেন? এ হৃদয়ে তুমি ভিন্ন যে আর কেহই নাই।"

জুলিয়ার মুখমণ্ডল ঘৃণায় আরক্তিম-ভাব ধারণ করিল। অভাগিনী ধীরে ধীরে সেইখানে বসিয়া পড়িল; দারুণ চিন্তায়, অবসাদে, ক্লান্তিতে, তাহার শরীর অতি দুর্ব্বল। নিরাশার উত্তেজনায়, দেহ শক্তিহীন। তাহার মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইল।

বক্তিয়ার বলিল,—"জুলিয়া! সম্মুখেই আমার বিস্তৃত প্রাসাদ তুমি আমার শূন্যগৃহে চল। তোমার অই সুন্দর চরণরেণুতে, আমার গৃহে—বৈজয়ন্তীশোভা ফুটিয়া উঠিবে। আমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে। সংকল্প, আমার ইচ্ছারই অধীন।' তোমায় পাইলে আমি এখনও পূর্ব্বসংকল্প পরিবর্ত্তন করিতে পারি।"

দর্পিতা জুলিয়া অভিমানে ফুলিতে লাগিল। ক্রোধে তাহার বাক্য স্ফূর্ত্তি হইতেছিল না। বলিল,—"জীবন থাকিতে তোমার ন্যায় পাপিষ্ঠের পুরীতে পদার্পণ করিব না। দুর্গে প্রবেশ করিতে না পাই, পিতার স্নেহময় ক্রোড়ে আশ্রয় না পাই, কুমারকে না পাই, তবু তোমার দ্বারস্থ হইব না। নজফালীর কন্যা কখন নীচ হইতে পারে না। পথে পথে ভিক্ষা করিয়া খাইব, তবু তোমার পুরীতে প্রবেশ করিব না। মরিবারও ত স্বাধীনতা আছে।"

বক্তিয়ার কঠোর রহস্যের সহিত বলিল,—"পথে পথে ভ্রমণের স্বাধীনতা তোমার গিয়াছে যে জুলিয়া! সময় আর নাই। বৃথা বাক্য ব্যয়ে বহুমূল্য সময় নষ্ট হইতেছে। তুমি আমার গৃহে এস।"

"কখনই নহে। এ জীবন থাকিতে ত নয়। পাপিষ্ঠ! তুমি দূর হও।'

সে পাপিষ্ঠ দূর হইল না। ক্লান্তিবশে জুলিয়া সেই খানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। জুলিয়ার সেই সৌন্দর্য্য-রাশিপূর্ণ নিশ্চলদেহ বুকে লইয়া, কাপুরুষ বক্তিয়ার নিজ গৃহে পৌছিল।

ইহার পর বক্তিয়ার সেই রাত্রে, কয়েকজন সেনানী পাঠাইয়া, কুমার মহম্মদকেও পথিমধ্যে আয়ত্তাধীন করিল। এখন সাহজাদা ও জুলিয়া উভয়েই বক্তিয়ার খাঁর বন্দী।

দশম পরিচ্ছেদ

যাহার তত্ত্বাবধানে সেনাপতি বক্তিয়ারসাহ, দলিয়াকে বন্দিনীরূপে রাখিয়া দিয়াছিলেন, তাহার নাম ইরফান্ আলি। ইরফান্ আলি সবিস্ময়ে দেখিল,—সেনাপতি যে বিবিকে বন্দিনী করিয়া তাহাকে পাহারায় রাখিয়া গেলেন, তাহার মত অত সুন্দরী রমণী সে চক্ষে দেখে নাই।

চতুরা দলিয়াও দেখিল,—সেই প্রহরী তাহার দিকে কেবল সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছে। সে তৎক্ষণাৎ তাহার মনের ভাব বুঝিল। বক্তিয়ার যে সদুদ্দেশ্যে তাহাকে বন্দিনী করে নাই, তাহাও সে বুঝিল। আর বুঝিল, পলায়নই এ ক্ষেত্রে শ্রেয়ঃ—এবং পলায়নের সহায় যদি কেহ হয়, তবে এই নির্ব্বোধ প্রহরী। ইহা বুঝিয়া সে সেই-রাত্রে দুর্গ-প্রত্যাবর্ত্তনের সংকল্প করিল।

সেই সুরমারঞ্জিত চঞ্চল চোখে, একটী ক্ষুদ্রকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া, মুখের কাপড়টা ভাল করিয়া খুলিয়া দিয়া, সে প্রহরীকে হস্তসঙ্কেতে ডাকিল। সে নিকটে আসিলে বলিল,—প্রহরী-সাহেব! তোমার নাম কি?

"এ গোলামের নাম ইরফান্ আলি।"

"ইরফান্ আলি! অতি সুন্দর নাম! স্ত্রীলোকের হৃদয় বড়ই চঞ্চল ইরফান্ সাহেব। আমি একজনকে ভাল বাসিতাম। কিন্তু তার নামটা অতি কদর্য্য। তুমি কতদিন এখানে আছ ইরফান্ আলি?"

ইরফান্ আলির ঠিক সেই সময়ে স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছিল। দেশ

হইতে সংবাদ আসিয়াছে, কিন্তু এই যুদ্ধ-সম্ভাবনায় সে ছুটি পায় নাই। সে সোৎসুকভাবে বলিল,—এখানে প্রায় এক বৎসর আছি।"

"কত বেতন পাও?"

"অতি সামান্য—দশ দিনার।"

আবার কটাক্ষ!! দলিয়া—সেই পাপিষ্ঠা দলিয়া, অম্লান-বদনে বলিল,—"ইরফান্! অত সুন্দর তোমার চেহারা! খোদা তোমায় বাদসা করিয়া সৃজন করেন নাই কেন? হায় রে অদৃষ্ট!"

ইরফান্ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"তাঁহার মর্জ্জি। আমি অতি ক্ষুদ্র, কেমন করিয়া বুঝিব—বিবি!"

"ইরফান্! সত্য বল, তুমি কাহাকেও জীবনে ভাল বাসিয়াছ কি?"

ইরফানের—সেই মৃত-স্ত্রীর ফাঁদওয়ালা গোল মুখখানা, একবার মনে পড়িল। সে মুখ—আর এই সুন্দর মুখ! সে শুষ্কমুখে বলিল,—"না"।

"যদি কেহ তোমায় ভালবাসে,—ইরফান্ সাহেব!"

"তাহাকে প্রাণ-সমর্পণ করি।"

"বিশ্বাস করিবে কি? আমি তোমায় প্রথম-দর্শনেই ভাল বাসিয়াছি। আমি রঙ্গমহালে থাকি, বাদসার বেতন ভোগ করি। আমার অনেক আস্‌রফি জমিয়াছে। তুমি চাকরি ছাড়িয়া এখনই আমার সঙ্গে চল। তোমায় সোণার টাকা দিব, সোণার ভালবাসা দিব, তোমার হইয়া থাকিব।"

ইরফান্ আলির ক্ষুদ্র মাথাটা এবার ঘুরিয়া গেল। এই বিহ্বল অবস্থায়, আবার আর একটী বিদ্যুদাম-পূর্ণ কটাক্ষ! হীনবুদ্ধি ইরফান্ বলিল,—"আপনার কথায় বিশ্বাস কি? আপনি সাহজাদাদের উপযুক্ত। এ দরিদ্রকে যে ভালবাসেন, ইহা ত বিশ্বাসের কথা নয়।"

সেইদিন মিলনের দূতীগিরির পুরস্কারস্বরূপ, জুলিয়া তাহাকে

কয়েকটী আসরফি দিয়াছিল। তাহা নিকটেই ছিল। দলিয়া তাহা ইরফান্ আলির হাতে দিয়া বলিল,—"এই থলি খুলিয়া দেখ,—ইহাতে কি আছে। এগুলি তোমার।"

ইরফান্ দেখিল,—অনেকগুলি চক্‌চকে স্বর্ণমুদ্রা, সেই থলিয়ার দেহ পূর্ণ করিয়াছে। তাহার বিশ্বাস হইল। আহ্লাদিতচিত্তে, একগাল হাসি লইয়া বলিল,—আমায় কি করিতে হইবে বিবি?"

দলিয়া গম্ভীরমুখে বলিল,—

"আমার সঙ্গে চল,—আর তোমায় ফিরিতে হইবে না। সাহজাদা মহম্মদ সাহ, আমায় বিশেষ অনুগ্রহ করেন। তাঁহার অধীনে, তোমায় হাভিল্‌দারী দিব। দুইজনে সুখে কাটাইব।"

ইরফান্ বলিল,—"আজ সেনাপতি কড়া হুকুম দিয়াছেন, কোন স্ত্রীলোক দুর্গের বাহিরে যাইবে না। আপনাকে এ বেশ পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। পুরুষের পোষাক পরিতে হইবে, স্বীকৃত আছেন কি?"

"পুরুষের বেশ কোথায় পাইব?"

প্রহরী ইরফান্ আলি, নিজের ডেরায় গিয়া একপ্রস্থ সৈনিক-পরিচ্ছদ আনিয়া দিল। দলিয়া তাহা পরিয়া সৈনিকবেশে, সেই পুরীর বাহিরে আসিল। কোন সৈনিকেরই দুর্গত্যাগের বাধা ছিল না। ইরফান্ আলি তাহার অগ্রে আসিয়া, সঙ্কেতস্থানে অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু দলিয়া সে পথে না গিয়া, মোগল-শিবিরের পথ ধরিল। দুর্ব্বুদ্ধি ইরফান্, সহজেই প্রতারিত হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

রাত্রি শেষযাম। তখনও আকাশে তারা জ্বলিতেছে, মেঘ ছুটিতেছে, চাঁদ ডুবিতেছে। মলিন চাঁদের ম্লান-কিরণে, মেঘগুলা স্নান করিয়া, তখনও একটু প্রফুল্ল হইয়া হাসিতেছে। আর প্রকৃতি সহাস্য-

মুখে, স্থিরভাবে, সেই মলিন চাঁদের আলোয়, কালো মেঘের খেলা দেখিতেছে।

দলিয়া, বাহারগড়ের দুর্গ-তোরণ হইতে অৰ্দ্ধ-ক্রোশ না আসিতে আসিতে দেখিল,—এক যোদ্ধৃবেশী সৈনিক-পুরুষ, এক নবস্থাপিত স্কন্ধাবারের প্রবেশপথে দাঁড়াইয়া। সেই মূর্ত্তি দেখিয়া, দলিয়া শিহরিয়া-উঠিল।

সৈনিক-পুরুষও কটিদেশ হইতে তরবারি খুলিয়া, সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। পরুষকণ্ঠে বলিলেন,—"পাঠান-সৈনিক বলিয়া বোধ হইতেছে, কে তুমি ?"

দলিয়া উত্তর করিবে কি ? সে মূর্ত্তি সে চিনিতে পারিয়াছিল। ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। কিন্তু তখনও তাহার বুকে অত্যন্ত সাহস। সে মিথ্যাকথা বলিতে আরম্ভ করিল।

"বলিল,—আমি পাঠান ! বক্তিয়ার সাহেব আমায় পাঠাইয়াছেন। কোন বিশেষ সংবাদের জন্য।"

সেই বীরপুরুষ ভ্রূকুটী-ভঙ্গী করিলেন। অন্ধকার বলিয়া কেহ তাহা দেখিল না। তিনি বলিলেন,—"বক্তিয়ার ! বক্তিয়ার কে ?"

"নঙ্গফালীর সেনাপতি।"

"কাহার নিকটে তোমায় পাঠাইয়াছেন ?

"ঔরঙ্গজেব বাদসার কাছে।"

তাঁহার সেই সন্দিগ্ধমুখে একটু হাসি আসিল। তিনি স্বর পরিবর্ত্তন করিয়া বলিলেন,—"পাঠান ! তোমার সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের দেখা হইবে না। তিনি এখন বড় ব্যস্ত। আমায় সব কথা বলিতে পার। আমি তাহার বিশ্বস্ত পার্শ্বচর।"

পাপিষ্ঠা দলিয়া সবই বুঝিতেছিল। সে মূর্ত্তি, সে অনেকক্ষণ চিনিয়াছিল। দেখিল,—মিথ্যা-কথায় কেবল গোলযোগই বাধিতেছে।

তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া, সেই বীরপুরুষ দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—

"তোমার যাহা বক্তব্য আমাকেই বল।"

"বক্তিয়ার, আপনাদের সৈন্য লইয়া যাইতে এখনই বলিয়াছেন।"

"তুমি কে? তোমার কথায় বিশ্বাস কি? বক্তিয়ারের নিদর্শন কই?"

ছদ্মবেশী দলিয়া, এবার মহাসঙ্কটে পড়িল। ছাই নিদর্শন! সে চুপ করিয়া কি ভাবিল।

যোদ্ধ্বেশী তৎক্ষণাৎ সবলে তাহার গ্রীবাদেশ ধারণ করিয়া বলিলেন,—"পাপিষ্ঠ! কে তুই?—"

"আমায় ছাড়িয়া দিন্—আমি স্ত্রীলোক।"

"স্ত্রীলোক! এই রাত্রে—সিপাহীর পরিচ্ছদে!" সেই বীরপুরুষ ঘৃণার সহিত তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন।

দলিয়া কিছুই বলিল না, চুপ করিয়া রহিল। সেই বীরপুরুষ এক ক্ষুদ্র বংশীধ্বনি করিলেন। চারিদিক হইতে পাঁচ সাত জন ভীমকায় সৈনিক, বর্ষা তরবারি হস্তে দলিয়াকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

সেই অন্ধকার-বেষ্টিত মূর্ত্তি, গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"এই স্ত্রীলোককে বন্দিনী করিয়া লইয়া যাও। দুইজন প্রহরিণীর জিম্মা করিয়া দাও! ইহার বস্ত্রমধ্যে যদি কোন পত্রাদি লুক্কায়িত থাকে, তাহা আমায় আনিয়া দাও।"

পাপিষ্ঠা দলিয়া তখন দেখিল,—সম্মুখে মৃত্যু। স্বয়ং ঔরঙ্গজেব দাঁড়াইয়া এই হুকুম দিতেছেন। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"জাঁহাপনা! পীড়নের আবশ্যক নাই। আমি আপনারই বাঁদী দলিয়া। অন্ধকারে আমায় চিনিতে পারিতেছেন না।"

মুহূর্ত্তমধ্যে দলিয়া সৈনিক-পরিচ্ছদ খুলিয়া ফেলিল। ঔরঙ্গজেব সে

মূর্ত্তি চিনিলেন। বলিলেন,—"দলিয়া! এরাত্রে তুমি বাহারগড়ে গিয়াছিলে কেন?"

দলিয়া উত্তর করিল না। সে উত্তরের পথ রাখে নাই। সত্য কথা বলিলেই মৃত্যু। ঔরঙ্গজেবও সময়ক্ষেপ করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন,—সয়তানি! সকল কথা প্রকাশ করিয়া বল্,—নচেৎ কাল প্রাতে তোকে জীবন্ত কবর দিব।"

দলিয়া, কম্পিত-হস্তে, ইচ্ছা করিয়া, একখানি পত্র বাহির করিয়া দিল। সেই পত্রই সাহজাদা মহম্মদ স্বহস্তে লিখিয়া জুলিয়াকে দিয়াছিলেন। জুলিয়ার পিতাকে পলাইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। দলিয়া, এ পত্র জুলিয়াকে দেয় নাই। সে যাহা দিয়াছিল,—তাহা জাল। জাল করিয়া নিজের মনের মত কথা লিখিয়া, সে কৌশলে জুলিয়াকে ও মহম্মদকে মিলিত করিয়াছিল। মিলনের উদ্দেশ্য, উভয়ের সর্ব্বনাশ! তবে সে কাজটা অন্য কোন উপায়ে করিবে, এই ইচ্ছাই তাহার ছিল। কিন্তু ভবিতব্য তাহা ফিরাইয়া বিপরীত পথে লইয়া গিয়াছে।

ঔরঙ্গজেব দেখিলেন,—তাহারই ঔরসজাত পুত্র শত্রুকে সাবধান করিয়া দিতেছেন। যে নজফালী তাঁহাকে অপমান করিয়াছে, তাহারই প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ঔরঙ্গজেব ভাবিলেন,—তাঁহার পুত্র কর্ত্তব্যহীন, আত্মসম্ভ্রম-জ্ঞানশূন্য। বাদসাহ-পুত্রের এরূপ হওয়া ঘোর কলঙ্ক।

তারপর তিনি দেখিলেন,—যে অপরাধে সামান্য লোকের প্রাণদণ্ড সম্ভব,—যে অপরাধে বক্তিয়ার দূষিত ও তাঁহার চক্ষে ঘৃণিত, তাহার ঔরসজাত পুত্রই সেই অপরাধে অপরাধী! ঔরঙ্গজেব ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন।

যে তাঁহার মৃত্যুর পর, এই বিশাল হিন্দুস্থানের সম্রাট্ হইতে পারে, এক সামান্য সুন্দরীর মোহময় কটাক্ষে ভুলিয়া, তাহার এ কর্ত্তব্যহীন

আচরণ, সম্পূর্ণ রাজনীতি-বিরুদ্ধ। এত লঘুচিত্ত যে,—সে সাহজাদা নামের উপযুক্ত নহে। রাজসংসারে রাজপুত্র হইয়া জন্মানই তাহার বৃথা। কিন্তু এখন এ চিন্তার সময় নহে। রাত্রি শেষ হইয়াছে। তিনি গোপনে সেনা লইয়া বাহারগড়ের প্রান্তে আসিয়াছেন। পরিত্যক্ত স্কন্ধাবারের অনেকে হয়ত জানে না যে, তিনি গোপনে চলিয়া আসিয়াছেন। ঔরঙ্গজেব বুঝিলেন, মহম্মদ নিশ্চয়ই এতক্ষণে শিবিরে ফিরিয়াছেন। শিবিরেই তিনি থাকিবেন। পুত্রকেও তিনি ক্ষমা করিতে প্রস্তুত নহেন। দুর্গজয়ের পর তাঁহার কৃতাপরাধের বিচার হইবে।

ঔরঙ্গজেব, প্রহরীদের বলিলেন,—"এই সয়তানীকে তোমরা এখন বন্দিনী করিয়া রাখ। সাবধান,—যেন না পলায়।"

তৎক্ষণাৎ আদেশ প্রতিপালিত হইল। হতভাগিনী দলিয়া নিজ বুদ্ধিদোষে, প্রেমের প্রতিহিংসায় বন্দিনী হইল।

বলা বাহুল্য—সেই রাত্রে বক্তিয়ারের সহায়তায়, ঔরঙ্গজেব অতি সহজেই দুর্গ দখল করিলেন। বিনা রক্তপাতে বা বিনা-বাধায়, দুর্গ তাঁহার দখলে আসিল। পরদিন সকলে সবিস্ময়ে দেখিল,—বাহারগড়ের উচ্চ মিনারের উপর মোগলের রক্তপতাকা উড়িতেছে।

ঔরঙ্গজেব সংবাদ পাইলেন, নজফালী ইতিপূর্ব্বেই দুর্গ ছাড়িয়া পলাইয়াছেন। জুলিয়ার সন্ধান লইলেন,—তাহাকেও পাওয়া গেল না।

একটু পূর্ব্বের ঘটনা বলি। সেই প্রথমরাত্রে পত্র লিখিয়া, যখন কুমার মহম্মদ, দলিয়াকে বাহারগড়ে জুলিয়ার নিকট পৌঁছাইয়া দিতে আদেশ করেন, তখন দলিয়া সে পত্র গোপনে পড়িয়াছিল। পত্রপাঠে, তাহার প্রাণের জ্বালা বাড়িয়া উঠিল। সে ভাবিল, জুলিয়াই তাহার সুখের কণ্টক। জুলিয়াকে নষ্ট করিতে হইবে। সে, কুমারের নিদ্রিত-অবস্থায় তাঁহার অঙ্গুরীয়ক খুলিয়া জালপত্র প্রস্তুত করিয়া, আবার চোরের ন্যায় যথাস্থানে অঙ্গুরীয়ক রাখিয়া আসিল।

কুমার, জুলিয়াকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে পত্রখানি কেন যে সে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, তাহা সে তখন বুঝিতে পারে নাই। নিজে যে জাল-পত্র প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহাও জুলিয়াকে দিতে ভরসা করে নাই। সে যে কি করিবে,—তাহারও ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই।

জুলিয়া তাহার হস্তে কুমারকে এক প্রত্যুত্তরপত্র দিয়াছিলেন, দলিয়া সে পত্রও খুলিয়া পড়ে। সেই পত্রে, জুলিয়া সাহজাদার সহিত সাক্ষাৎ-প্রার্থিনী হন। সেইদিন গভীর রাত্রে, দলিয়া শিবিরের পার্শ্ব দিয়া আসিবার সময়, ঘটনাক্রমে ঔরঙ্গজেব ও বক্তিয়ার খাঁর গুপ্ত পরামর্শ শুনিতে পায়। এতক্ষণের পর সে প্রকৃত-পথ দেখিতে পাইল। তাহার অন্ধত্ব ঘুচিল।

সেই পাপিষ্ঠা দলিয়া, মনে মনে এক দুরাকাঙ্ক্ষায় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। মনে ভাবিল, বক্তিয়ারের বাহারগড়ে ফিরিতে অনেক বিলম্ব আছে। সে ত্বরিত-গতিতে অশ্বপৃষ্ঠে, কুমারের সহিত বাহারগড়ের পার্শ্ব প্রবাহিতা নদীতীরস্থ সাঙ্কেতিক স্থানে অগ্রে আসিয়া পৌঁছিল। দুর্গমধ্য হইতে জুলিয়াকে সঙ্গে লইয়া,—নদীতীরে উভয়কে মিলিত করিল। কুমার, তাহাকে এক ভগ্ন মস্‌জেদে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন, তাহা সে করে নাই। ইহার পর যা ঘটিয়াছে, পাঠক তা জানেন। প্রেমালাপনিমগ্ন, আত্মহারা, প্রণয়ীযুগলের মনেও তখন পত্রসম্বন্ধে কোন কথা উঠে নাই। তাঁহারা প্রেমালাপেই উন্মত্ত ছিলেন। কাজেই দলিয়ার বিশ্বাসঘাতকতার কথা এক বক্তিয়ার ভিন্ন, আর কেহই জানিতে পারিল না।

ঔরঙ্গজেবের বন্দিনী হইয়া, সেই হীনমতি, প্রতিহিংসা-পরায়ণা দলিয়া, নিজের ভ্রম বুঝিল। বুঝিল, স্ত্রী প্রবৃত্তির চপলতাবশে—প্রাণের জ্বালায় সে, যে কার্য্য করিয়াছে, তাহা ফিরাইবার পথ নাই।

তখন সে কুমার মহম্মদের বিপদাশঙ্কায় আকুল হইয়া উঠিল—পাপিষ্ঠা তখনও কুমারকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসে!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অন্ধকার! ভীষণ অন্ধকার!! আর যেন জগতে আলো ফিরিয়া আসিবে না। কবির লেখনী তাহার ভীষণতা বর্ণনে অসমর্থ। এ অন্ধকার শ্বাপদেরই প্রিয়। মানুষে ইহা সহিতে পারে না। অন্ধকার-রাজ্যে শ্বাপদই রাজচক্রবর্ত্তিত্ব-পূর্ণ।

চারিদিকে দুর্ভেদ্য লতাগুল্মে আবৃত—ভীষণ বনস্থলী। পার্শ্বে গগনকোলস্পর্শী এক পাহাড়। সেই বনের বামে দক্ষিণে দূরদূরান্তর-ব্যাপী অসংখ্য মহাবিটপীর নিম্নে, কখনও মানুষের পদচিহ্ন পড়ে নাই। মানুষ সেখানে যায় না।

ধীর-সমীরে বনলতা দুলিতেছে,—কিন্তু অতি ধীরে। সেই অন্ধকারে, বনফুল নীরবে ফুটিয়া সুরভি-ভার ছড়াইতেছে,—অতি গোপনে। সেই বিরাট্ পাষাণের বক্ষ ভেদ করিয়া, গিরিনদী বিজন সঙ্গীত গাহিয়া ধীরে ধীরে, উপলের উপর গড়াইয়া পড়িতেছে,—অতি মৃদুভাবে।

সে রাত্রে যেন প্রকৃতির মৃত্যু হইয়াছে! সৌন্দর্য্যলোপ হইলেই মৃত্যু। অন্ধকার, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য লোপ করিয়াছে। আকাশে চাঁদ নাই, ধরাবক্ষে জ্যোৎস্না নাই—গাছে কোকিলকূজন নাই—প্রকৃতির সে নশ্বর শ্যামল সৌন্দর্য্য নাই। সৌন্দর্য্য ত উপভোগের জিনিস। যাহা পরে দেখিল না,—দেখিয়া ভুলিল না—ভুলিয়া মজিল না, মজিয়া মরিল না—তাহার মূল্য অতি অল্প। তাহা মৃতেরই তুল্য। তাই বলিতেছিলাম,—প্রকৃতি মরিয়াছে।

তবুও সে ভীম অন্ধকারের নির্জ্জনরাজ্যে মানুষের অস্তিত্ব ছিল।

সেই অন্ধকার-রাজত্বের একমাত্র ব্যাকুলপ্রজা—এক হতভাগ্য যুবাপুরুষ। সেই বিরাট্ পাহাড়ের এক অন্ধকারমণ্ডিত নির্জ্জন-গুহায় বসিয়া, আপনার ভবিষ্যৎ ভাবিতেছিল।

সে আলোকে জন্মিয়াছে, আলোকে বাড়িয়াছে, অত অন্ধকার সহিতে পারিবে কেন? সে ভাবিতেছিল,—মৃত্যুর পরের নিস্তব্ধতা ইহাপেক্ষা অধিক ভয়ঙ্কর কি না।

সে কাতরকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল,—"আর অন্ধকার সহ্য হয় না। কেহ কি এখানে নাই,—একটু আলো আনিয়া দাও! আলো না আনিতে পার,—মৃত্যুকে ডাকিয়া দাও।"

কিন্তু এ কাতর-মর্ম্মবেদনার উত্তর আসিল। কে দিল—তাহা সে যুবক জানিল না। সে বড় আশ্চর্য্য হইল। সে শুনিল, কে যেন বলিতেছে,"কোন্ হতভাগ্য জীব আমার মত জীবন লইয়া বিব্রত?"

এ ভয়ানক স্থানে—প্রেত ভিন্ন আর কিছু থাকিতে পারে না। কিন্তু প্রেতের কণ্ঠস্বর ত এত ঝঙ্কারময় নয়! এ যে অপ্সরীর সঙ্গীত-কাকলি! আহা! এ আবার কেন কথা কহে না! আবার কেন এ বীণা বাজিয়া উঠে না!

যুবক, বিস্ময়াম্বিত-চিত্তে বলিল,—"কে তুমি? তুমি—পিশাচী, না স্বর্গের পরী! মানবী, না সয়তানী! এ মৃত্যুগহ্বরে কেন?"

উত্তর আসিল,—"আমি তোমারই মত ঈশ্বরের সৃষ্ট-জীব। তুমি এখানে আসিয়াছ কেন?"

যুবক এবার রাগিল। প্রশ্নের উত্তর কি এমনি করিয়া দেয়? বলিল,—আমি এখানে মরিতে আসিয়াছি। তুমি আসিয়াছ কেন?"

উত্তর হইল—"আমারও ঐ ব্যবস্থা. কিন্তু তুমি মরিবে কেন?"

যুবক বলিল,—"এখানে—এ অন্ধকারে, বিনা আহারে বাঁচা অসম্ভব। আজ দুই দিন দানাপানি পাই নাই।"

"আমি তোমায় রুটি ও জল দিব। তুমি পাও না—আমি পাই। তুমি আমারই মত দুর্ভাগ্য দেখিতেছি। কিন্তু মরিতে চাও কেন?"

"যত দিন আশা থাকে, ততদিন মানুষ বাঁচিতে চায়। আমার সব গিয়াছে। তোমার কণ্ঠস্বরে বুঝিতেছি,—তুমি স্ত্রীলোক। কিন্তু তুমি এখানে কেন?"

সে নির্জ্জন গুহামধ্যস্থ অদৃশ্য রমণী-মূর্ত্তি বলিল,—"সে অনেক কথা, অন্যদিন বলিব,—যদি তোমার দেখা পাই।"

যুবক, কাতরকণ্ঠে বলিল,—"অনুমানে বুঝিতেছি, এই গুহার অপর পার্শ্বে আর একটী গুহা আছে। মাঝে প্রস্তর হয়ত বিদীর্ণ,—তাই আমরা পরস্পরের কথা বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু উদ্ধারের ত উপায় নাই?"

"আছে—" সেই অদৃশ্য স্ত্রীমূর্ত্তি বলিল,—"ঈশ্বরে নির্ভর কর। উপায় পাইবে। এই মাঝের পাথরখানা ভাঙ্গিতে পার? স্বরে বুঝিতেছি,—তুমি যুবাপুরুষ।"

"হাঁ—তোমার অনুমান সত্য। কিন্তু অস্ত্রমাত্র যে নাই।"

"আমি অস্ত্রের উপায় বলিতেছি,—তোমার পায়ের নীচে অনেক ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড আছে,—আমারও এখানে আছে। দুই খণ্ড সূচ্যগ্র প্রস্তর লইয়া—এসো, দুদিক হইতে কার্য্য আরম্ভ করি।"

যুবক মহোৎসাহে আর্দ্রস্বরে বলিল,—এখনি প্রস্তুত। জানি না,—তুমি সুন্দরী কি কুৎসিতা। কিন্তু তোমার স্বরে বীণার ঝঙ্কার পাইতেছি। একদিন তোমার ঐ কণ্ঠস্বরের মত, একজনের কথা শুনিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল হইতাম। কিন্তু হায়! সে আজ কোথায়!"

এ প্রশ্নের উত্তর আসিল না। যুবা নিরাশ-হৃদয়ে, সেই পাষাণ-শয্যায় অঙ্গ ঢালিল।

চক্ষে নিদ্রা নাই। সে স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না। একখণ্ড

সূচ্যগ্র প্রস্তর লইয়া কাজ আরম্ভ করিল। সমস্ত রাত্রের পরিশ্রমও ব্যর্থ হইল না। একখানা বৃহৎ প্রস্তর, আপনিই সরিয়া পড়িল। প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে ক্ষুদ্রশক্তি মানুষই জয়ী হইল।

যুবক, সেই অন্ধকারে অনুভব করিল যে, গুহার অপরপার্শ্বে যে ছিল, সে যেন তাহার গুহায় আসিয়াছে। হতভাগ্য যুবক উৎসাহে চীৎকার করিয়া বলিল,—ধন্য খোদা! আজ তুমি দুইটী জীবের বাঁচিবার উপায় করিলে!"

সেই অন্ধকারমণ্ডিতা যুবতী, কোমলকণ্ঠে ঝঙ্কার তুলিয়া বলিল,—"আপনি মহাপুরুষ। এ অভাগিনীর জন্য অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন।"

তখন পাষাণের বক্ষ ভাঙ্গিয়াছে। যাহা অস্পষ্ট ছিল, তাহা স্পষ্ট পরিশ্রুত হইতেছে। সেই নির্জ্জন-গুহায়—অন্ধকারমধ্যে, পাশাপাশি দাঁড়াইয়া সেই পুরুষ ও স্ত্রীলোক। সেই স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর যেন পুরুষ চিনিতে পারিল। যাহা একবার কর্ণকুহরে বীণাধ্বনিবৎ প্রবেশ করিয়াছে—তাহা কি আর ভুলা যায়! রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ লইয়াই ত সৌন্দর্য্য!

যুবক, উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে বলিল,—"তোমার কণ্ঠস্বর পরিচিত। যাহা জীবনে ভুলিব না,—তাহা দুই দিনে ভুলিব কিরূপে? তুমি কি সেই?"

সেই যুবতী অন্ধকারে আবার বীণার ঝঙ্কার তুলিয়া বলিল,—"আমিই সেই। অভাগিনী জুলিয়া মরে নাই! মরিলে ত তোমার এত জ্বালা ঘটিত না। আজ এ নির্জ্জন-গুহায় তুমি আমি বন্দী। কেহ জানে না, কেবল জানে সেই পাপিষ্ঠ বক্তিয়ার!"

এবার কথায় আশা মিটিল না। সেই অন্ধকারে দুই জনে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জুলিয়া বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিল,—"এখন উপায় কি কুমার?"

উপায় জগদীশ্বর। এখান হইতে পলাইতে হইবে,—জুলিয়া! বিলম্ব সহিবে না,—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে।”

“কিন্তু পলাইবে কিরূপে প্রাণাধিক? সম্মুখের লৌহদ্বার ভাঙ্গিবার উপায় কি? মরিতে কাতর নহি। তোমায় বুকে লইয়া মরিতে পারা আমার স্বর্গের সুখ। তোমার অভাবই আমার মৃত্যু! কিন্তু—”

“দেখ! আমি উপায় স্থির করিয়াছি! যে তোমায় আহার দিতে আসে,—সে কাল নিশ্চয়ই আসিবে।”

“সম্ভব তো—খুব।”

“তাহাকে এই প্রস্তরাঘাতে বধ করিয়া, পথ পরিষ্কার করিব।”

জুলিয়া শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু নিজের জীবনের অপেক্ষা প্রিয় কিছুই নাই। তাহার উপর আবার যে, জীবনের অধিক প্রিয়—তাহার রক্ষার্থে জগতে অকার্য্য বলিয়াও কিছু নাই।”

বলা বাহুল্য, পরদিন প্রভাতে—সেই হতভাগ্য প্রহরীকে নিহত করিয়া, দুইজনে আবার মুক্ত আলোকে পৃথিবীর বুকে আসিয়া দাঁড়াইল।

মহম্মদ, জুলিয়াকে বুঝাইলেন,—“শিবিরে প্রত্যাগমন করা তাঁহার বিবেচনাধীন। দিনকতক কোন সরাইখানায় থাকিয়া, মোগল-সৈন্যের সংবাদ লইতে হইবে। তারপর অবস্থা বুঝিয়া কার্য্য। জুলিয়া, মহম্মদের অনুরোধে, পুরুষবেশী হইয়া, তাহার প্রাণাধিকের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

সাহজাদা সংবাদ পাইলেন,—বাহারগড় দখল হইয়াছে। নজফালী পলায়ন করিয়াছে। মোগলসৈন্য ফতেপুরশিক্রির পথে গিয়াছে। বক্তিয়ারও সেই দলে আছেন। কিন্তু আবার মহাসংগ্রামের সম্ভাবনা। সুলতান দারা, দিল্লী হইতে নজফালীর সাহায্যার্থে সেনা পাঠাইয়াছেন।

কুমার বুঝিলেন,—এ সময়েও পিতৃশিবিরে প্রকাশ্য-প্রত্যাবর্ত্তন তাঁহার পক্ষে নানা কারণে অসম্ভব। জুলিয়ার মুখে, বখ্তিয়ারঘটিত

সমস্ত কথাই তিনি শুনিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন,—বক্তিয়ারই কেবল এই সকল অনর্থের মূল।

অত স্নেহের, অত আদরের পিতৃক্রোড়ে তাঁহার স্থান নাই! ঔরঙ্গজেবের প্রকৃতি তিনি জানিতেন। ঘটনাস্রোতে তিনি পিতার বিপদের সময়, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনিই যে তাঁহার ভরসা—অবলম্বন। পরে যাহা করে না, তিনি আপনার হইয়া তাহা করিয়াছেন। এখন তিনি পিতৃচক্ষে ঘৃণ্য, রাজদ্রোহী—কর্ত্তব্যহীন।

তিনি মহাসমস্যায় পড়িলেন। সমস্যার মীমাংসাও হইল। মনে মনে ভাবিলেন, এ অজ্ঞানকৃত মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন। দুই প্রকারে এই প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব। এক মোগল-সেনাদলে ছদ্মবেশে প্রবেশ করিয়া, পিতার সহায়তাকরণ। দ্বিতীয়—মৃত্যু। প্রথমটীতে বিফল হইলে, দ্বিতীয়টী দুষ্প্রাপ্য নহে। তিনি মনে মনে সংকল্প স্থির করিয়া, জুলিয়ার কাছে আসিলেন।

পতিপ্রেম-বিমুগ্ধা জুলিয়া, স্বামীর মুখভাব লক্ষ্য করিয়া বুঝিল, ব্যাপার সহজ নহে। সে দেখিল, সেই চিরপ্রফুল্ল মুখ বিষাদ-রেখান্বিত। গভীর দুশ্চিন্তার কাল-ছায়া, তাহাতে প্রতিভাসিত।

মহম্মদ আর্দ্রস্বরে ডাকিলেন,—"জুলিয়া!"

জুলিয়া, মহম্মদের কণ্ঠলগ্ন হইয়া বলিল,—"কেন প্রিয়তম?"

"তোমায় স্থানান্তরে রাখিয়া, আমি কোন বিশেষ কার্য্যে যাইব। সম্মত আছ? তাহার উপর, আমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। দিল্লীর সম্রাটের পুত্র হইয়া, সরাইখানার অন্ন বড় তিক্ত লাগিতেছে।"

জুলিয়া, মহম্মদের মনের ভাব বুঝিতে পারিল। বলিল,—"যাহাতে তোমার হিত, তাহাতে বাধা দিব না। কিন্তু আমায় কোথায় রাখিয়া যাইবে?"

"আমার এক পরিচিত ফকির আছেন, চল তাঁহার কাছে তোমায় রাখিয়া আসি। যদি ফিরিয়া আসি—"

আর বলা হইল না। চ'খে জল আসিল। সে অশ্রু—ভাষাপূর্ণ, ভাবপূর্ণ, সংকল্পপূর্ণ।

জুলিয়া বলিল,—বুঝিয়াছি, প্রাণাধিক! তুমি পিতৃদ্রোহের প্রায়শ্চিত্ত করিবে। কোন উপায়ে মোগল-সেনাদলে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ করিবে। কিন্তু অপরাধ ত তোমার ইচ্ছাকৃত নয়। চল প্রিয়তম! তুইজনে গিয়া বাদসাহের চরণে ধরি। তিনি অবশ্য ক্ষমা করিবেন।"

"অসম্ভব! এরূপ হীনতা, তাঁহার পুত্র না হইলে দেখাইতে পারিতাম।"

জুলিয়া বলিল,—"যদি যুদ্ধে তোমার কোন বিঘ্ন হয়?"

"মৃত্যু আশঙ্কা করিতেছ,—জুলিয়া! সৈনিক কখন মৃত্যুকে ভয় করে না। যুদ্ধে মরি ত বেহেস্তে যাইব।"

জুলিয়া, অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে বলিল'—"প্রাণাধিক! কখনও কিছু প্রার্থনা করি নাই। আজ কিছু ভিক্ষা চাই। তোমার চরণে ধরিয়া অনুরোধ করিতেছি,"

"কি ভিক্ষা জুলিয়া!"

"তোমার সঙ্গে থাকিব। তুমি বাঁচিলে বাঁচিব,—মরিলে মরিব। আহত হইলে, বুকে লইয়া সেবা করিব। শত্রুর অস্ত্র তোমার বুকে পড়িবার উপক্রম হইলে, নিজে বুক পাতিয়া দিব। হৃদয়েশ্বর! তোমায় বিদায় দিয়া, জুলিয়া কি নিশ্চিন্ত থাকিবে? আমার তুমি বড়,—না মৃত্যু-ভয় বড়! আমায় সঙ্গে লও। অবলার এ কাতর-প্রার্থনা রক্ষা কর।"

মহম্মদ অনেক বুঝাইলেন। জুলিয়া কোনরূপে সম্মত হইলেন না। শেষে সেই সুন্দর রমণী-মূর্ত্তি—সুন্দর যুবক-সৈনিকবেশ ধারণ করিল।

দীর্ঘ বর্ষা ও শাণিত তরবারি লইয়া দুইজনে মোগলশিবিরের পথ ধরিলেন। সেই গভীর নিশীথে, প্রান্তর আকুলিত করিয়া, কে যেন সঙ্গীতধ্বনি তুলিল—

"আয়বাদ্ তুহি যাকে জারা সাওখ্সে কহনা
মরতা হ্যায় কই পসে দিওয়ার খপর লে।"

যাহারা জাগিয়াছিল,—তাহারা বিস্মিতচিত্তে, এই নৈশ-সঙ্গীত-লহরী শুনিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

ঔরঙ্গজেবের তখন সৈন্যের বড়ই প্রয়োজন। বৃদ্ধ আসফ্ খাঁ, এ যুদ্ধের সেনাপতি। সুতরাং অতি সহজে—সেই ছদ্মবেশী দম্পতি মোগল-সেনা-মধ্যে প্রবেশলাভ করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

অস্তগামী সূর্য্যের রক্তোজ্জ্বল কিরণরেখা, আকাশের ললাটদেশ হইতে মুছিয়া দিয়া, অন্ধকার আসিয়া নীলাকাশে সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। যেমন রাজা—পারিষদও সেইরূপ। কালো—খুব কালো মেঘগুলা, অন্ধকারের প্রজারূপে প্রলয়ের কৃষ্ণচ্ছায়া লইয়া, তাহার সিংহাসনোপান্তে নত হইয়া পড়িয়াছে। আকাশে চাঁদ নাই,—তাই নক্ষত্রের আনন্দ দেখে কে! তাহাদের জ্যোতির বাহার দেখে কে! সেই মেঘভরা, নীল আকাশের নীচে, প্রকৃতির শ্যামল বুকের উপর দিয়া, শন্ শন্ করিয়া সমীরণ ছুটাছুটি করিতেছে। কালো নহিলে,—সুন্দরের রূপের গৌরব কোথায়? তাই যেন বিজলীরাণী—প্রফুল্লমুখে নীলাকাশের নীচে, কালো মেঘের উপর, নিজ উজ্জ্বলজ্যোতিঃ প্রতি-ফলিত করিতেছিলেন। সেই রূপের ঝলকে—আকাশ স্তম্ভিত, প্রকৃতি স্তম্ভিত, আর সেই মেঘগুলাও যেন স্তম্ভিত।

নীচে মহাশ্মশান! সজীব যুদ্ধক্ষেত্র এখন নির্জীব শ্মশানে পরিণত।

প্রভাতে যেখানে জীবন ছিল, সন্ধ্যায় সেখানে মৃত্যু আসিয়াছে। উষায় যেখানে আলো ছিল, প্রদোষে সেখানে অন্ধকার আসিয়াছে। দিবা-লোক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, সেখানে অসির ঝন্‌ঝনা, অশ্বারোহী, পদাতিকের ভীমহুঙ্কার জাগিয়া উঠিয়াছিল,—সন্ধ্যায়, তথায় শব্দের অস্তিত্বলোপ পাইয়াছে। উত্তেজনা গিয়াছে, এখন সেখানে জড়ভাব আসিয়াছে।

শবের উপর শব—মৃত-অশ্বের উপর মৃত-অশ্ব। পদাতিকের উপর অশ্বারোহী—অশ্বারোহীর উপর পদাতিক। জীবনে যাহারা শত্রু ছিল, মরণে তাহারা মিত্র হইয়াছে। মোগল, পাঠানের বুকে, পাঠান, মোগলের বুকে, শত্রুতা ভুলিয়া শুইয়াছে। এখন যেন তাহারা আজীবন মিত্র। কোথায় এখন সেই দম্ভ, অভিমান, আস্ফালন, আত্মবিগ্রহ? এমনই— মৃত্যু!!

রুধিরের স্রোত বহিতেছে। অসির আস্ফালন, যুদ্ধাশ্বের উন্মাদ চাঞ্চল্য, দর্পিত পদবিক্ষেপ—আর সৈনিকের ভীষণ জিঘাংসা-কোলাহল সেখানে নাই। এখন শক্তিহীন, ভাষাহীন, চিরনিদ্রাসমাচ্ছন্ন, শোণিতা-প্লুত মৃতদেহে সেই যুদ্ধক্ষেত্র পরিপূর্ণ। প্রকৃতি এই ভীষণ-দৃশ্য দেখিয়া শিহরিয়া উঠিবে বলিয়া, যেন অন্ধকার ইহার উপর কৃষ্ণবর্ণের এক যবনিকা টানিয়া দিয়াছিল। কিন্তু ধিক্! তাহার রূপ-বিকাশে—সেই ভীষণ-দৃশ্যের যবনিকা যেন, সেই চঞ্চলা দুষ্টবুদ্ধিতে এক এক বার সরাইয়া দিতেছিল।

আক্তিয়ারপুরের প্রশস্ত প্রান্তরে, ঔরঙ্গজেবের সহিত নজফালীর পুনরায় শক্তি-পরীক্ষা হইয়াছিল। দারার প্রেরিত সৈন্যের সহিত মিশিয়া, নজফালী আবার দুর্মদ আশায় উন্মত্ত হইয়াছিল। তাহার পরিণাম এই মহাশ্মশান!!

গভীর রাত্রে, প্রজ্বলিত আলোকহস্তে—এক স্ত্রী ও পুরুষ এই

শ্মশানের চারিদিক পরিভ্রমণ করিতেছিল। প্রত্যেক মৃতদেহের উপর উজ্জ্বল আলোক ধরিয়া দেখিতেছিল। যাহাকে খুঁজিতেছিল, যেন তাহাকে পাইতেছে না। নিরাশা,—তাহাদের কিছুই করিতে পারিল না। তাঁহারা আশার ছলনে, সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তরের অপরাংশে আপন কার্য্যে নিযুক্ত হইল।

তাহারা চলিয়া গেল। আবার—আসিল একজন। এও স্ত্রীলোক! কেশ আলুলায়িত, দৃষ্টি উদাস, হস্তে উজ্জ্বল আলোক, অবস্থায় উন্মাদিনী, রূপে অতুলনীয়া। সেই উন্মাদিনী একস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। বলিল,—"তোমায় জীবিতে পাই নাই, শুনিলাম তুমি মরিয়াছ, তাই দেখিতে আসিয়াছি।"

তাহার কোমল কণ্ঠস্বর এক অর্দ্ধমৃত, ভূপতিত সৈনিকের কাণে পৌঁছিল। সে ক্ষীণ-কণ্ঠে বলিল,—"কে তুমি! আলো লইয়া এ অন্ধকারে আসিয়াছ? আমার উপকার কর,—একটু জল দাও।"

সে প্রার্থনা বড়ই কাতর,—বড়ই করুণাপূর্ণ! সেই নিশাবিহারিণী তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু জল কোথায়?

রমণী বলিল,—"হতভাগ্য! একটু জলের জন্য এ অবস্থায় মরিতে পারিতেছ না? এখনও তোমার তৃষ্ণা রহিয়াছে? কিন্তু জল কোথায় পাইব?"

সেই আহত সৈনিক ক্ষীণকণ্ঠে বলিল,—"কোন-না কোন মৃত সৈনিকের কটিবদ্ধ চর্ম্মময় স্থালীতে জল পাইবে। একটু চেষ্টা করিয়া দেখ।"

সে নির্ভীক-রমণী ভয় পাইল না। যাহার ভয় আছে,—সে এখানে আসিবে কেন? সে জলের পাত্র খুঁজিতে চলিল। মশালটা দূরে রাখিয়া, জল আনিয়া সেই মুমূর্ষু সৈনিকের মুখের নিকট ধরিল।

সৈনিক জল-পানে বল পাইল। বলিল,—"তুমি আমার বড়

উপকার করিলে। তুমি দেখিতেছি স্ত্রীলোক,—কিন্তু এ রাত্রে, এ ভীষণ স্থানে কেন?"

সেই স্ত্রীলোক প্রথমে উত্তর করিল না। পরে কি যেন ভাবিয়া বলিল,—"আমি একজনকে ভাল বাসিতাম। শুনিতেছি, সে এই যুদ্ধে মরিয়াছে। তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিব বলিয়া আসিয়াছি। জন্মের শোধ তাহাকে দেখিব বলিয়া আসিয়াছি।"

আহত সৈনিক, এবার যেন সে কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিল। মৃত্যু তাহার শিয়রে! তবু সে জিঘাংসায় উত্তেজিত হইল। মনোভাব গোপন করিয়া বলিল,—"দেখ! তোমার মত আমারও প্রাণে জলন্ত আকাঙ্ক্ষা! আমিও একজনকে ভাল বাসিতাম; কিন্তু তাহাকে পাই নাই। সে এখানেই আসিবে—আশা ছিল। সে যাহাকে ভালবাসে—সে মরিয়াছে। তাহাকেই খুঁজিতে আসিবে। কিন্তু সে এখনও আসিল না। আসিলে তুমি—"

সেই স্ত্রীলোক একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। বলিল,—"তোমার ভাল-বাসার নাম কি?"

"তাহা তোমার শুনিয়া কাজ নাই।"

"আমায় বলিতে আপত্তি কি? তুমি ত এখনই মরিবে!"

"সে—জুলিয়া!"

রমণী শিহরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—"তবে তুমি বক্তিয়ার!"

"হাঁ—আমি বক্তিয়ার। কিন্তু তোমায় আমি চিনিয়াছি। তুমি—দলিয়া।"

"বলিতে পার বক্তিয়ার,—মহম্মদ এ যুদ্ধে আসিয়াছিলেন কি না?"

"আসিয়াছিলেন,—কিন্তু শুনিয়াছি, ছদ্মবেশে।"

"কোন্ পক্ষে?"

"তাঁহার পিতার পক্ষে।"

"ছদ্মবেশে কেন?"

"জানিতে পারিলে ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে বিদ্রোহাপরাধে দণ্ড দিবেন। যুদ্ধের সময় কর্ত্তব্যহীনতায়, ঔরঙ্গজেবের ন্যায় লোকে, পুত্রকেও মার্জ্জনা করেন না।"

"কুমার কি যুদ্ধে মরিয়াছেন?"

"তা বলিতে পারি না। দলিয়া! তোমার হাতের আলোটা দূরে রাখিলে কেন?"

"তুমি মরিতেছ,—আলোতে তোমার কি প্রয়োজন?"

"রমণীর রূপ-মোহে পড়িয়া আজ আমার এ দুর্গতি। মৃত্যু আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। এত করিলাম, প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটিল না যে দলিয়া! তুমি সুন্দরী,—একবার আলো হাতে করিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াও। তোমার ও ভুবনমোহন সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে মরি।"

"তুমি মহাপাপিষ্ঠ! এখনও এত আকাঙ্ক্ষা তোমার বুকে! তুমি ত মরিতে পারিবে না,—বক্তিয়ার!

বক্তিয়ার চুপ করিল। দলিয়াও কিছু বলিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে বক্তিয়ার বলিল,—"দলিয়া! বড় তৃষ্ণা! একটু জল—"

দলিয়া জল লইয়া আবার নত হইয়া, তাহার মুখে ঢালিয়া দিতে গেল। মুমূর্ষুর শেষ তৃষ্ণার—বারিবিন্দু প্রার্থনা, সে উপেক্ষা করিতে পারিল না। ইহাতেও পুণ্য আছে।

সর্ব্বনাশ! দলিয়ার হাতের পাত্র হাতেই রহিয়া গেল। বক্তিয়ার, ক্ষুব্ধ ব্যাঘ্রবৎ অর্দ্ধোত্থিত হইয়া, তাহার বক্ষে শাণিত তরবারি আমূল বিদ্ধ করিল। সেই শ্মশানক্ষেত্রে, সেই নরকের রাজত্বে, ছিন্নবল্লরীবৎ দলিয়া ভূমে পড়িয়া গেল। চীৎকার করিয়া বলিল,—"নরাধম! এই তোমার কৃতজ্ঞতা! আমায় মারিলে কেন? আমি তোমার কি করিয়াছি?"

বক্তিয়ার উন্মাদের মত হাস্য করিয়া বলিল,—"আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ! রাক্ষসি! তোমার মন্ত্রণায় ভুলিয়া আমার সব গিয়াছে। মনে করিয়াছিলাম, নয় তোমাকে, না হয় জুলিয়াকে, পরলোকের সঙ্গী করিয়া, হাসিতে হাসিতে চলিয়া যাইব। মহম্মদ মরিয়াছে,—এই সংবাদ রাষ্ট্র। তাহার মৃতদেহের সন্ধানে সেই সুন্দরী জুলিয়া, নিশ্চয়ই আসিবে। কিন্তু সে আসিল না, তুমি আসিলে।"

দলিয়ার বক্ষ হইতে প্রচুর শোণিতস্রাব হইতেছিল। তাহার মাথা ঘুরিতেছিল। সে অপর এক রাজ্যে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। কোমলা বল্লরীর উপর শাণিত কুঠারাঘাত সহিবে কেন? সে ক্ষীণ-স্বরে বলিল,—"বক্তিয়ার! উপরে একজন বিচারক আছেন,—তাঁহার কাছে পাপপুণ্যের বিচার। ভালবাসা, রমণীর পক্ষে পাপ নহে। ভালবাসা দেখাইবার জন্য রমণীর সৃষ্টি। আমি হাসিতে হাসিতে মরিতে পারিতাম, যদি তাঁহাকে একবার দেখিতে পাইতাম। তোমার ভালবাসা কামগন্ধপূর্ণ। তাহা ভালবাসা নয়,—রূপোন্মাদ। তোমার নরকেও স্থান হইবে না।"

বক্তিয়ার আর কথা কহিল না। সেই ভীষণ শ্মশানক্ষেত্রে সে জন্মের মত নীরব হইল। অনন্তভৃষ্ণা লইয়া সে পরলোকে চলিয়া গেল।

*　　*　　*　　*　　*

পুণ্যাত্মা মরিলে, শুনিয়াছি, স্বর্গ হইতে দেবদূত বা দেবদূতীরা লইতে আসে। পাপিষ্ঠ মরিলে,—তাহারা আসে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যেন এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইল। দুইজন অতি উজ্জ্বল রূপ লইয়া সেই শ্মশানবক্ষে, যেখানে দলিয়া তখনও জীবিত ছিল,—সেইখানে আসিয়া ধীরে ধীরে দাঁড়াইল।

তাহাদের হস্তে উজ্জ্বল আলোক। অতি সুন্দর রূপ। একজন

পুরুষ, অপরা স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোক বলিল,—"আর বৃথা পরিশ্রম কেন? এত অন্বেষণে ত ফল হইল না। চল ফিরিয়া যাই।"

পুরুষ বলিল,—"তাহাই হউক জুলিয়া।"

"জুলিয়া" কথাটা শোণিতাপ্লুতা, ধরণীবক্ষচুম্বিতা, মুমূর্ষু দলিয়ার কাণে গেল। সে বিদ্যুতের উত্তেজনায় যেন, উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু পারিল না। তাহার তখনও পূর্ণ জ্ঞান। সে দেখিল, যাহার জন্য সে আজ বক্ষের শোণিতে সমরক্ষেত্র প্লাবিত করিতেছে, সেই অনন্ত রূপশেখর—ভুবনমোহন রূপরাশি লইয়া তাহার চোখের সম্মুখে! সে মূর্ত্তি সে চিনিল। আবার স্তিমিত দীপ জ্বলিয়া উঠিল। সে ক্ষীণস্বরে বলিল,—"তুমি আসিয়াছ?"

অন্ধকার-মধ্যোত্থিত এই ক্ষীণ করুণস্বর সেই পুরুষের কাণে গেল। তিনি আলো লইয়া অগ্রসর হইয়া দেখিলেন,—দলিয়া। শোণিতস্রাবে তাহার সব লাল হইয়া গিয়াছে।

মশালের আলোকে, সেই পুরুষ আরও দেখিলেন,—দলিয়ার সেই মৃত্যু-মলিনমুখে তখনও হাসি। তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"দলিয়া! দলিয়া! তুমি এখানে, এ অবস্থায় কেন?"

"তোমায় দেখিব বলিয়া—প্রিয়তম! জন্মের মত একবার প্রাণের সাধ মিটাইয়া আপনার বলিয়া ডাকি। শুনিয়াছি, তুমি ছদ্মবেশে যুদ্ধে আসিয়াছিলে। তুমি আমারই মন্ত্রণাচক্রে পিতৃদ্রোহী হইয়াছ, প্রায়শ্চিত্তে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছ, তাই তোমার মৃতদেহ দেখিতে আসিয়াছিলাম। ভাগ্যবলে তোমায় জীবিত দেখিতে পাইলাম। স্বামিন্! আমি মহা পুণ্যবতী। এখন আমার স্বর্গের দ্বার খোলা।"

মহম্মদের চোখে অশ্রুধারা বহিল। তিনি রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন,—"দলিয়া! তুমি আমায় এত ভালবাসিতে! আগে যদি জানিতাম—"

"না জানিয়াছ, ভালই হইয়াছে, সখা! আকাঙ্ক্ষা মিটিলেই দুঃখ।

তোমায় পাইলেই আকাঙ্ক্ষা মিটিত। তখন যদি মরিতাম, পরলোকে আমার চিন্তার কিছুই থাকিত না। এখন তোমার চিরসুন্দর-মূর্ত্তি হৃদয়ে লইয়া সেখানে যাইব।"

মহম্মদ বলিলেন,—"দলিয়া! চল, তোমায় গৃহে লইয়া যাই। শুশ্রূষায় বাঁচাইবার চেষ্টা করি।"

দলিয়া ক্ষীণস্বরে বলিল,—"সে চেষ্টা বৃথা হইবে। আমায় রাখিতে পারিবে না। এক পাপিষ্ঠ আমায় সাংঘাতিক আঘাত করিয়াছে।"

"কে—সে নৃশংস?"

"বক্তিয়ার।"

"কোথা সে?"

"তোমার সম্মুখে—আলো লইয়া দেখ। সে অনেকক্ষণ নরকে চলিয়া গিয়াছে। অপেক্ষা সহিতে পারিল না। সে জুলিয়াকে বধ করিয়া মরিবে, এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল—কিন্তু—"

জুলিয়া, মলিন-মুখে বলিলেন,—"কিন্তু কি ভগিনী? দেখিতেছি তুমি নিজে মরিয়া আমায় বাঁচাইয়াছ। দলিয়া! তুমি আমায় আগে বল নাই কেন? আমরা দুইজনে সাহজাদাকে লইয়া সুখী হইতাম!"

দলিয়া, ক্ষীণস্বরে বলিল,—"ভগিনি! আমায় মার্জ্জনা করিও। তোমার ও কুমারের এত কষ্টের মূলকারণ আমি। আমিই বক্তিয়ারের পাপকার্য্যে সহায়তা করিয়াছি। হায়! যদি এ কথা আগে ভাবিতাম।"

সুন্দরীশ্রেষ্ঠা জুলিয়া, সেই মহাশ্মশানে—দলিয়ার সুন্দরদেহ কোলে লইয়া বসিল। বোধ হইল, যেন দয়া আসিয়া সেই শ্মশানক্ষেত্রে বসিয়াছে। যেন দেবদূতী আসিয়া মুমূর্ষুর সেবা করিতেছে। যেন স্বর্গের পরী আসিয়া, এক কাতর-প্রাণে সান্ত্বনা দিতেছে। সে শ্মশানে এ দৃশ্যে স্বর্গের আলো ফুটিয়া উঠিল।

দলিয়া, কাতরকণ্ঠে বলিল,—"কুমার! একবার জন্মের মত আমার

সম্মুখে দাঁড়াও। আমি মৃত্যুর চিরান্ধকারে যাইবার পূর্ব্বে,—তোমারই হাতের আলোয়, তোমার ও ভুবন-মোহন রূপ দেখিয়া হাসিতে হাসিতে মরি। আমি পাপিষ্ঠা, আমি হতভাগিনী, তোমার যোগ্য নই,—তাই তোমায় পাইলাম না। প্রাণে অনন্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া চলিলাম। যদি আবার রমণী হইয়া জন্মাই, যেন তোমায় পাই। বড় তৃষ্ণা—জল—দা—ও।"

এই শেষ কথা! আর বলিতে হইল না। পৃথিবীর নিকট দলিয়া জন্মের মত বিদায় লইয়া গেল। যে জুলিয়ার সর্ব্বনাশের জন্য সে এত চেষ্টা করিয়াছিল,—তাহার কোলেই সে মরিল।

তখন রজনীর শেষ-যাম,—সাহজাদা ও জুলিয়া, দলিয়ার মৃতদেহ সমাধি-প্রোথিত করিয়া, বিষণ্ণ-মনে গৃহে ফিরিলেন। সেই সমাধির উপর তাঁহাদের দুইজনের কোমল নেত্রপল্লব-নিঃসৃত মুক্তাবিন্দু পড়িয়া, দলিয়াকে চিরশান্তির কোলে পৌঁছাইয়া দিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

"বদ্‌বখত্—বেয়াদব্! তুই ঔরঙ্গজেবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এ কথা বলিতেছিস্?"

"জাঁহাপনা! সাহসে কুলাইতেছে না। রসনা অবশ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু যাহা শুনিয়াছি, তাহাই বলিয়াছি।"

"আমার প্রাণাধিক পুত্র কোথায়?"

"ইহলোকে নাই—জাঁহাপনা!"

"সয়তান! কে তোকে এ সংবাদ দিল?"

"সেনাপতি আসফ্ খাঁ—"

ঔরঙ্গজেব—তীব্রশোকে করপুট দ্বারা মুখাচ্ছাদন করিলেন। উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন,—"কে আছিস্?"

সে কঠোর-স্বর শুনিয়া, একজন খোজা কাঁপিতে কাঁপিতে সম্মুখে আসিয়া মস্তক অবনত করিল। ঔরঙ্গজেব হাঁকিলেন,—"আসফ্ খাঁ কোথায়?"

আসফ্ খাঁ, মলিন-মুখে গৃহ-প্রবেশ করিলেন। ঔরঙ্গজেব বলিলেন,—এ সয়তান যাহা বলিতেছে, তাহা কি সত্য?"

"কি বলিব জাঁহাপনা,—অবিশ্বাস করিতেও পারিতেছি না।"

"তুমি কেমন করিয়া জানিলে?"

"আমার গুপ্তচর, কুমারের অন্বেষণে অনেক দূর গিয়াছিল। সে এক সুন্দরী রমণীর নিকট এই সংবাদ পাইয়াছে।"

"কে সে—সুন্দরী?"

"জুলিয়া—নজফালীর কন্যা।"

"তুমি যে বলিয়াছিলে,—যুদ্ধক্ষেত্রে কুমার ছদ্মবেশে আসিয়াছিলেন। কথাটা কি সত্য?"

"সম্পূর্ণ সত্য,—জাঁহাপনা! সেনাপতিত্ব করিয়া চুল পাকাইয়াছি। বাল্যাবধি যে, সে সুন্দর-মূর্ত্তি দেখিয়াছি। হউক না কেন—ছদ্মবেশ! সেদিন কুমারই নজফালীর বর্ষা হইতে আমায় রক্ষা করিয়াছেন। তিনি ছদ্মবেশে, মোগল সেনাদলে প্রবেশ করিয়া, আমাদের সম্মানরক্ষা করিয়াছিলেন। যুদ্ধাবসানে তাঁহাকে আর খুঁজিয়া পাইলাম না।"

ঔরঙ্গজেবের চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল। তিনি পুত্র-শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। বুঝিলেন,—নজফালীর জন্য, তাহার কন্যার জন্য, তাঁহার প্রিয়তম পুত্রকে তিনি সমরাঙ্গনে বিসর্জ্জন দিয়াছেন। হায়! তবে কার জন্য এ দিল্লীর সিংহাসন? সমস্ত ক্রোধটা নজফালীর উপর পড়িল।

ঔরঙ্গজেব ভ্রূকুটীভঙ্গী করিয়া আবার মুখ তুলিলেন। গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন,—পাপিষ্ঠ নজফালী কোথায়।"

"আপনার কারাগারে।"

"তাহাকে জীবন্ত প্রোথিত করিয়া, কুকুর দিয়া খাওয়াও। তাহার জন্যই, আমি আমার সর্ব্বস্ব হারাইয়াছি।"

আসফ্ খাঁ, নম্রস্বরে বলিলেন,—"বন্দীর প্রতি এরূপ কঠোর দণ্ডবিধানে, আলমগীর বাদসার নামে কলঙ্ক হইবে।"

সহসা বাহিরে একটা অদ্ভুত কোলাহল শ্রুত হইল। ঔরঙ্গজেব রাজপথে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিলেন,—তথায় মহা-জনতা। সোৎসুকে বলিলেন,—"পথে ও গোলযোগ কিসের?"

আসফ্ খাঁও, বাতায়নপথে মুখ বাড়াইলেন। যাহা দেখিলেন, তাহার মর্ম্মভেদ করিতে পারিলেন না। ফতেপুরশিক্রির রাজপ্রাসাদের পার্শ্ব দিয়া যে রাজপথ গিয়াছে, তাহাতেই এই মহা-কোলাহল। অপেক্ষা সহিতে না পারিয়া, ঔরঙ্গজেবও বাতায়ন-পথে আসিলেন।

বস্তুতঃ পথে বড়ই জনতা। যাহারা আসিতেছে, তাহারা শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে আসিতেছে। তাহারা সেই নগরেরই লোক। তাহাদের মধ্যে স্ত্রীলোক আছে, পুরুষ আছে, বৃদ্ধ আছে, যুবক আছে, যুবতী আছে। অনেক যুবতী আবার শিশু-পুত্র কোলে লইয়া, সেই দলে মিশিয়াছে। দলের পুরুষদের সকলেরই নগ্নপদ—মস্তক উষ্ণীষশূন্য। যেন তাহারা কোন তীব্র-শোকে অভিভূত!

আগে জনস্রোত,—পশ্চাতে জনস্রোত। মধ্যে এক অদ্ভুত দৃশ্য! এ ঘটনা ঔরঙ্গজেব কখনও দেখেন নাই। এক বৃহৎকায় যুদ্ধাশ্ব, রণসজ্জায় সজ্জিত,—কিন্তু তাহাতে আরোহী নাই। আছে কেবল কোন বীর-পুরুষের পরিচ্ছদ, উষ্ণীষ, বর্ম্ম ও তরবারি। আরোহী-হীন অশ্ব, তাহাই বহিয়া নম্রমস্তকে, ধীরগতিতে আসিতেছে।

তদপেক্ষা আশ্চর্য্যের কথা এই, এক অবগুণ্ঠনমণ্ডিতা সুন্দরী রমণী, সেই অশ্বের বল্গা হস্তে লইয়া, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন।

ঔরঙ্গজেব দেখিলেন,—সেই জনস্রোত, তাঁহার দুর্গের ফটকের নিকট আসিল।

বাতায়ন-পথ হইতে উত্তেজিত কণ্ঠে, ঔরঙ্গজেব আদেশ করিলেন,—"এ জনতাকে প্রাসাদে প্রবেশ করিতে দিও না। ঐ সুন্দরী স্ত্রীলোক ও অশ্বই কেবল পুরী-মধ্যে আসিবে।"

তাহাই হইল। ঔরঙ্গজেব, কম্পিত-হৃদয়ে নীচে নামিয়া আসিলেন। সঙ্গে আসফ্ খাঁ। কাছে আসিয়া ঔরঙ্গজেব—সেই উষ্ণীষ, পরিচ্ছদ, বর্ষা, তরবারি চিনিলেন। আবার তাঁহার চক্ষু দিয়া দরদরিত ধারা বহিল। এ সবই যে তাঁহার প্রিয়তম প্রাণাধিক পুত্রের। বীর নাই—তাহার অশ্ব আসিয়াছে। প্রাণ নাই,—দেহ আসিয়াছে। আশা নাই—নিরাশা আসিয়াছে। পূর্ণতা নাই—শূন্যতা আসিয়াছে। ঔরঙ্গজেব চীৎকার করিয়া উন্মাদের মত বলিলেন,—"হায়! এ সব যে আনিল, সে কি আমার প্রিয়তমকেও ফিরাইয়া আনিতে পারে না?"

কে যেন অতি কোমলস্বরে পশ্চাৎ হইতে বলিল,—"জাঁহাপনা! আমি ফিরাইয়া আনিব।" কোথা হইতে এ উত্তরটা আসিল, ঔরঙ্গজেব জানিলেন না। তবু বুঝিলেন,—এ কোন স্বর্গের পরীর অব্যর্থ আশ্বাস-বাণী।

এক সুন্দরী, অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া, বাদসাহের সম্মুখে আসিয়া কুর্ণীস করিল। তাহার রূপের জ্যোতিতে সেই স্থানে যেন বিজলী খেলিতে লাগিল। সেই সুন্দর মুখে অশ্রুধারা, ওষ্ঠাধর বিকম্পিত, মুখে করুণা ভিক্ষা। সেই ধীরে কম্পিত, স্ফুরিতাধর হইতে আবার কোমল প্রতিধ্বনি বাহির হইল,—"জাঁহাপনা! আপনি কুমারকে মার্জনা করুন, আমি ফিরাইয়া আনিব।" এই কথা বলিয়াই সে সুন্দরী, বাদসাহের পদবন্দনা করিল।

ঔরঙ্গজেব মুখ তুলিলেন। দেখিলেন,—সেই রমণী অদ্ভুত রূপবতী

বটে। বুঝিতেও বাকি রহিল না। মিষ্টস্বরে বলিলেন,—"যদি না ভুল বুঝিয়া থাকি, মা!—তবে তুমিই কি সেই জুলিয়া?"

"হাঁ—জাঁহাপনা! এ বাঁদীর বাঁদী—জুলিয়াই বটে।"

"আমার পুত্র কোথায়?"

"এই জনতার মধ্যে!"

"অসম্ভব—মিথ্যা বলিতেছ। আসফ খাঁর অধীনস্থ এক সেনাপতি, আমার প্রাণাধিককে, স্বচক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মবিসর্জ্জন করিতে দেখিয়াছে।"

"সেই সেনাপতি ভ্রান্ত! আপনার পুত্র এখনিই আসিয়া আপনার পদবন্দনা করিবেন। কিন্তু তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনা করুন—" জুলিয়া অশ্রুপ্লাবিত-নেত্রে, বাদসাহের চরণ-যুগল ধরিয়া বসিয়া পড়িলেন।

ঔরঙ্গজেব—আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল প্রফুল্লভাব ধারণ করিল। জুলিয়াকে কাছে লইয়া বলিলেন,—"মা। তুমি বড় বুদ্ধিমতী। বুঝিয়াছি,—কেন এ শূন্য-অশ্ব ফিরাইয়া আনিয়াছ। কিন্তু দুষ্টা-বালিকা! এরূপে কি মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতে আসে? আমার প্রাণ যে ফাটিয়া যাইতেছিল। মহম্মদের অপেক্ষা আমার প্রিয় যে কেহই নাই!"

সহসা কে একজন সেই জনতার মধ্য হইতে আসিয়া, ঔরঙ্গজেবের বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বন করিল। ঔরঙ্গজেব তাহাকে চিনিলেন। কঠোর স্নেহালিঙ্গনে তাহাকে বুকে ধরিয়া, সকল জ্বালা মিটাইলেন। পিতা-পুত্রে, জুলিয়ার বুদ্ধিকৌশলে আবার মিলন হইল।

তখন সেই জনতার মধ্যে একটা আনন্দ-কোলাহল উঠিল। সকলেই কুমারের জয়! ঔরঙ্গজেবের জয়!" এই শব্দ করিয়া সেই দুর্গপ্রাঙ্গণ কাঁপাইয়া তুলিল।

দুঃখ গেল,—সুখ আসিল। বিরহ গেল,—মিলন আসিল। বিচ্ছেদ গেল,—আনন্দ আসিল। অন্ধকার গেল,—আলো ফুটিল। বর্ষা গেল,—শরতের মাধুরী ষোলকলায় ফুটিয়া উঠিল।

কিন্তু পাঠক! আমাদের এখন বিদায় হওয়া ঘটিল না। ইহার শেষাঙ্কের যবনিকা একটু তুলিয়া দেখিতে হইবে!

* * * * * *

আগরা দখল হইয়াছে। কিন্তু ঔরঙ্গজেব—তখনও সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করেন নাই। বৃদ্ধ-সম্রাট্ সাহজাহান, তখনও সম্পূর্ণ বন্দী হন নাই। আগরার রঙ্গমহালের নিভৃত-কক্ষে, বৃদ্ধ বাদসাহ—আপনার ভবিষ্যৎ গুণিতেছেন। বস্তুতঃ সে ভবিষ্যৎ বড়ই অন্ধকারময়। কাহারও সঙ্গে তিনি কথা কহেন না। কেবল পৌত্র মহম্মদই তাঁহার একমাত্র প্রিয়। তিনি নির্জ্জনে—মাঝে মাঝে তাঁহার কাছে আসেন।

জুলিয়া, মতি-মিনারের এক নিৰ্জ্জন অলিন্দে, বীণাহস্তে লইয়া তান তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন,—কিন্তু সুর কিছুতেই বাধ্যতা স্বীকার করিতেছে না। জুলিয়ার মনে কি যেন একটা দারুণ দুশ্চিন্তা। বীণাটা কোলের উপর—দৃষ্টি নিম্নে সংলগ্ন। চক্ষে বারিধারা। মহম্মদ সেই স্থানে আসিয়া জুলিয়ার চক্ষে জল দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"জুলিয়া! এত সুখেও তোমার চক্ষে জল দেখিলে, আমার বুক ফাটিয়া যায়। এখনও তুমি দলিয়ার কথা ভাব কেন?"

"আহা! সে বড় অভাগিনী! তাহার সেই রুধিরপ্লাবিত মলিন, মৃত্যুমুখ কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না—সাহজাদা! আমি যে তাহার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছি।

কুমার, জুলিয়ার অশ্রু মুছাইয়া দিয়া একটী চুম্বন করিলেন। বলিলেন,—"চল, পিতামহ ডাকিতেছেন, দুইজনে যুগল-মূর্ত্তিতে দেখা করিয়া আসি।"

* * * * * *

দুগ্ধফেননিভ শয্যায় বসিয়া—বৃদ্ধ বাদসাহ সাহজাহান কতকগুলি রত্নালঙ্কার লইয়া পরীক্ষা করিতেছেন, আবার সেগুলি এক পেটিকায়

নির্ম্মিত স্বর্ণখচিত বাক্সে সযত্নে রাখিয়া দিতেছেন। মহম্মদ অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"দাদা! আমি আসিয়াছি।"

বৃদ্ধ সম্রাট সাহজাহানের, চিন্তাক্লিষ্ট-মুখে একটু হাসি আসিল। তত কষ্টেও তিনি রসিকতার লোভ ছাড়িতে পারিলেন না। সহাস্যে বলিলেন—"দাদু! তুই নাকি এক পরী লুটিয়া আনিয়াছিস্—আমার গৃহদ্বারের কাছে কে ও দাঁড়াইয়া?"

মহম্মদ হাসিয়া বলিলেন,—"ওই আপনার সেই পরী। একবারে সম্মুখে আনি নাই যদি ভুলিয়া যান।"

সাহজাহান হাসিয়া বলিলেন,—"তোর সে ভয় নাই। তোর বেগম কি আমার তাজবেগমের অপেক্ষাও সুন্দরী? হইতেও পারে! নইলে তুই ভুলিলি কেন? ওর মুখখানা কিন্তু একবার দেখিতে চাই।"

জুলিয়া আসিয়া, বৃদ্ধ বাদসাহের চরণ-বন্দনা করিল। সাহজাহান, তাহাকে সাদরে নিজের শয্যায় বসাইলেন। বলিলেন,—"জুলিয়া! তুমি ভালবাসিতে শিখিয়াছ ত? মহম্মদ ভারি দুষ্ট। আমার কাছে তুমি মাঝে মাঝে আসিতে ভুলিও না। আমি তোমায় ভালবাসা শিখাইব।"

জুলিয়া লজ্জায় মুখ অবনত করিলেন। তাঁহার গণ্ডদেশ রক্তিমাভ ধারণ করিল। বাদসাহ,—গজদন্তনির্ম্মিত সেই বাক্সটী, জুলিয়ার হাতে দিয়া বলিলেন,—"জানি, এখন আর আমি হিন্দুস্থানের বাদসাহ নহি। আমার সুখ-সৌভাগ্য চির-অস্তমিত। মহম্মদ আমার চিরপ্রিয়—বড় আদরের। এই গুলি আমার বাদসাহীর স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ রাখিও।"

কথাগুলি বলিতে সাহজাহানের চক্ষে জলধারা বহিল। মহম্মদও কাঁদিয়া ফেলিলেন! জুলিয়াও কাঁদিল। আগ্রার রঙ্গমহালের সেই "মতি-মিনার" প্রাসাদে, বৃদ্ধ বাদসাহ—হর্ষ-বিষাদের অশ্রুধারার মধ্যে, জুলিয়াকে মহম্মদের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

সম্পূর্ণ